কারবালা
মুহম্মদ বরকতুল্লাহ্

কারবালা

ও

ইমাম বংশের ইতিবৃত্ত

মুহম্মদ বরকতুল্লাহ্

পরিবেশক
রশীদ বুক হাউস
৬, প্যারীদাস রোড
ঢাকা–১১০০

তৃতীয় সংস্করণ

প্রচ্ছদপটে- কাশেম

হাদীয়া ঃ ১০০.০০

মুদ্রাকরঃ
কে, এ, ওয়াদুদ,
বাংলা উন্নয়ন প্রেস,
১৭ নং কৈলাশ ঘোষ লেন,
ঢাকা-১

কারবালা

ও

ইমাম বংশের ইতিবৃত্ত

ভূমিকা

পৃথিবীর যুদ্ধ-ইতিহাসে কারবালার যুদ্ধ একটি সামান্য ঘটনা। কিন্তু ফলাফলের দিক দিয়া উহার গুরুত্ব ছিল অত্যাধিক। উহা শুধু মদীনা, মক্কা ও কুফায় বিপ্লব আনে নাই, দামেস্কের উমাইয়া রাজবংশের পতনেও উহার প্রত্যক্ষ প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হউয়াছিল। অবশ্য এই দীর্ঘ সময়ের ভিতর ফোরাতে অনেক পানি গড়াইয়াছিল এবং অনেক মুল্যবান জীবন বিনষ্ট হইয়াছিল। ইমাম হুসাইনের প্রপৌত্র ইমাম যায়েদ ও তৎপুত্র কিশোর ইয়াহিয়ার হত্যাকান্ড তার মধ্যে অন্যতম।

আব্বাসীয় বংশের শাসন আমলেও ইমাম বংশের উপর কম অত্যাচার সাধিত হয় নাই ইমাম হাসানের প্রপৌত্র ইমাম মুহম্মদ(নাফসে জাকিয়া) ও ইব্রাহীমের নিধন, হুসায়েন বংশীয় ইমাম মু'সা আল কাযিম এবং তাঁর বংশধরদের মদীনা হইতে নির্বাসন ও বন্দী শিবিরে তাঁহাদের প্রাণত্যাগ ইত্যাদি বহু শোকাবহ ঘটনা কারবালার বিষাদময় কাহিনীর সহিত এক সুত্রে গাঁথা। এইসব কাহিনী যেমন বিচিত্র তেমতী করুণ। এজন্য কারবালা কাহিনীর সহিত এইসব ঘটনার বিবৃতি সংযোজিত হইয়াছে। মহানবীর ওফাতের পরবর্তী "দ্বাদশ ইমামের" কথাও প্রসঙ্গক্রমে এই গ্রন্থে উল্লেখিত হইয়াছে। কারণ তাঁহারা সকলেই ছিলেন ইমাম হুসায়েনের বংশধর এবং নবী প্রচারিত ইসলামের পতাকাবাহক।

দুই শতাব্দীরও অধিককাল দুঃখ-কষ্ট ও নির্যাতন সহ্য করার পর ইমাম বংশ কিভাবে আব্বাসীয় খলীফাদের সতর্ক দৃষ্টি সত্বেও ধীরে ধীরে শক্তি সঞ্চয় করে এবং পরিশেষে উত্তর আফ্রিকায় ফাতেমীয় সাম্রজ্য ও খিলাফৎ প্রতিষ্ঠা করিতে সামর্থ হয়, সেই বিস্ময়কর কাহিনীর বিবৃতি দ্বারা গ্রন্থের সমাপ্তি টানা হয়েছে। উপসংহারে আব্বাসীয় শাসনের কিভাবে অবসান হয় এবং বিভিন্ন যুগে খিলাফত কিভাবে এক বংশ হইতে অন্য বংশে হস্থ ।ন্তরিত হয় তাহার একটি ধারাবাহিক বিবরণী, কিছুটা অপ্রাসঙ্গিক হইলেও জিজ্ঞাসু পাঠকের কৌতুহল নিবৃত্তির জন্য সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে একটি কথা মনে রাখা দরকার। ইমামদের বিরুদ্ধে পক্ষের ভিতরও অনেক বিরাট ব্যক্তিত্ব

– সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহাদের পুর্ণাঙ্গ চরিত্র অঙ্কন এই গ্রন্থে সম্ভবপর হয় নাই। তাই যে টুকু বলা হইয়াছে তাহাই তাঁহাদের সম্পর্কে শেষ কথা নয়।

কারবালার কাহিনী সম্পর্কে একটি কথা উল্লেখ না করিয়া পারা যায় না। কারবালার যুদ্ধ একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। কিন্তু ভক্তদের লেখনিতে উহার অনেক অতিরঞ্জন ঘটিয়াছে। দীর্ঘ তেরো শত বৎসর ধরিয়া কবি-সাহিত্যিকেরা উহার উপর তুলিকা চালাইতে চালাইতে উহাকে উপকথার পর্যায়ে দাঁড় করাইয়াছেন। ন।না কাল্পনিক গল্পের অবতারণা দ্বারা মুল কাহিনীকে যথাসাধ্য মর্মস্পর্শী করার চেষ্টা চলিয়াছে। নারী ঘটিত প্রণয় কাহিনীও উহাতে সংযোজিত হইয়াছে। দৃষ্টান্ত স্বরুপ বলা যাইতে পারে, আব্দুল জব্বার ও তৎপত্নী যয়ন।ব সংক্রান্ত কাহিনী নিতান্তাই কাল্পনিক। মুহম্মদ হানাফিয়ার যুদ্ধে গমন ও ইয়াযিদের পশ্চাদ্ধাবন ইত্যাদি কিচ্ছারও কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি নাই। হানাফিয়া মোটেই যুদ্ধে যান নাই। ইয়াযিদও শিকারে গিয়া আকস্মিক দুর্ঘটনায় মৃত্যুমুখে পতিত হন, মুহম্মদ হানাফিয়া কর্তৃক কখন ও আক্রান্ত হন নাই। ইমাম হুসায়েনের কুফা গমনের পুর্বে মুসলিম বিন আকিল কুফায় প্রেরিত হইয়াছিলেন গোপনীয় দৌত্য কার্যে। সেক্ষেত্রে মুসলিমের দুইটি নাবালক পুত্রকে সঙ্গে লইয়া যাওয়া অস্বাভাবিক। অথচ তাঁহার দুই সুকুমার পুত্রে নিষ্ঠুর হত্যার এক করুণ চিত্র সযত্নে অঙ্কিত করা হইয়াছে পাঠকদের চক্ষুতে অশ্রু আনয়নের জন্য । এই ধরনের বহু অমুলক কিচ্ছা মুল ইতিহাসকে আচ্ছন্ন করিয়াছে। ফলে এখন আসল ও নকল পৃথক করা কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। এজন্য মুল ইতিহাস হইতে মালমসলা সংগ্রহ করিতে আমাকে বহু পরিশ্রম করিতে হইয়াছে। এক্ষণে পাঠকগণের ইহা চিত্তরঞ্জনে সমর্থ হইলে সকল পরিশ্রম সার্থক বিবেচনা করিব।

কারবালা গ্রন্থ প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৫৭ সনে। তারপর ১৯৬৩ সনে উহা পুনর্মুদ্রিত হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় ফর্মাগুলি প্রেস হইতে ডেলিভারী লওয়ার পুর্বেই ১৯৬৪ সনের জানুয়ারী মাসে, আকস্মিক ভাবে আগুনে

পুড়িয়া যায়। তাই সম্পূর্ণ গ্রন্থখানি আবার নুতন করিয়া মুদ্রিত করিতে হইল। ইহাতে সময়লাগিল অনেক। ছাপার ভুল বর্তমান কালে অপরিহার্যঃকাজেই লেখকের ত্রুটি স্বীকার এ সম্পর্কে অবশ্য করণীয়, যদিও তাহাতে পাঠকগণের বিরক্তির কিছুমাত্র লাঘব হইবে বলিয়া আশা করা যায় না। ইতি-

নবেম্বর, ১৯৬৫ সন। —লেখক

কারবালা

ও

ইমাম বংশের

ইতিবৃত্ত

বিষয় সূচী

কারবালা যুদ্ধের পটভূমিকা

ইসলামের প্রাথমিক ইতিহাসে যে সকল শহর সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল তন্মধ্যে মক্কার পরেই মদীনা, কুফা ও দামেস্ক অন্যতম। কারবালার মর্মান্তিক করুণ কাহিনীর সহিত এই তিনটি শহর বিশেষ ভাবে জড়িত। মদীনার পরিচয় অনাবশ্যক। উহা হিজায প্রদেশের পশ্চিমাঞ্চলে অবস্থিত এবং মক্কা হইতে দুইশত ষা'ট মাইল উত্তরে। মদীনা হইতে প্রায় ছয় শত মাইল উত্তর-পুর্বে কুফা। এক কালে উহা ইরাক প্রদেশের রাজধানী ছিল। ইরাকের পশ্চিমেই সিরিয়া। উহার রাজধানী দামেস্ক শহর মদীনা হইতে প্রায় সাত শত মাইল উত্তরে এবং কুফা হইতে অনুন চারি শত মাইল পশ্চিমে। এই তিনটি শহরে যোগ করিলে যে ত্রিভুজের সৃষ্টি হইবে উহার অন্তর্বতী যাবতীয় স্থান বালুকাময় মরুভুমি।

কুফার ইতিহাস বিচিত্র। ইসলামের অভ্যুত্থানের পুর্বে উহা একটি গণ্ডগ্রাম ছিল। কিন্তু কুফার বাজার ছিল একটি বিশিষ্ট বাণিজ্য কেন্দ্র। হিজায, সিরিয়া ও ইরাণ দেশের বণিকেরা এখানে পণ্য লইয়া আসিত। এই পথে অন্যত্র যাইবার কালেও তাহারা কুফার মঞ্জিলে রাত্রি যাপন করিত। উহার উত্তর-পুর্ব দিক দিয়া প্রবাহিত বিখ্যাত ইউফ্রেটিস বা ফোরাত নদী। স্থানটি স্বাস্থ্যকর বলিয়া পারস্য বিজয়ী সেনাপতি সা'দ পারস্যের পুর্বতন, রাজধানী মাদাইনের পরিবর্তে এইখানে বসিয়া ইরাক, পূর্ব-আরব ও পারস্য দেশ শাসন করিতেন। মাদাইন হইতে বহু মণিমাণিক্য আনিয়া তিনি তাঁহার এই নুতন রাজধানীকে সুসজ্জিত করেন। ক্রমে ইহা একটি বৃহৎ নগরে পরিণত হয়। পরবর্তী কালে মুসলিম জাহানের চতুর্থ খলিফা হযরত আলী মদীনা হইতে এইখানে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন এবং এই স্থানেই তিনি নিহত হন। এই কুফায় বসিয়াই ইয়াযিদ সেনাপতি কুখ্যাত আব্দুল্লাহ্ ইবনে যিয়াদ কারবালায় ইমাম হুসাইনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করিতেন।

কুফার প্রায় দুইশত মাইল দক্ষিণ-পূর্বে ফোরাত নদী টাইগ্রিসের সহিত মিলিত হইয়াছে। উভয়ের সঙ্গমস্থলে অবস্থিত ইরাকের প্রসিদ্ধ বন্দর বসরা, পারস্য উপসাগরের মোহনা হইতে প্রায় সত্তর মাইল উত্তরে। হযরত ওমর এই বন্দরের প্রতিষ্ঠা করেন, পূর্বদেশ সমূহের সহিত আরব জাতির বাণিজ্যের সুবিধার জন্য। কুফা হইতে প্রায় সত্তর মাইল উত্তর-পূর্বে এবং বসরা হইতে প্রায় আড়াই শত মাইল উত্তরে, টাইগ্রীস নদীর উভয় তীরে, আরব্য উপন্যাসের স্বপ্নপুরী বাগদাদ নগরী অপূর্ব জৌলসে ঝলমল করিতেছে। উহা আরব আযমের যোগসূত্র এবং সেমিটিক ও পারসিক সভ্যতার মিলন ক্ষেত্র। খৃষ্টের জন্মের অন্যুন তিন হাজার বৎসর পূর্বে এই ইরাক প্রদেশের উত্তর অঞ্চলে প্রাচীন এসীরীয় সাম্রাজ্য এবং দাক্ষণ অঞ্চলে প্রসিদ্ধ ব্যাবলনীয় সাম্রাজ্য গড়িয়া উঠিয়াছিল।

ইরাকের পশ্চিমেই পূর্ব সিরিয়ার বিস্তীর্ণ মরুভূমি ধু ধু করিতেছে। এই দুস্তর মরুভূমির ভিতর মনুষ্য বসতি অতি বিরল। কচিৎ কোথায় দেখা যায়, কোনও প্রশ্রবণকে আশ্রয় করিয়া, উহার তীরবর্তী খর্জুর বিথীকার সচ্ছিদ্র ছায়াতলে, বহুকালের ক্ষুদ্র বেদুইন পল্লী দারুণ খরদাহে ঝিমাইতেছে। এই মরুভূমিই ফোরাত নদীর তীরবর্তী কারবালা প্রান্তরে গিয়া মিশিয়াছে। কুফা হইতে প্রায় চল্লিশ মাইল উত্তর-পশ্চিমে এবং ফোরাত নদীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত এই সেই ভয়াবহ প্রান্তর কারবালা, যার নামে আজিও সারা বিশ্বের মুসলমান শিহরিয়া উঠে। বহু সাম্রাজ্যের উত্থান-পতনের সাক্ষী এই ফোরাত নদী। এখানে উহা দক্ষিণ বাহিনী। পরে উহা পূর্বাঞ্চলে কিঞ্চিৎ বাঁকিয়া ইরাকের বুক চিরিয়া আবার দক্ষিণ মুখে সাগর সন্ধানে ছুটিয়াছে।

সিরিয়া দেশ প্রাচীন সভ্যতার লীলা ভূমি। পারসিকরা উহাকে মুলকে শাম" বা শামদেশ বলিত। দূর অতীতে কোনও সময়ে পারসিকদের অধীন থাকিলেও ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে উহা দীর্ঘকাল বাইজেনটাইন রোমক সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। রাজধানী দামেস্কের পুর্বপার্শ্ব দিয়া প্রবাহিত ক্ষুদ্র এক পার্বত্য নদী। নদীজলের স্বচ্ছ মুকুরে দামেস্কের গগণচুম্বী সৌধমালা অহর্নিশ প্রতিবিম্বিত হইতেছে। ইরাক যেমন প্রতিবেশী পারসিক সভ্যতা

দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিল সিরিয়ার জাতীয় জীবন তেমনি কনস্ট্যান্টিনোপলের রোমক আদর্শের দ্বারা অনুরঞ্জিত হইয়াছিল। দামেস্ক নগরীকে রোমকের বিলাস-ব্যসনের প্রমোদগারে পরিণত করিয়াছিল। ভোগবিলাসের যে উচ্ছৃঙ্খল মনোবৃত্তি একদা তথায় প্রশ্রয় পাইয়াছিল, ইসলামী শাসনের আসিয়া উহার সম্যক্ সংশোধনের অবকাশ ঘটে নাই। ইসলামী ভাবধারায় সিরিয়াবাসীদের মানসিকতা পূর্ণভাবে রূপান্তরিত হইবার পুর্বেই খোলাফায়ে রাশেদীনের পতন ঘটে এবং তাঁহাদের সাত্বিক আদর্শের স্থলে পুনঃ প্রবর্তিত হয় উমাইয়া আমলের ভোগ ও মাৎসর্য্যের তামসিক নীতি।

ইসলামের অভিনব সংস্কৃতি ইরাকেও দৃঢ় ভিত্তিক হইতে পারে নাই দুইটি কারণে। এক ইসলামের আন্তর্বিপ্লব; দ্বিতীয়, উমাইয়া প্রভুত্বের সম্প্রসারণ। মহানবীর চরিত্র প্রভাবে ত্যাগ, সংযম ও ভ্রাতৃত্বের যে মহান আদর্শ মদীনার বুকে বিকশিত হইয়াছিল, তাঁহার তিরোধানের পর উহার আন্তর্জ্যোতি ক্রমে নিষ্প্রভ হইতে থাকে। সেই সুযোগে ইরাক ও সিরিয়ায় অতীতের ভোগবিলাস ও রাজসিকতার পুরাতন কঙ্কাল আবার নব কলেবরে সজীব হইয়া উঠে।

মদীনার কৃষ্টি ছিল সম্পুর্ণ স্বতন্ত্র প্রকৃতির। পশ্চিম হিজাযের পর্বত মালার অঙ্কে পালিত এই শান্ত-সভ্য প্রাচীন নগরী আবহমানকাল হইতে নিজের স্বাধীনতা ও বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিয়া চলিয়াছে। পারসিকরা যখন আরব দেশ জয় করে তখনও মক্কা ও মদীনার লোকেরা তাহাদের স্বাধীনতা হারায় নাই। কারণ ইরান হইতে সুদুরে অবস্থিত ও স্বল্প আয় বিশিষ্ট হিজায প্রদেশের শাসন সংরক্ষণের জন্য পারস্য সম্রাট কোনও দিন উৎকণ্ঠা প্রদর্শন করেন নাই। ফলে মক্কার ন্যায় মদীনার লোকেরাও বরাবর নিজেদের শাসন-ব্যবস্থা নিজেরাই চালাইয়া যাইত। তারপর আসিল ইসলামী নয়া যমানা। তখন নবীর আদর্শে, নবীর শিক্ষায়, এই অনুকুল ভূমিতে আঙ্কুরিত হইল এক নুতন সভ্যতা, নুতন মানবতা। প্রতিষ্ঠিত হইল সেখানে এক নতুন রাষ্ট্র, যার বৈশিষ্ট্য ছিল-ব্যক্তির দিক দিয়া আত্মশুদ্ধি, ত্যাগ ও প্রেম এবং সমাজের দিক দিয়া সাম্য, মৈত্রী এবং সেবা।

সিরিয়া ও ইরাকের রাজসিক আদর্শের প্রবল মোহ পাছে মদীনায় লালিত ইসলামী সাত্ত্বিক রাদর্শকে ডুবাইয়া দেয়, এই আশঙ্কায় খোলাফায়ে রাশেদীনের শেষ স্তম্ব হযরত আলী, ৬৫৬' খৃষ্টাব্দে মদীনা হইতে রাজধানী কুফায় স্থানান্তরিত করিয়া নিজেকে দুই বিরোধী আদর্শের সংঘাত স্থলে স্থাপিত করেন। কিন্তু নিয়তির বিধান ছিল তাঁহার প্রতিকূলে। অল্প দিন যাইতে না যাইতে এক গুপ্ত ঘাতকের হস্তে তাঁহার জীবনের অবসান ঘটিলে (৬৬১ খৃঃ, ৪০ হিঃ) পাষাণ প্রতিরোধ অকালে ধ্বসিয়া পড়িল। অতঃপর রাজসিক শক্তির বিজয় শকট অসহায় মৌলিক ইসলামের বুকের উপর দিয়া বর্ধিত বেগে আপন জয়যাত্রা সুচিত করিল।

হযরত আলীর এই অপ্রত্যাশিত মৃত্যুতে ইসলামী ত্যাগ ও সাত্ত্বিকতার যে 'মৌলিক' আদর্শ অকালে মুষড়িয়া পড়ে, বিশ বৎসর পরে নবীর প্রিয় দৌহিত্র ইমাম হুসাইনের ভিতর দিয়া সেই আদর্শ চাহিয়াছিল পুনরায় পুনর্জোতিতে আত্মপ্রকাশ। কারবালার যুদ্ধ এবং হুসাইনের আত্মদান ভোগ-বিলাসের আসুরিক শক্তির বিরুদ্ধে সেই সাত্ত্বিক আদর্শের সংঘাতের মর্মান্তিক পরিণতি। হুসাইন সে সংঘর্ষে জয়ী হইতে পারেন নাই, শহীদ হইয়াছিলেন। কিন্তু শহীদী খুনে তিনি ইসলামকে পুনর্জীবিত করিয়া যান। বাঁচিয়া থাকিলে হয়ত যাহা করিতে পারিতেন না, জীবনের বিনিময়ে তিনি তাহা সম্পন্ন করিয়া গেলেন। তিনি মরণজয়ী মহাপুরুষ। তাঁহার আত্মত্যাগের অপূর্ব কাহিনী যুগ যুদ ধরিয়া বিশ্বের কাব্যে, ইতিহাসে, সাহিত্যে ও সঙ্গীতে গীত হইবে এবং তাঁহার স্বজাতিকে ধর্মীয় চেতনায় উদ্বৃদ্ধ করিতে থাকিবে। 'হয় কারবালা মুসলিম জাতিকে নুতক করিয়া জিন্দা করিবে।'

কুরায়েশ বংশ

কুরায়েশদিগের পূর্বপুরুষ বিখ্যাত ফিহ্র্ কুরেশ অনুমান ২০০ খৃষ্টাব্দে মক্কায় বসতি স্থাপন করেন। কুরেশ অর্থ সওদাগর। এই সৌম্যদর্শন সাহসী আগন্তুক শৌর্যবীর্যে ও বুদ্ধিমত্তায় অল্প কালের ভিতর মক্কাবাসীদের চিত্তজয় করেন ও তাহাদের ভিতর প্রাধান্য অর্জন করেন। ফিহ্র্ কুরেশের সন্তান-সন্ততি কালক্রমে বহু শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হইয়া মক্কা ও তাহার চুতুষ্পার্শ্বে ছড়াইয়া পড়ে। ইহারা সকলেই "কুরায়েশ" নামে পরিচিত। কুরায়েশ বংশ ছাড়া আরও কতিপয় বংশ পূর্ব হইতে মক্কা অঞ্চলে বাস করিত। কিন্তু যে কা'বা গৃহের জন্য মক্কা নগরী সমগ্র আরব ভূমির তীর্থস্থানে পরিণত হইযাছিল, সেই কা'বার রক্ষক ও সেবাইত হইলেন কুরায়েশগণ। সেই হিসাবে মক্কায় কুরায়েশদের মর্যাদা ছিল সর্বাধিক।

ফিহ্র্ কুরেশের বংশের ষষ্ঠ পুরুষ সুপ্রসিদ্ধ কুসাই জীবনের বহু বিপর্যয় ও রোমঞ্চক ঘটনার ভিতর দিয়া পরিশেষে মক্কার পৌরসভাপতির আসন লাভ করেন এবং নগরের সকল রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় ভূষিত হইয়া সবিশেষ গৌরবান্বিত হন। ৪৮০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার এই গৌরবোজ্জল জীবনের অবসান ঘটিলে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র আব্দেদ্দার এই সকল ক্ষমতার অধিকারী হন। কিন্তু আব্দেদ্দার অপেক্ষা তদীয় কনিষ্ঠ আব্দে মানাফ ছিলেন অধিকতর কর্মকুশল ও প্রভাবম্পন্ন ব্যক্তি। আব্দেদ্দারের মৃত্যু হইলে ঐ সকল ক্ষমতা আব্দে মানাফের হস্তগত হয়। তখন আব্দে-দ্দারের পুত্রগণ ছিল অল্প বয়স্ক। আব্দে মানাফের মৃত্যুর পর আব্দে-দ্দারের পুত্রপৌত্রেরা তাহাদের হৃত মর্যাদা পুরুদ্ধার করিতে চেষ্টা করে, কিন্তু কৃতকার্য হয় নাই। বয়ঃজ্যেষ্ঠ এবং অধিক প্রতিপ্রত্তিশালী মানাফ-পুত্রগণই মক্কার উপর কর্তৃত্ব করিতে থাকে। ইহাতে কুশাই এর

বংশের ভিতর দুইটি শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী শাখার উদ্ভব হয় এবং বিশাল কুরায়েশ গোত্রের অন্যান্য শাখাগুলি কেহ এ পক্ষে, কেহ অপর পক্ষে যোগদান করিয়া এক রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধের সুচনা করে। কিন্তু রক্তক্ষয় কার্যতঃ ঘটিতে পারে নাই শুধু একটি আপোষ মীমাসার দরুনে। এই মীমাংসার ফলে মক্কায় আগত তীর্থযাত্রীদের খাদ্য ও পানীয় সরবরাহের ভার পড়ে মানাফ-পুত্র হাসিমের উপর। পৌরশাসন, যুদ্ধ চালনা ইত্যাদি অন্যান্য সমস্ত ক্ষমতা বর্তে আব্‌দে-দ্দারের বংশে। বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী মহাবীর তাল্‌হা এবং কা'বা ঘরের চাবী রক্ষক ওসমান ছিলেন এই বংশের প্রসিদ্ধ পুরুষ। কা'বা তীর্থের প্রধান আয়ের অধিকারী হইয়া অল্প দিনের ভিতর হাশিম বেশ সমৃদ্ধ হইয়া উঠিলেন। তাঁহার আচরণও ছিল রাজোচিত। পক্ষান্তরে, আব্‌দে-দ্দারের বংশে শাসন-সংক্রান্ত নানা অধিকার ন্যস্ত থাকা সত্ত্বেও সমৃদ্ধির খর্বতায় তাঁহার ক্রমশঃ হীনপ্রভ হইতে লাগিলেন। ফলে হাশিমীদের উপর তাহাদের ঈর্ষা ক্রমশঃ বাড়িতে থাকে।

কালে আবার মানাফ্ গোষ্ঠিতেও ফাটল ধরে উদ্ধত উমাইয়ার কারণে। তাঁহার পিতা আব্‌দে-শাম্‌স ছিলেন মানাফের জ্যেষ্ঠ পুত্র, আর পিতৃব্য হাশিম ছিলেন মানাফের দ্বিতীয় পুত্র। ইহাদের বংশধরদের ভিতর গৃহবিবাদ কিভাবে শুরু হয় তাহা নিম্নে বলিতেছি।

আব্‌দে মানাফের পুত্রদের প্রতিপত্তির কথা পুর্বেই উল্লেখিত হইয়াছে। বৈদেশিক রাজন্যবর্গের সহিত কুরায়েশদের রাষ্ট্রীয় সম্পর্ক ইহাদেরই মারফতে নিয়ন্ত্রিত হইত। মানাফের দ্বিতীয় পুত্র হাশিম ছিলেন ইহাদের ভিতর অন্যতম। হাশিম রোমক শাসনকর্তাদের সহিত সন্ধি স্থাপিত করিয়া রৌম-সম্রাটের নিকট হইতে এক ফরমান আদায় করেন, যার ফলে কুরায়েশ বণিকগণ সিরিয়ায় নির্বিঘ্নে বাণিজ্য করিতে পারিত। আব্‌দে-মানাফের অপর পুত্র আব্‌দে শাম্‌স্ সম্রাট নাজ্জাসীর সহিত সন্ধি স্থাপন করেন। তাহার ফলে কুরায়েশ বণিকেরা আবিসিনিয়ায় বাণিজ্য সৌকর্য লাভ করে। মানাফের অপর দুই পুত্র নওফল ও আল্ মুত্তালিব পারস্য সম্রাটের সহিত সৌহার্দ স্থাপন করিয়া ইরাক ও ফারস্ প্রদেশে মক্কাবাসীদের বাণিজ্যের পথ উন্মুক্ত করেন।

কিন্তু হাশিমের অত্যধিক প্রতিপত্তি তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র (আব্‌দে শাম্‌সের পুত্র) উমাইয়াকে পীড়া দিত। উমাইয়া সর্বদাই পিতৃব্য হাশিমকে হেয় করিবার চেষ্টা করিত। হাশিমের উপর নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য সে এক প্রকাশ্য সভা আহ্বান করে। আরব দেশে তৎকালে এইরূপ সভা আহ্বানের রীতি প্রচলিত ছিল। তাহাতে প্রতিদ্বন্দ্বীদের গুণ বিচার হইত। উমাইয়া একে ভ্রাতুষ্পুত্র, তাহাতে আবার বয়ঃ কনিষ্ঠ, এজন্য হাশিম নিজে এরূপ প্রতিযোগিতায় নামা অযৌক্তিক বিবেচনা করিলেও গোত্রপতিরা তাঁহাকে নিরুত্তর থাকিতে দিল না। হাশিম তখন শর্ত করিলেন, প্রতিযোগিতায় পণ হইবে পঞ্চাশটি কৃষ্ণ-চুক্ষু উষ্ট্র এবং দশ বৎসর নির্বাসন মক্কাভূমি হইতে। এই পণে দাম্ভিক উমাইয়া সম্মত হইয়া বৈঠকে উপস্থিত হইল। উভয় প্রতিদ্বন্দ্বী নিজ নিজ কীর্তিকলাপ ব্যক্ত করিলেন। অতঃপর মধ্যস্থগণ হাশিমকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া ঘোষণা করিলেন। ক্রুদ্ধ উমাইয়া দশ বৎসরের জন্য সিরিয়ায় চলিয়া গেল। তাহার প্রদত্ত পঞ্চাশটি উষ্ট্র বধ করিয়া হাশিম মক্কাবাসীদিগকে বিরাট ভোজে পরিতুষ্ট করিলেন। ইহাতে নির্বাসিত উমাইয়া ক্রোধের জ্বালা আরও বর্দ্ধিত হইল। কিন্তু এই নির্বাসনেই সিরিয়ার সহিত তাঁহার বংশের যোগ সূত্র স্থাপিত হয়।

উমাইয়ার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র হারেব উত্তরাধিকাসূত্রে পিতার প্রতিহিংসা আয়ত্ত করিল এবং হাশিম পুত্র আবদুল মুত্তালিবের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে লাগিল। আবদুল মুত্তালিব পিতার সদ্‌গুণরাজির অধিকারী হইয়াছিলেন। হাশিমের ন্যায় আবদুল মুত্তালিবও রাজোচিত উদারতা ও সমারোহের সহিত তীর্থকারীদিগের সৎকার করিতেন। মদিনার শক্তিশালী খাজরাজ বংশ ছিল তাঁহার মাতুলকুল। মক্কার অন্যতম প্রসিদ্ধ খোজাবংশের সহিত তাহার অন্যতম ব্যক্তিগত সন্ধিবন্ধন ছিল। অন্যান্য কুরায়েশগণ সাধুতা ও উচ্চ অন্তঃকরণের জন্য তাঁহাকে সম্ভ্রমের চক্ষে দেখিত। এইসব কারণে বৈদেশিকগণ তাঁহাকে মক্কার 'মুকুটহীন রাজা' বলিত। ইয়েমেনের শাসনকর্তা আব্‌রাহা যখন সসৈন্যে কা'বাগৃহ ধ্বংস করিতে আসেন এবং মক্কার প্রধানগণকে উহা সমর্পনের জন্য আহ্বান

করেন তখন তিনি আবদুল মুত্তালিবকেই তাঁহাদের মুখপাত্র হিসাবে গ্রহণ করেন এবং তৎপ্রতি রাজার সম্মান প্রদর্শন করেন। এ হেন মুত্তালিবকেও উদ্ধত হারেবের সহিত মর্যাদার প্রতিযোগিতার প্রকাশ্য সভায় দাঁড়াইতে হইয়াছিল। মধ্যস্থদের বিচারে হারেব হারিয়া গেল এবং জন্মের মত মুত্তালিব গোত্রের সংশ্রব বর্জন করিল। এইভাবে জ্ঞাতি বিদ্বেষের বিষাক্ত ধারা বংশানুক্রমে উমাইয়াদের সন্তান-সন্ততির ভিতর সংক্রামিত হয় এবং আব্‌দে-মানাফের বংশ দুই প্রতিদ্বন্দ্বী শাখায় বিভক্ত হয়।

হারেবের পুত্রই বিখ্যাত কুরায়েশ-নেতা এবং নবীর প্রধানতম শত্রু আবু সুফ্ইয়ান। আর আবু সুফ্ইয়ানের পুত্র হইতেছেন আমীর মু'আবিয়া। বদর ও ওহোদের যুদ্ধের সময় উমাইয়া বংশ এবং আব্‌দে-দ্দারের বংশ একযোগে হযরত রসুল, হযরত আলী, আমীর এবং হামযা প্রমুখ হাশেমী বংশীয়দের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে। বদর যুদ্ধে কুরায়েশ বাহিনীর পতাকাধারী ছিলেন আব্‌দে-দ্দার বংশীয় প্রসিদ্ধ যোদ্ধা তালহা এবং উদ্যোক্তাদের ভিতর অন্যতম ছিলেন উমাইয়ার পৌত্র আবু সুফ্ইয়ান।

অপর পক্ষে আবদুল মুত্তালিব ছিলেন একাদশ পুত্রের জনক। এই সকল পুত্রের ভিতর আবুতালেব, আমীর হামযা, আব্বাস ও আবদুল্লাহ প্রমুখ ইতিহাস প্রসিদ্ধ পুরুষগণ মুসলিম জাহানে সুপরিচিত। আবদুল্লার গৃহে জন্মগ্রহণ করেন মহানবী হযরত মুহম্মদ (সঃ)। হাম্‌যা বীরত্বের জন্য প্রখ্যাত। আব্বাস হইলেন বাগদাদের হারুণর রশীদ প্রমুখ আব্বাসীয় খলীফাদের পূর্ব পরুষ। উদারতা ও শান্তিপ্রিয়তা ছিল এই বংশের বৈশিষ্ট্য।

পক্ষান্তরে, উমাইয়াগণ ছিল ক্ষাত্রবাবাপন্ন ও কুটনীতিতে বিচক্ষণ। আবু সুফ্ইয়ানের ব্যক্তিত্বের প্রভাবে উমাইয়াবংশ পরবর্তী কালে অতিশয় ক্ষমতাশালী হইয়া উঠে। যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্য চালনার অধিকার ছিল ইহাদের হস্তে। বহির্বাণির্জ্যের দ্বারা ইহারা যথেষ্ট সমৃদ্ধিও অর্জন করে এবং এই দিক দিয়া ইহারা হাশিমী বংশকে ছাড়াইয়া যায়। হযরতের জীবনী গ্রন্থে দেখা যায়; রোমসম্রাট্ হেরাক্লিয়াস হযরতের নবুয়ৎ সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে আবু সুফ্ইয়ানের সহিত বাক্যালাপ করিতেছেন। আবু সুফ্ইয়ানের পুত্র মু'আবিয়া নিজ যোগ্যতায় সিরিয়ার ন্যায় সমৃদ্ধ দেশের শাসনভার লাভ

করেন এবং তত্রত্য বিশাল সেনাবাহিনীর অধিনায়ক হইয়া স্বীয় বংশকে সার্বভৌম ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করেন। ইহার পর তিনি প্রতিদ্বন্দ্বী হাশিমী বংশকে উচ্ছেদ করিতে কৃতসঙ্কল্প হন। তাঁহার সেই সঙ্কল্পের প্রথম প্রকাশ আলীর বিরুদ্ধে তাঁহার বিদ্রোহে ও সিফ্‌ফিনের যুদ্ধে এবং উহার শেষ পরিণতি কারবালায়।

কুরায়েশদের বংশতালিকা
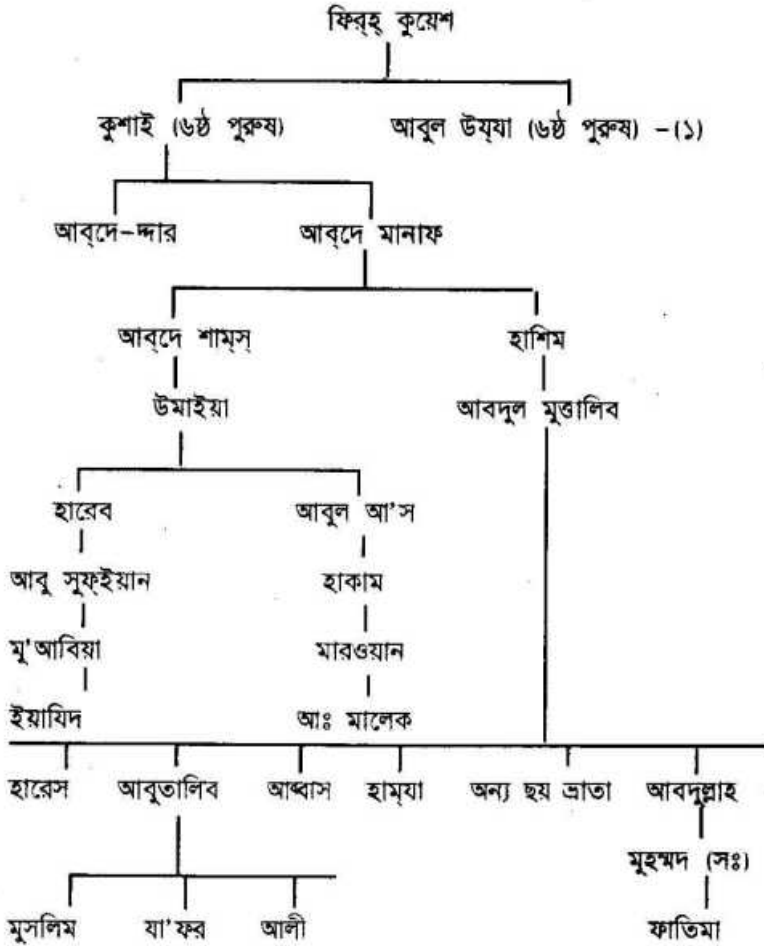
(১) আবুল উয্‌যা বংশের ষষ্ঠ পুরুষ যুবায়ের ছিলেন আবুবকরের জামাতা। ই'হারই পুত্র আবদুল্লাহ্‌ ইবনে যুবায়ের মক্কায় খলিফা বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন।

পূর্ব ইতিহাস

মদীনার সাধারণতন্ত্র ও খিলাফতের প্রশ্ন

দীর্ঘ তেরশত বৎসরের ব্যবধান যাঁহার পুণ্যস্মৃতি ম্লান করিতে পারে নাই, বিশ্বের চল্লিশ কোটি মুসলিম যাহাকে প্রতিদিন গভীর শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করিয়া থাকে, সেই মহান নবীজীর দেহত্যাগের অল্পদিন পরে তাঁহারই শিষ্যগণ কিরূপে তাঁহার বংশের প্রতি নিষ্ঠুরতা করিতে প্ররোচিত হইয়াছিল এবং মুসলিম নামধারী কতিপয় লোকই বা কেন তাঁহার বংশের বিলোপ সাধনে তৎপর হইয়াছিল, অতঃপর সেই বিস্ময়কর ও মর্মন্তুদ কাহিনী বিবৃত করিব।

নবী-জীবনের শেষ দশ বৎসরে, তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া মদীনায় যে ক্ষুদ্র মুসলিম রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল উহা ছিল স্বায়ত্বশাসিত একটি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান। সাম্রাজ্যবাদের কাঠামো তাহাতে ছিল না। হযরত ছিলেন একাধারে উহার ইহলৌকিক সকল বিষয়ে ব্যবস্থাপক, শাসক, ধর্মগুরু ও রাষ্ট্রনায়ক। তাঁহার স্বহস্তে নির্মিত মসজিদে নবুবীর অভ্যন্তরে চলিত প্রাত্যহিক উপাসনা এবং ওয়ায, আর বহিঃ আঙ্গিনায়, খর্জুর পাতার সচ্ছিদ্র ছায়ায় বসীত শাস্ত্র সমাজ ও যুদ্ধবিগ্রহ বিষয়ক দরবার। হযরতের পাদমুলে বসিয়া নিত্য যাঁহারা কৌতুহলী বালকের মত তাঁহার মুখে ধর্মকথা শ্রবণ করিতেন তাঁহারাই আবার প্রয়োজন মত রণক্ষেত্রে সৈন্যবাহিনী পরিচালনা করিতেন। প্রত্যেক গৃহস্থের শয়ন কক্ষই ছিল রাষ্ট্রের অস্ত্রাগার। আর তাহাদের নবজাগ্রত ঈমান ছিল ন্যায়-নীতির রক্ষাকারী সতর্ক পুলিশ-প্রহরী। এই অবস্থায় হযরত যখন তাঁহার স্বহস্তে লালিত শিশু-রাষ্ট্রটিকে অঙ্কচ্যুত করিয়া মহাপ্রয়াণ করিলেন, তখন স্বভাবতই উহার অভিভাবকত্ব লইয়া তাঁহার শিষ্যগণের ভিতর মতানৈক্য দেখা দিল। হযরতের বিরাট ব্যক্তিত্বের প্রভাবে বনি-হাশিম ও বনিউমাইয়াগণের

ভিতর যে সাময়িক সৌহার্দ্য ও সহযোগিতার সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছিল, তাহাতে আবার বিচ্ছেদের দুষ্টবিষ অনুপ্রবেশ করিল।

হযরত তাঁহার কোনও প্রতিনিধি নির্বাচিত করিয়া যান নাই। তাঁহার দেহত্যাগের পর নেতৃহীন নগরীর চুতর্দিকে মহা হুলস্থুল পড়িয়া গেল। হযরত আবুবকর ও ওমর তখন সকল মুসলমানকে সান্তনা দিতে থাকেন। ওদিকে আনসারগণ (মদীনার সাবেক অধিবাসীরা) সকলে সমবেত হইয়া সা'দ ইবনে ইবাদাকে নেতৃত্বে বরণ করিয়া সকলে তাঁহার কর চুম্বন করিল। মহাজেরিন (মক্কা হইতে আগত) দলে এই সংবাদ পৌঁছিবা মাত্র হযরত আবুবকর, হযরত ওমর ও আবু ওবায়দা অবিলম্বে আনসারদের সভায় উপনীত হইলেন। আবুবকর তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভ্রাতৃগণ! আপনারা হযরতের আশ্রয় দাতা, আপনারা বরাবর হযরতের সহিত সদ্ব্যবহার করিয়া আসিয়াছেন। হযরত মৃত্যুকাল পর্যন্ত আপনাদের উপকার বিস্মৃত হন নাই এবং আমাদিগকে সতর্ক করিয়া গিয়াছেন যাহাতে আপনাদের গৌরব ও সম্মান অক্ষুন্ন থাকে। এক্ষণে আপনাদের নিকট আমার অনুরোধ আপনারা মুসলিম জগতের খিলাফৎ কুরায়েশ বংশের ভিতর রাখুন। কেননা, হযরত বলিয়া গিয়াছেন, 'আল্ আয়িমাতো মিনাল কুরায়েশ'- অর্থাৎ ইমাম কুরায়েশ বংশ হইতে হইবে। কারণ কুরায়েশ ব্যতীত অন্য কোনও গোত্রকে আরবের সকল গোত্র মানিয়া চলে না। ইহা হইলে আপনাদের সহিত আমাদের বরাবর হৃদ্যতা থাকিয়া যাইবে। অন্যথা মহা বিরোধ ও গৃহযুদ্ধের আশঙ্কা মনে হইতেছে, ঋষিকর আবুবকরের বাক্য আনসার মর্মস্পর্শকরিল। তাহারা সম্মত হইল। বিচক্ষণ ওমর তৎক্ষণাৎ অগ্রসর হইয়া হযরত আবুবকরকে বলিলেন, আপনি হস্ত প্রসারিত করুন, আমি সর্ব প্রথম আপনার কর চুম্বন দ্বারা বায়াৎ (আনুগত্য) স্বীকার করিতেছি। কুরায়েশদিগের ভিতর আপনি প্রবীণ এবং সর্বাপেক্ষা সম্মানিত ব্যক্তি! আবুবকর আর দ্বিরুক্তি করিলেন না, হস্ত প্রসারিত করিলেন। প্রথমে হযরত ওমর ও আবুওবায়দা এবং পরে উপস্থিত জনমণ্ডলী তাঁহার করচুম্বন দ্বারা বশ্যতা স্বীকার করিয়া তাঁহাকে নেতৃত্বে বরণ করিলেন।

আনসারগণ কুরায়েশদের অনুকূলে তাহাদের দাবী প্রত্যাহার করিলেও খিলাফতের প্রশ্ন লইয়া মুসলিমদের ভিতর চাঞ্চল্যের সহসা অবসান হইল না। তাহাদের মরণাশ্রিত মহানেতার শূন্য আসন কে পূরণ করিবে, কুরায়েশদের ভিতর হইতে কে তাঁহার প্রতিনিধিত্ব করিবার ন্যায়তঃ অধিকারী, ইহা লইয়া নানা জল্পনা-কল্পনা চলিতে লাগিল। শিয়াগণ আশা করিয়াছিলেন, নবীজীর পুত্র নাই কিন্তু সর্বশাসাস্ত্রে সুপণ্ডিত আদর্শ-চরিত্র জামাতা হযরত আলী রহিয়াছেন, তিনি মুসলিম জাহানের খলিফা হইবেন। হযরত রসুলের একমাত্র উত্তরাধিকারিণী ফাতেমা তাঁহারই সহধর্মিনী। যোগ্যতার দিক্ দিয়া হযরত আলীর দাবী অন্য কোনও কুরায়েশ নেতা অপেক্ষা ন্যূন ছিল না। যে কালে হযরত হীরা-গহ্বরে প্রথম তৌহিদের তড়িৎআলোকে ঝলসিত হইয়া কম্পিত কলেবরে গৃহে ফিরিতেন, তখন যে মুষ্টিমেয় সহকর্মী তাঁহার অভিনব বাণী নিঃসঙ্কোচে গ্রহণ করিয়া তাঁহার সংশয়াকুল চিত্তে বলাধান করিতেনে, হযরত আলী ছিলেন তাঁহাদের ভিতর অন্যতম। নিশীথের অন্ধকারে মক্কা হইতে যে দিন নবীজী গোপনে গৃহত্যাগ করিয়া মদিনায় হিজরত করিয়াছিলেন, সে দিন যে মহানুভব ভক্ত আততায়ীদের শাণিত কৃপাণ বক্ষে বিদ্ধ হইতে পারে জানিয়াও, প্রাণের মায়া বিসর্জন দিয়া হযরতের পরিত্যক্ত শয্যায় শায়িত ছিলেন, এবং শত্রুপক্ষকে হযরতের অনুসরণ হইতে বিভ্রান্ত করিয়ছিলেন-তিনিই এই আলী। যাঁহাদের দুর্নিবার তরবারি দীর্ঘকাল ধরিয়া শিশু-ইসলামকে দিনের পর দিন শত্রুর ক্রুর হইতে রক্ষা করিয়াছিল তাঁহাদের অগ্রণী ছিলেন এই আলী। এই আলীর অমিতবিক্রমই দুস্তর খয়বর সমরে নিঃসংশয়রূপে প্রতিপন্ন করিয়াছিল যে, মুসলিমরা সংখ্যায় অনধিক হইলেও ঈমানের প্রবাবে তাহারা এক অজেয় শক্তিতে বলীয়ান এবং তাহাদে এক এক জন যোদ্ধা এক একটি রণোন্মত্ত সিংহ বিশেষ। সমগ্র জযিরাতুল আরবে প্রতিপক্ষের নৈতিক সাহস যে ইহার পর চিরদিনের জন্য ধ্বসিয়া গিয়াছিল তাহা কে না জানে। এ হেন আলীকে উপেক্ষিত হইতে দেখিয়া শিয়াদের ক্ষোভের সীমা রহিল না।

কিন্তু যাহার স্বপক্ষে এই বিক্ষোভ সেই প্রতিপক্ষ আলী এ সময় কোথায়? আজিকার এই উপেক্ষায় তিনি ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। কেননা, এই মহানুভব নেতা এ বিষয়ে নির্বিকার রহিলেন। ইসলামের সংহতি কোনক্রমে ব্যবাহত হয়-ইহা তিনি চাহিলেন না। আবুবকর তাঁহাকে বলিলেন, "ভাই আলী, খিলাফতের এই দায়িত্ব তোমাকেই সাজে, তুমি ইহা গ্রহণ কর।" কিন্তু আলী সসম্ভ্রমে প্রত্যাখ্যান করিলেন। আবুবকর ও ওমর যখন আনসার ও অপরাপর দলের সহিত রাষ্ট্রীয় মীমাংসায় রত, আলী তখন নবীগৃহে রোরুদ্যমানা বিবি আয়িশা, ফাতিমা ইত্যাদিকে সান্তনা দিতে ব্যস্ত। যে অপার্থিব মুকুটমনির অম্লান দ্যুতিতে এতদিন তাঁহার শিরোদেশ জ্যোতিষ্মাণ ছিল আজ তাহা অস্তাচলের গুহায় লুণ্ঠিত। দুনিয়ার মুকুট তাঁহার নিকট কি ছার! চুতুর্দিকে গণ্ডগোলে নিবৃত্তি করিতে আবুবকর ও ওমরের একদিন ও একরাত্রি কাটিয়া গেল। তারপর নুদন খলিফার নেতৃত্বে সর্বদলের সমন্বয়ে হযরতের পবিত্র দেহ সমাহিত করা হইল। হযরতের দক্ষিণ হস্ত আলী, প্রিয়তমা দুহিতা ফাতিমা ও আদরের হাসান হুসাইন অতঃপর সাধারণ নাগরিকের পর্যায়ে নামিয়া গেলেন। ঐশ্বর্য তাঁহাদের ছিল না, কখনও সঞ্চয়ও করেন নাই। নবীর আদর্শে তাঁহারা দারিদ্রকেই করিয়াছিলেন মাথার ভূষণ। নবীর সন্তান-সন্ততির ভিতর সব চাইতে আর্থিক দরবস্থা ঘটিয়াছিল যাঁহার তিনি হইলেন নবীর সর্বাপেক্ষা গুণবতী ও প্রিয়তমা কন্যা ফাতিমা। নবীর দুলালী পিতৃহীন হইবার ছয় মাস পরেই ভগ্ন হৃদয়ে প্রিয় পিতার অনুসরণ করেন।

এই সব অবস্থান্তরের জন্য শিয়ারা প্রধানতঃ হযরত ওমরকেই দোষারোপ করেন। তাঁহাদের কাহারও কাহারও প্রতীতি হইয়াছিল, হযরত আলীকে বঞ্চিত করিবার অভিপ্রায়েই হযরত ওমর তাড়াতাড়ি আবুবকরকে খলিফা পদে বরণ করেন। নবীজীর দাফন ও জানাযার পর অবকাশ মত নির্বাচন হইলে হয়ত আলীই ভোটাধিক্যে খলিফা হইতে পারিতেন। তাঁহাদের সন্দেহের পশ্চাতে আরও একটি সদ্য ঘটনার স্মৃতি বিজড়িত ছিল। হযরতের পীড়া যখন গুরুতর আকার ধারণ করে তখন খিলাফতের প্রশ্ন একবার তাঁহার মনে উদিত হইয়াছিল। তাঁহার অবর্তমানে নবগঠিত

মুসলিম সম্প্রদায় যাহাতে চালকহীন অবস্থায় আত্মকলহে প্রবৃত্ত ও বিধ্বস্ত না হয় এ জন্য তিনি শিষ্যমণ্ডলীকে তাঁর ওছিয়াত লিখিয়া লইতে বলেন। কথিত আছে, নির্ভীক ওমর তখন এই বলিয়া প্রতিবাদ করিয়া হযরতকে নিরস্ত করেন যে, মুসলিমদের পরিচালনার জন্য কুর্‌আন মজিদ বর্তমান থাকিতে অন্য কোনও স্বতন্ত্র বিধানের প্রয়োজন নাই।

হযরত মুহম্মদ (সঃ) কোনও ওছিয়াত রাখিয়া গেলে তাহা কাহার অনুকূলে যাইত, অনুমান করা সুকঠিন। সুন্নীরা বলেন, হযরত ওমর নবীর বিশ্বস্ত সুহৃদ আবুবকরকে তাড়াতাড়ি খলিফা পদে বরণ করিয়া বুদ্ধিমানের কাজই করিয়াছিলেন। অন্যথা মুসলিমদের বিভিন্ন দলের ভিতর ক্রমবর্ধমান মতবিরোধ ক্রমশঃ অনমনীয় হইয়া উঠিত। আবার, তিনি যদি নবী পরিবারের প্রতি অত্যধিক শ্রদ্ধা বশতঃ আলীকেই খলিফা পদে বৃত করিতেন এবং তাহা হইলে সম্ভবতঃ বনি-উমাইয়াগণ তখনই তাঁহাদের পূর্বশত্রুতা পুনর্জীবিত করিয়া রাজশক্তির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতেন এবং তাহাতে গৃহযুদ্ধের সূত্রপাত হইত।

খোলাফায়ে রাশেদীনের আমল

প্রথম খলিফা হযরত আবুবকর

(৬৩২—৩৪ খৃঃ)

আরবদের চিরাচরিত ধর্ম এই, তাহারা স্বজনের হত্যাকারীকে কখনও ক্ষমা করে না। এরূপ ক্ষেত্রে এমন একজন রাষ্ট্রনেতারা প্রয়োজন হইয়াছিল যাঁহার তরবারি বেশী লোকের মৃত্যুর কারণ হয় নাই এবং যাঁহার শত্রুসংখ্যা অধিক নহে। সে দিক দিয়া আবুবকর যে যোগ্যতম ছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। পক্ষান্তরে, আলী ধর্মযুদ্ধে বহু লোকের প্রাণনাশ করিয়াছিলেন। তাহাদের বংশধরোরা পরে ইসলাম গ্রহণ করিয়া থাকিলেও এই সকল লোক আলীকে ভালবাসিত না। এরূপ লোক নেতৃত্ব গ্রহণ করিলে হয়ত হযরতের জানাজার সঙ্গে সঙ্গেই মুসলিমদের বিভিন্ন গোষ্ঠির ভিতর ভীষণ তরবারী-ক্রীড়া শুরু হইয়া যাইত। হযরত যে তাঁহার মৃত্যুর অনতিকাল পূর্বে আবুবকরকে নিজের স্থলবর্তী করিয়া মদীনার নবী-মসজিদে ইমামতি করাইয়াছিলেন, এবং শুধু তাই নয় দুর্বল অবস্থাতেও মসজিদের গিয়া স্বয়ং তাঁহার পশ্চাতে আসন গ্রহণ করিয়া নামায পড়িয়াছিলেন, ইহা যেন ভাবী খলিফা কে হইবেন সে সম্পর্কে তাঁহার এক অর্থপূর্ণ ইঙ্গিত। আবুবকর প্রবীণতায় হযরতের প্রায় সমতুল্য ছিলেন। হযরতের আজীবন সহচর, বিশ্বস্ততম সুহৃদ ও প্রথম তৌহিদের আলোকস্নাত এই আবুবকর সকল দলেরই শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন। যতদিন হযরত জীবিত ছিলেন, কি সম্পদে কি বিপদে সকল অবস্থায় আবুবকর স্নিগ্ধচ্ছায় মেঘখণ্ডের ন্যায় তাঁহার জীবনের উপর ছায়া বিস্তার করিয়া চলিয়াছেন। সম্পর্কের দিক দিয়াও তিনি হযরতের পর ছিলেন না। হযরতের সর্বাপেক্ষা প্রিয়তমা পত্নী আ'য়িশা এই আবুবকরেরই কন্যা।

বাষট্টি বৎসর বয়স্ক বৃদ্ধ আবুবকর খলিফা হইয়া তরুনের ন্যায় কার্য করিতে লাগিলেন। শুধু আন্‌সার মোহাজের বিরোধ নয়, ইয়াহুদী জাতি এবং তাহাদের দেখাদেখি পূর্ব ও দক্ষিণ আরবে নও-মুসলিমরাও এই সময়ে বিদ্রোহের সৃষ্টি করে। আবার, নবী হিসাবে হযরতের বিপুল সাফল্য দেখিয়া, তাঁহার মৃত্যুর পূর্বেই তিনি চারিজন প্রতিদ্বন্দ্বী আরব নিজদিগকে নবী বলিয়অ প্রচার করেন। নুতন খলীফাকে ইহাদের সকলের বিরুদ্দে যুগপৎ কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইয়াছিল। এই সঙ্কট সময়ে মহাবীর খালেদের অলৌকিক শৌর্য, অদ্ভুৎ ক্ষীপ্রতা ও দুর্বার তরাবরি তেজ যে ভাবে এই ব্যাপক বিদ্রোহ নির্বাপিত করে তাহার তুলনা পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল।

হযরত রসুলের জীবদ্দশায়ই মুসলিমেরা রোমক সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিতে বাধ্য হয়েছিল। আবুবকর দ্রুত মক্কা ও মদীনায় শৃঙ্খলা স্থাপন করিয়া এবং দক্ষিণ ও পূর্ব আরবের বিদ্রোহ দমন করিয়া হযরতের আরব্ধ কার্যের সমাপ্তিতে আত্মনিয়োগ করিলেন। দিকে দিকে রণোম্মত্ত মুসলিম বাহিনী নব নব দেশ জয় করিবার জন্য ছুটিয়া চলিল। পশ্চিম বাহিনীর নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন পঞ্চাশ বৎসর বয়স্ক খ্যাতানামা বীর আবু ওবায়দা। তাঁহার সহকারী হইলেন রণদুর্বার খালেদ ও অসম সাহসিক দেরার। এই দেরারেরই ভগিনী সেই খাওলা যিনি রোমক যুদ্ধে অদ্ভুদ বীরত্ব প্রদর্শন করিয়া ইতিহাসে অমর হইয়াছেন। উত্তর বাহিনীর সেনাপতি হইলেন মহাবীর সাদ বিন ওক্‌কাস, যিনি পরে পারস্য বিজয়ের গৌরব অর্জন করেন। প্যালেস্টাইনে এক শাক্তশালী বাহিনী প্রেরিত হইল আমর বিন আসের নেতৃত্বে। কুরায়েশনেতা আবু সুফ্ইয়ানে এক পুত্র হইলেন উহার সহকারী আর এক বাহিনীর পরিচালক। ইহাদের সকলের উপর নেতৃত্ব করিতেন মহাসেনাপতি আবু ওবাযদা। হযরত আলী রহিলেন এই সময় ধর্মচর্চা ও শাস্ত্র অধ্যয়নে নিয়ত। ধর্ম, শরীয়ৎ ও সমাজ নীতি সম্পর্কে তিনি ছিলেন রাষ্ট্রের সর্বপ্রধান উপদেষ্টা।

মাত্র দুই বৎসর চার মাস রাজত্ব করার পর মহামতি আবুবকর দেহত্যাগ করেন। মৃত্যুর পূর্বেই তিনি প্রধান প্রধান দলপতিগণকে আহ্বান করিয়া তাঁহাদের সম্মতি ক্রমে হযরত ওমরের স্কন্ধে, তাঁহার অনিচ্ছা সত্ত্বেও, খিলাফতের দায়িত্ব অর্পণ করিয়া যান। হযরত আলীর দাবী এবারেও অস্বীকৃত হইল। কিন্তু মহাজ্ঞানী হযরত আলী ছিলেন চিরদিনই নিয়মানুবর্তিতার পক্ষপাতী। তিনি বিনা প্রতিবাদে নব নির্বাচিত খলিফার বায়াৎ (আনুগত্য) স্বীকার করিয়া হইলেন।

দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর (রাঃ)

(৬৩৪–৪৪ খৃঃ)

হযরত ওমরের খিলাফত গ্রহণের দিনটি এক ঐতিহাসিক কারণে আনন্দ মুখর ছিল। ঐ দিবস হযরত আবুবকরের প্রেরিত মুসলিম বাহিনীর বিজয়ীবেশে শিরিয়ার দুর্ভেদ্য রাজধানী দামেস্কে প্রবেশের সংবাদ মদিনায় আসিয়া পৌছে। সে শুভ–সংবাদ আবুবকর শুনিয়া যাইতে পারে নাই। নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ সেজন্য আক্ষেপ করিলেও, নাগরিকেদর ভিতর উহার উল্লাস ও উম্মাদনার কলরোল চলিতে থাকে। তোরণে তোরণে হিলালী নিশান, মিনারে মিনারে মোয়াজ্জিনের মধুর আজান এবং মোত্তাকীদের মুখে আল্লার শোকরিয়া ও কৃতজ্ঞতার চিহ্ন। কেহ উদাত্ত কণ্ঠে কোরআন পাঠ করিতেছ; কেহ অভুক্তদিগকে রুটি ও খর্জ্জুর বিলাইতেছে, কেহ বা বস্ত্রহীনকে বসন পরাইয়া আহ্লাদিত হইতেছে। তরুণের দল মহাস্ফুর্তিতে নগরপথ পরিক্রমণ করিয়া ফিরিতেছে। তরুণীরা বিবিধ সাজে ভূষিত গৃহাঙ্গনের শোভা বর্দ্ধন করিতেছে। এই শুভ পরিবেশের ভিতর নুতন খলিফা রাজ্যসভার গ্রহণ করেন। কিন্তু এরূপ শত আনন্দের ভিতরও তিনি আমরণ ব্রতসলম্বীর কঠোর তপস্যা উদযাপন করিয়াছেন। খিলাফৎ যখন তাঁহাকে অর্পণ করা হয় তখন তিনি বালকের ন্যায় রোদন করিয়া বলিয়াছিলেন,–না, না, আমি এ গুরুদায়িত্ব বহিতে পারিব না, খিলাফৎ আমি চাই না। মুমূর্ষ আবুবকর তাহাকে উত্তর করিয়াছিলেন, "কিন্তু খিলাফৎ যে তোমাকে চায়, ওমর"। বস্তুত ওমর খিলাফৎকে কঠোর দায়িত্বরূপেই গ্রহণ করিয়াছিলেন, বিলাসের রঙ্গমঞ্চ হিসাবে নহে।

যাহাদের বীরত্ব প্রভাবে আরব বাহিনী যুগপৎ রোমক সম্রাট্ হিরোক্লিয়াস ও পারসিক সম্রাট্ সাহরাসকে কম্পান্বিত করিয়াছিল সেই সকল দুর্ধর্ষ সেনাপতি যে ব্যক্তির সামান্য আঙ্গুলী হেলনে উন্নীত বা অবনমিত হইতেন, সেই মহাপ্রতাপ খলিফা ওমরের মসনদ ও শাহী দরবারের অবস্থা ও ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। পারস্যের লুসিয়ানা প্রদেশের শাসনকর্তা হরমুজান্ এক সময় খলিফা ওমরের অন্বেষণে মদিনায় উপনীত হন, কিন্তু খলিফার প্রাসদ খুঁজিয়া বাহির করিতে তাঁহাকে ব্যর্থকাম হইতে হয়। কোথায় শাহী আবাসের গগনচুম্বী সৌধ? কোথায় দরবার গৃহের মর্মর খচিত হর্ম্যতল? কোথায় বা দ্বাররক্ষী বিচিত্র–ভূষণ শান্ত্রীর দল? দেখিলেন, এ সকলের পরিবর্তে, কর্দমে নির্মিত ও খর্জুর পত্রে আচ্ছাদিত এক অনাড়ম্বর মসজিদ, আর তারই আঙ্গিনায় খর্জুর বৃক্ষের ছায়ায় ভূমিতলে শায়িত এক দীর্ঘকায় বিরাট পুরুষ। তাঁহার দেশ যেমন অরক্ষিত, অঙ্গনের প্রবেশ দ্বারও তেমনি অবারিত। গভীর প্রশান্তিতে মহাপুরুষ নিদ্রমগ্ন। আগন্তুক জিজ্ঞাসা করিলেন, ইনিই কি সেই শাহান্‌শাহ ওমর যাঁহার খ্যাতি ইরানের শৈলমালা হইতে মর্মর সাগরের উপকূল পর্যন্ত প্রতিধ্বনিত হইতেছে। এক ব্যক্তি উত্তর করিলেন, "হ্যাঁ, ইনিই সেই ইসলামের খাদেম ওমর বিন খাত্তাব, খলিফাতুল মুসলেমীন।" আগন্তুক কহিলেন, "ইনি কি এই ভাবেই একাকী অবস্থান করেন এবং একাকী রাজ্য শাসন করেন?" উত্তর হইল–"হ্যাঁ, ইনি একাকী আসেন একাকী যান, যেখানে ইচ্ছা নিদ্রা যান এবং একাই রাজ্য শাসন করেন। আর এই মসজিদের প্রাঙ্গনই তাঁহার বিচার ও রাজকার্যের দরবার ক্ষেত্র।" হরুমুজান্ কহিলেরন, এ সকর তো পার্থিব রাজর লক্ষণ নহে, এ যে খোদা প্রেরিত মাহপুরুষের লক্ষণ! পরিচয়কারী কহিলেন, ইনি অবশ্য প্রেরিত পুরুষ নহেন, তবে মহাপুরুষ বটেন! বিস্ময় বিহ্বল হরুমুজান্ পরে ওমরের হস্তে ইসলাম ধর্মে দিক্ষা গ্রহণ করেন।

ওমর বলিতেন, মুসলিমেরা যতদিন বিলাসিতা হইতে দূরে থাকিবে ততদিনই তাহাদের উন্নতি ও বিজয়স্রোত অব্যাহত থাকিবে। যে দিন

বিলাস তাহাদিগকে স্পর্শ করিবে সেই দিন হইতে তাহাদের ভাগ্যশশী অধোগামী হইবে।

কথিত আছে, প্রসিদ্ধ সেনাপতি সা'দ বিন ওক্কাস যখন পশ্চিম পারস্য জয় করিয়া উহার পুরাতন রাজধানী মাদাইনের পরিবর্তে কুফায় নূতন রাজধানী স্থাপন করেন তখন পারস্য সম্রাট্ খসরুর প্রাসাদ হইতে তিনি এক মনোহর স্বর্ণ-তোরণ খুলিয়া আনিয়া কুফায় নিজ আবাসগৃহে সংযোজিত করেন। ওমর ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া সেনাপতি সা'দকে যে পত্র লেখেন তাহা চিরস্মরণীয়। ওমর লিখিতেছেন, "শুনিলাম তুমি নাকি হযরতের আদর্শ ত্যাগ করিয়া খসরুগণের আদর্শ অনুসরণ করিতেছে এবং রাজোচিত প্রাসাদ নির্মাণ করাইয়া তাহা বিচিত্র তোরণে সুশোভিত করিয়াছ। তুমি পারস্য সম্রাট্দের মত সৌধ-নিবাসে, শান্ত্রী ও প্রহরী বেষ্টিত হইয়া বাস করিতে মযলুমদের পক্ষে তোমার ন্যায়বিচার ও সহায়তা লাভ দুরূহ হইবে। মনে রাখিও, খসরুগণ প্রাসাদ হইতে কবরে গিয়া বিলীন হইয়াছে, আর কুটিরবাসী মুহম্মদ (সঃ) আল্লা'র উচ্চতম বেহেশতে আরোহন করিয়াছেন। তোমার প্রাসাদ ভস্মসাৎ করার জন্য মুহম্মদ বিন মুসলিমকে প্রেরণ করা হইল। আমি আশা করি, এই দূত অশ্বপৃষ্ঠ হইতে অবতরণের পূর্বেই আমার আদেশ কার্যে পরিণত হইবে।" অতঃপর সেনাপতি সা'দের চোখের সম্মুখে তাঁহার সাধে প্রাসাদ ভস্মীভূত হইল। আর সেই সঙ্গে ভস্মীভূত হইল বিলাসিতার সেই মোহনীয় অগ্নিশিখা, যাহা পারস্য ভূমির সংস্পর্শে আসার ফলে বিজয়ী সা'দকেও কিঞ্চিৎ স্পর্শ করিয়াছিল। সা'দ কোনও প্রতিবাদ করিতে সাহস করিলেন না।

মানুষে মানুষে সমতার যে মহান আদর্শ ইসলাম ঘোষণা করিয়াছে, ওমর নিজ কর্মের ভিতর দিয়া তাহা মূর্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন। তিনি জেরুজালেম যাইবার সময় দীর্ঘ মরুপথে কখনও নিজে থাকিতেন উষ্ট্র পৃষ্ঠে আর ভৃত্য টানিত উহার বগলা-রশি,- কখনও বা ভৃত্যকে চড়াইতেন উষ্ট্রে, আর স্বয়ং মুসলিম জাহানের খলিফা নীচে নামিয়া ধরিতেন তার

বগ্‌লা। কাফেলা যখন জেরুজামের পৌছিল তখন কে ভৃত্য কে খলিফা, নির্ণয় করা অমুসলিমদের পক্ষে সুকঠিন হইয়াছিল।

তথাকার বিজিত অধিবাসীরা ছিল খৃষ্টান অধিবাসী। তাহারা খলিফার নিকট আত্মসর্পন করিলে সেখানেও তিনি মহানবীর মহান্ নীতি অনুসরণ করেন এবং তাহাদের সামাজিক ও ধর্মীয় ব্যাপারে স্বাধীনতার স্বীকৃতি দান করেন। কৃতজ্ঞ খৃষ্টানেরা খলিফাকে সসম্মানে তাহাদের গীর্জা দেখাইতে লইয়া গেল। সেখানে নামাজের সময় আগমন হইল খলিফা গীর্জার বাহিরে আসিয়া নামাজে প্রবৃত্ত হইলেন। খৃষ্টানেরা তাঁহাকে এই কষ্ট স্বীকারের পরিবর্তে গীর্জার ভিতরেই নামাজ সমাধা করিতে অনুরোধ করিয়াছিল। কিন্তু দুরদর্শী খলিফা তাহা স্বীকার করেন নাই এই আশঙ্কায়, পাছে বিজয় গর্বিত মুসলিমেরা কোনও দিন খলিফার নামাজগাহ বলিয়া গীর্জাটিকে মসজিদে পরিণত করে। খলিফার আশঙ্কা যে যথার্থ হইয়াছিল তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। কথিত আছে, গীর্জা-সংলগ্ন যে স্থাটিতে খলিফানামাজ পড়িয়াছিলেন। উত্তকালে মুসলিমেরা উহা ঘিরিয়া একটি মসজিদ নির্ণয় করিয়াছিল।

ওমর ছিলেন যালিমের জন্য বজ্রাদপি কঠোর, আর আর্ত ও ব্যথিতের জন্য খুসুমাদপি কোমল। গভীর নিশীথে নিদ্রা পরিহার করিয়া মুসলিম জাহানের খলিফা ওমর নগরের পথে ছদ্মবেশে ভ্রমণ করিতেন। কোথাও ক্ষুধাতুর পুত্রকন্যা লইয়া কোনও রোরুদ্যমানা অনাথা রমণী হঠাৎ সান্তনার বাণী শ্রবণ করিয়া অশ্রুসিক্ত লোচনে সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিত, এক দীর্ঘকায় বলিষ্ঠ পুরুষ তাহার দ্বারে খাদ্যের পশরা স্থাপিত করিতেছে। কোথাও বা দস্যুহস্তে নিপতিত বিপন্ন পথিক আততায়ীরা ছুরিকা তলে ভীত চকিত অবস্থায় হঠাৎ দেখিতে পাইত, কাহার দুরাগত বজ্রকণ্ঠের গম্ভীর নির্ঘোসে সহসা দস্যুহস্ত কম্পিত হইতেছে, আর ক্ষণপরে এক ক্ষিপ্র হস্তের অব্যর্থ আঘাতে দস্যুদেহ ভূতলশায়ী হইতেছে। কচিৎই তাহারা জানিতে পারিত যে, উক্ত খাদ্যপরিবেশক বা অজ্ঞাত সন্ধানী মহাপ্রাণ ব্যক্তি তাহাদের প্রজা-দরদী খলীফা ওমর।

তাঁহার আমলে মুসলিম বিজয় উত্তরে সমগ্র সিরিয়া, পূর্বে সমগ্র পারস্য

ও পশ্চিম প্যালেষ্টাইনের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃতি হয়। ইহা ছাড়া ইয়ারমুকের মহাযুদ্ধের রোমক শক্তি পর্য্যুদস্ত হয়। আবু ওবায়দা, খালেদ সা'দ ও আমর প্রমুখ যে সকল বীরকেশরী খলিফা আবু বকরের সময় সেনাপতিত্ব গ্রহণ করেন হযরত ওমরের সময়ও তাঁহারাই মুসলিম বাহিনীগুলির নেতৃত্ব করেন। ইহাদের অপূর্ব সামরিক প্রতিভা মুসলিম সাধারণতন্ত্রকে পৃথিবীতে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করে। আবু ওবায়দা ও খালেদ ৬৩৪ খৃষ্টাব্দে রোমক অধিকৃত দামেস্কে মুসলিম পতাকা উড্ডীন করেন। ৬৩৬ খৃষ্টাব্দে খালেদ ইয়ারমুকের মহাযুদ্ধে দেরার ও যুবায়েরের সহযোগিতায় রোমান শক্তি বিধ্বস্ত করেন। প্যালেষ্টাইন জয় করেন আবু ওবায়দার আর আমর প্যালেস্টাইনের উত্তরে জর্দান নদীর তীর পর্যন্ত পশ্চিম সিরিয়া পদানত করেন। সেনাপতি সা'দ ৬৩৬ খৃষ্টাব্দে ক্যাডেসিয়ার মহাযুদ্ধে পশ্চিম পারস্য জয় করেন। আবু ওবায়দা এবং খালেদকে প্রাচ্যের আলেকজাণ্ডার ও নেপলিয়ান বলা হইয়া থাকে।

দশ বৎসর পাঁচ মাস খিলাফতের কঠোর দায়িত্ব উদযাপন করিয়া ওমর এক গুপ্ত ঘাতকের তরবারির আঘাতে মৃত্যু বরণ করেন। আততায়ী ফিরোজ ছিল এক পারসিক বংশীয় গোলাম। কোনও এক যুদ্ধক্ষেত্রে বন্দী হইয়া সে দাসরূপে বিক্রিত হইয়াছিল। ওমর নামাযে রত থাকা অবস্থায় এই মূঢ় ফিরোজ নির্মম আঘাতে তাঁহাকে আহত করিয়া ফেলে তিনি সেই অবস্থায়ই নামায সমাধা করেন এবং আল্লা'র শোকর গোযারি করেন এই বলিয়া যে তাঁহার আততায়ী কোনও মুসলিম নহে।

তৃতীয় খলিফা হযরত ওসমান (রাঃ)

(৬৪৪ – ৫৬ খৃঃ)

আহত অবস্থায় ওমর মাত্র তিন দিন জীবিত ছিলেন। আঘাতের পরেই তিনি বুঝিয়াছিলেন তাঁহার জীবনাবসান অনিবার্য। তিনি খলিফা নির্বাচনের জন্য পাঁচজন পৌ-প্রধানকে আহ্বান করিলেন। হযরত আলীর হিতাকাঙ্খীরা কেহ কেহ মনে করিয়াছিলেন, আবু বকরের ন্যায় ওমরও হয়ত কাহাকেও তাঁহার প্রতিনিধি নির্বাচন করিয়া যাইবেন। কিন্তু ওমর তাহা করিলেন না। পাঠকের স্মরণ আছে, এই ওমরই একদিন স্বয়ং হযরত রসুল্লাকে তাঁহার প্রতিনিধি নির্বাচন ইচ্ছা হইতে বিরত করিয়াছিলেন। ইসলামের একনিষ্ঠ ভক্ত ওমর আজ সেই নীতির ব্যতিক্রম করিলেন না। আলী, ওসমান, যুবায়ের বিন আল আ'বাম, সা'দ বিন আবি ওক্কাল ও তালহা ইবনে আব্দুল রহমানকে ভার দেওয়া হইল–তাঁহারা যাঁহাকে নির্বাচন করিবেন তিনিই খলিফা হইবেন। হযরত আলি, ওসমান ইত্যাদি যাহারা হযরত রসুলের বিশিষ্ট সাহাবা বলিয়া পরিগণিত ছিলেন তাঁহাদিগকে পরবর্তী কালে খলিফাদের অধীনস্থ সেনাপতিরূপে সমর ক্ষেত্রে প্রেরণ করা হইত না। রাষ্ট্রের উপদেষ্টা হিসাবে তাঁহারা খলিফার নিকট সম্মানিত ছিলেন। এ দিক দিয়া হযরত আলীর ব্যক্তিত্ব ছিল সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু ওমরের নিকট ব্যক্তি অপেক্ষা নীতির মর্যাদা ছিল বড়। তিনি নেতৃবর্গকে তিন দিনের সময় দিলেন এবং শর্ত করিয়া দিলেন যে, তাঁহাদের মধ্য হতে অথবা অপর যে কেহ খলিফা হইবেন তিনি নিজের বংশের লোকদিগকে কখনই অপরের অপেক্ষা অধিক অনুগ্রহ প্রদর্শন করিতে পারিবেন না। তিন দিনও যখন খিলাফৎ প্রশ্নের কোনও মীমাংসা হইল না তখন ওমর তাঁহাদিগকে ডাকিয়া পাঠালেন এবং তাঁহাদেরই অনুরোধে সা'দ বিন

যায়েদ নামক আর একজন গোষ্ঠীসতিকে তাঁহাদের মন্ত্রণা সভার অন্তর্ভূক্ত করিয়া দিলেন। তাঁহারা ওমরের পুত্র আবদুল্লাকেও তাঁহাদের ভিতর রাখিতে চাহিলেন। ওমর অনিচ্ছাসত্বে তাহাতে সম্মতি দিয়াছিলেন এই শর্তে যে, আব্দুল্লাহর শুধু মতামত প্রকাশের অধিকার থাকিবে, নিজে খেলাফৎ গ্রহণ করিতে পারিবে না। সভার কার্য যাহাতে শৃঙ্খলার সহিত অগ্রসর হয় এজন্য ওমর মেকাব নামক এক ন্যায়নিষ্ঠ ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিকে এই সভার মধ্যস্থ নিরূপিত করিয়া দিলেন। নেতৃগণ মেকাবকে সঙ্গে লইয়া পরামর্শের জন্য বিবি আ'য়িশার গৃহে সমবেত হইলেন।

মৃত্যু কোনও কিছুরই অপেক্ষা করে না। মুসলিম জাহানের খিলাফতের মীমাংশায় বিলম্ব ঘটিলেও হযরত ওমরের প্রাণবায়ু ক্রমশঃ নিঃশেষ হইয়াই আসিতে লাগিল। মদীনাবাসী আনসারগণ এই বিতর্কে বিশেষ সংশ্লিষ্ট না থাকায় বিচক্ষণ তালহা পূর্বাহ্নেই তাহাদের ভিতর হইতে পঞ্চাশ জন বিশ্বস্ত নাগরিককে নির্বাচিত করিয়া তাহাদের উপর রাজকোষ রক্ষার ভার অর্পন করিয়াছিলেন এবং নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, 'বয়তুল মাল'–সর্বতোভাবে সুরক্ষিত রাখিতে হইবে এবং যে ব্যক্তি বিন্দুমাত্র বিদ্রোহভাব প্রদর্শন করিবে তাহাকে তৎক্ষণাৎ হত্যা করিবে। এইরূপে রাষ্ট্রীয় বিবর্তনের সন্ধিক্ষণের রাজধানীর শৃঙ্খলা রক্ষিত হইয়াছিল।

দলপতিগণের বিবেচনায় ওসমান অথবা আলী এই দুইজনের ভিতর একজন খলিফা হইবেন ইহা নিশ্চিত হইল, কিন্তু শেষ মীমাংসা আর হইতে চায় না। বিবি আ'য়িশার গৃহে কুরায়েশদের বিভিন্ন গোষ্ঠির দলপতিদের ভিতর বিতর্ক চলিতেই থাকিল। তখন আব্দুল রহমান একে একে প্রত্যেক প্রার্থীকে নির্জন কক্ষে লইয়া গিয়া বলিলেন, আমার নিজের মতে আপনার দাবী খুবই সঙ্গত সন্দেহ নাই, কিন্তু মনে করুন নির্বাচনে যদি কৃতকার্য না হন তবে আপনার মতে খিলাফতের এই দায়িত্ব গ্রহণ করারা জন্য অপর কে সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত? আলী কহিলেন, ওসমান। ওসমান কহিলেন, আলী। সা'দও যুবায়ের কহিলেন, ওসমান। এইরূপে

পত্যেকের মতামত অবহিত হইয়া আব্দুল রহমান প্রকাশ্য সভায় ঘোষণা করিলেন, অদ্যকার মীমাংসা এই হইল যে, ওসমান ও আলীর ভিতর একজন খলিফা হইবেন। আগামী কল্য সাধারণ সভায় এই দুইজনের ভিতর নির্বাচন হইবে। সভা ভঙ্গ হইল।

এদিকে আবু সুফ্ইয়ান, আমর বিন আ'স প্রমুখ উমাইয়া দলপতিগণ ওসমানের অনুকূলে নানা কৌশলজাল বিস্তার করিতে লাগিলেন এবং সমস্ত রাত্রি কূট পরামর্শ চলিতে লাগিল।

পরদিন এক সাধারণ সভা আহুত হইল। সভায় আব্দুর রহমান মিম্বরে দাঁড়াইয়া সমবেত জনতাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বন্ধুগণ, আমাদের খলিফা ওমরের স্থানে বসাইবার জন্য আমরা গতকল্য বিশেষ সবায় হযরত আলী ও হযরত ওসমানকে মনোনীত করিয়াছি। উভয়েই ইসলামের একনিষ্ঠ খাদেম ও হযরতের প্রিয় সাহাবা। এক্ষণে এই উভয়ের ভিতর কে মুসলিম জগতের নায়ক হইবেন তাহা অদ্যকার সাধারণ সভায় নির্ণীত হইবে।

আব্দুর রহমানের ঘোষণা শেষ হইলে সভায় প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য নানা প্রকার আলোচনা ও আন্দোলন চলিতে লাগিল এবং পরস্পর-বিরোধী জনমত শ্রুত হইতে লাগিল। পরিশেষে আব্দুর রহমান পুনরায় দণ্ডায়মান হইলেন এবং সকলকে নিরত করিয়া হযরত আলীকে নিকটে আহ্বান করিলেন। আলী মিম্বরের নিকটবর্তী হইলে তাঁহার হস্ত ধারণ করিয়া বলিলেন, ভ্রাতঃ, অদ্য আমরা তোমাকে নেতৃত্বে বরণ করিয়া তোমার হস্তে বায়াৎ হইতে চাই। তুমি আল্লা'র নামে প্রতিজ্ঞা কর যে, সর্বদা আল্লাহ্ ও রসুলের হুকুম ও দুই বিগত খলিফার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া চলিবে এবং ইসলামের যাবতীয় শর্ত অক্ষরে অক্ষরে পালন করিবে। ধর্মভীরু আলী মহা চিন্তায় পড়িলেন ও বিনীতভাবে উত্তর করিলেন, বন্ধুগণ, প্রতিশ্রুতি দিতে পারিব না, তবে যতদুর সাধ্য চেষ্টা করিব এবং আল্লা'র নিকট মদৎ চাহিব, তিনি যেন তাঁহার এই দাসানুদাসকে সকল শর্ত পালন করিতে শক্তি দেন। আব্দুল রহমান বিস্মিত ও বিরক্ত হইলেন। উপস্থিত জনতাও

বিস্মিত হইল। আব্দুর রহমান বলিলেন, এরূপ দুর্বলচিত্ত ব্যক্তিকে এই সমস্যা-সঙ্কুল বিশাল মুসলিম জাহানের নেতৃত্ব প্রদান করিতে পারি না। অতঃপর আব্দুল রহমান হযরত ওসমানকে আহ্বান করিয়া পূর্ববৎ প্রতিজ্ঞা করিতে বলিলেন। ওসমান কোনরূপ দ্বিরুক্তি না করিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন। তখন আব্দরু রহমান তাঁহাকে খলিফা স্বীকার করিয়া তাঁহার হস্তে বায়াৎ হইলেন। অন্যান্য লোকও তাঁহার হস্তে বায়াৎ হইতে লাগিল। আলী 'শঠতা' 'শঠতা' বলিয়া আওয়াজ করিয়া সভাস্থল ত্যাগ করিতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু আব্দুর রহমান তাঁহাকে নিবৃত্ত করিয়া বলিলেন, আপনি প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন যে, আমার মীমাংসা মানিয়া লইবেন। এক্ষণে আমি হযরত ওসমানকে নির্বাচন করিয়াছি। আপনি তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করুন। অন্যথা আপনি খলিফাকে অমান্য করার অপরাধে অপরাধী হইবেন। হযরত আলী পূর্বশর্ত্ত স্মরণ করিয়া হযরত ওসমানের হস্তে বায়াৎ হইরেন (৬৪৪ খৃঃ)।

ইসলামে প্রথম রাষ্ট্র-বিপ্লব ও হযরত ওসমানের হত্যা

হযরত ওসমান (রাঃ) একান্ত ধর্মভীরু ও উদারচেতা ছিলেন। কিন্তু হযরত ওমরের চরিত্রে যে দৃঢ়তা ছিল, ওসমানের তাহা ছিল না। ত্যাগ ও কমনীয়তা ছিল তাঁহার চরিত্রের প্রধান ভূষণ। তাঁহার জ্ঞাতিগোষ্ঠি ওমাইয়াগণ তাঁহার এই দুবলতার সুযোগ গ্রহণ করিয়াছিল এবং সকল দিক দিয়া নিজেদের সুবিধা করিয়া লইয়াছিল। তাহাদেরই চেষ্টা ও কৌশল দ্বারাই যে ওসমান খলিফার গৌরবময় আসন লাভ করিয়াছিলেন তিনি তাহা বিস্মৃত হইতে পারেন নাই। কাজেই তাহাদের প্রতি তিনি অকৃতজ্ঞ হইতে পরিলেন না। ফলে,ন্যায়ের মর্যাদা ক্ষুন্ন হইতে লাগিল আবু সুফ্ইয়ানের পুত্র মু'আবিয়া সমৃদ্ধ শামদেশের (সিরিয়ার) শাসন কর্তা নিযুক্ত হইলেন। মুসলিমদের মিশর জয়ের পর উক্ত দেশের কর্তৃত্ব লাভ করিলেন ওসমানের দুগ্ধভ্রাতা আবদুল্লাহ বিন সা'দ বিন সরুর। অন্যান্য প্রদেশেও ওমরের নিয়োজিত শাসকগণ ক্রমে ক্রমে অপসারিত হইতে লাগিল এবং তাহাদের স্থানে ওমাইয়া বংশীয় লোকগণ নিয়োজিত হইতে লাগিল। মু'আবিয়ার চাচাত ভাই মারোয়ান হইলেন ওসমানের মন্ত্রণা-সচিব। আব্দুল্লাহ ও মারোয়ান উভয়েরই অসৎ প্রবৃত্তির জন্য হযরত রসুল কর্তৃক বিতাড়িত হইয়াছিল। উমাইয়াদের অত্যাচারে সকল দেশেরই এবং বিশেষ করিয়া মিশরের অসন্তোষের বহ্নি ধুমায়িত হইয়া উঠিল। দীর্ঘ ছয় বৎসর কাল লোকের সহ্য করিয়া চুপ করিয়া থাকিল। কিন্তু ওসমানের প্রশ্রয়ে মারোয়ান এমনই দুঃসাহসী হইয়া উঠিয়াছিলেন যে, ওসমানের অজ্ঞাতে তদীয় নামাঙ্কিত সীলমোহরের যথেচ্ছ ব্যবহার করিয়া তিনি নিজের অনেক অন্যায় ফরমান খলিফার নামে চালাইতেন। রাজকোষের অর্থ দ্বারা তিনি ক্ষমতাশালী লোকদিগকে বশীভূত করিয়া স্বপক্ষে আনিতেন এবং অন্যায়ের প্রতিরোধকদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতেন। হযরত ওসমান

দ্বাদশ বৎসর রাজত্ব করেন। মারোয়ানের পোষকতা-পুষ্ট উদ্ধত উমাইয়া শাসকগণের অত্যাচার ক্রমে লোকের অসহ্য হইয়া উঠিল। স্বার্থ-সেবীদের দ্বারা পরিবেষ্টিত ওসমান হয়ত প্রকৃত তথ্য জানিতেই পারিতেন না। তিনি যখন কুরআন পাঠ ও কুরআনের সঙ্কলন লইয়া ব্যস্ত থাকিতেন তখন শয়তানের অনুচরের তাঁহার সাম্রাজ্য লুটিয়া খাইবার ব্যবস্থা করিত।

খলিফার বার্ধক্য দশায় অবস্থা ক্রমে এমন হইল যে, নানা দেশ হইতে ক্ষুব্ধ প্রজারা পুনঃ পুনঃ আসিয়া মদিনায় হানা দিয়া তাহাদের আক্রোশ প্রকাশ করিতে লাগিল। হযরত আলী ইহাদিগকে বহুবার নিবৃত্ত করিয়াছেন এবং হযরত ওসমানকে আসন্ন আক্রমণ হইতে রক্ষা করিয়াছেন। ওদিকে ওসমানকেও তিনি উপদেশ দিয়াছেন মারোয়ানের চক্র হইতে নির্মুক্ত হইতে। কিন্তু মারোয়ান ইহাতে আরও ক্রুদ্ধ হইতেন এবং মনে করিতেন, এইসব বিদ্রোহ আলীরই ষড়যন্ত্র। কারণ, বিদ্রোহীদের মধ্যে কতক লোক আলীকে খিলাফৎ গ্রহণ করিতে বলিত। ফলে, ওসমানের দ্বারা বিদ্রোহের মুল কারণ সংশোধিত হইল না। মিশরীয় এক প্রতিনিধিদলকে ওসমান প্রতিকারের আশ্বাস দিয়া ফিরাইয়া দিলেন, কিন্তু পথে তাহারা মারোয়ানের এক পত্র ধরিয়া ফেলিল। মিশরের গর্ভণরকে লেখা উক্ত পত্রে তাহাদের মৃত্যু-আজ্ঞা ছিল এবং ওসমানের সীল মোহর অঙ্কিত ছিল। প্রতিনিধিগণ ফিরিয়া আসিয়া মারোয়ানকে চাহে কিন্তু খলিফা তাঁহাকে হাযীর করিতে অস্বিকার করেন। পরিশেষে একদিন শান্ত নগরীর স্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া বিদ্রোহীদের তুমুল কোলাহল গর্জিয়া উঠিল মিশর হইত আগত একদল উন্মত্ত বিদ্রোহী ওসমানের আবাস গৃহ আক্রমণ করিল। মারোয়ান আহত হইয়া পলায়ন করিলেন। সুদিনের বান্ধব অন্যান্য উমাইয়াগণও প্রাণেভয়ে সরিয়া পড়িল। খলিফার নিজ জীবন বিপন্ন হইয়া উঠিল। আলী এই সংবাদ পাইয়া অবিলম্বে নিজ পুত্র হাসান-হুসাইনকে তাঁহার সাহায্যে প্রেরণ করিলেন। তালহা, যুবায়ের প্রভৃতি প্রধানগণ খলিফার সাহায্যার্থে নিজ নিজ সন্তানগণকে প্রেরণ করিলেন। ইহারা প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে লাগিল, কিন্তু

বিদ্রোহীরা সংখ্যায় ছিল পঙ্গপালের মত। তাহারা চতুর্দিক হইতে খলিফার আবাসগৃহ বেষ্টন করিয়া ফেলিয়াছিল। তাহাদের ভিতর হইতে দুই ব্যক্তি পশ্চাৎ দিক দিয়া প্রাচীর ডিঙ্গাইয়া ভিতরে প্রবেশ করিল। বিরাশী বৎসর বয়স্ক বৃদ্ধ খলিফা নিজগৃহে নিহত হইলেন এবং তদীয় পত্নী নায়েলা আহত হইয়া নিজ অলঙ্কার রাশি খুলিয়া দিয়া আপন ইজ্জৎ রক্ষা করিলেন। (নবীকন্যা বিবি উম্মে কুলসুম নবীজীর জীবদ্দাশাতেই ইহলোক ত্যাগ করিয়াছিলেন।)। যুদ্ধের অবস্থা গুরুতর শুনিয়া স্বয়ং আলীও অকুস্থলে উপনীত হইলেন এবং পুত্রদ্বয়কে ভৎর্সনা করিলেন যে, তাহার জীবিত থাকিতে ইসলামের রক্ষক আমীরুল মুমেনীন নিহত হইলেন কেন। কিন্তু সমস্ত পুরী বেষ্টিত হইতে তাঁহার আর কয়দিক রক্ষা করিবেন। তাঁহারা তো সকলেই শত্রুহস্তে আহত হইয়াছিলেন কেহই পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেন নাই। বিদ্রোহীরা এমনই ক্ষিপ্ত হইয়াছিল যে, খলিফার নিধনের পরও তাহাদের আক্রোস নির্বাপিত হইল না। তিনদিন পর্যন্ত তাঁহার সমাধি হইতে পারিল না এই কয়েক দিনের অক্লান্ত চেষ্টার ফলে আলী তৃতীয় দিবসে মুষ্টিমেয় কয়েকজন লোককে সঙ্গে পাইয়া হযরত ওসমানের মৃতদেহের জানাযা সম্পাদন করিলেন। তখনও বিদ্রোহীদের প্রস্তরবর্ষণ একেবারে নিবৃত্ত হয় নাই।

নিয়তির কি নির্মম পরিহাস। যে মহান খলিফা স্বহস্তে কুরআন সঙ্কলন করিয়াছিলেন, যাঁহার দুর্ধর্ষ বাহিনী একদিকে সিরিয়ার পথে অগ্রসর হইয়া কনষ্ট্যান্টিনোপলের দ্বারদেশে আঘাত হানিতেছিল, আর একদিকে কুফা হইতে নিক্রান্ত হইয়া পারস্যরাজ খসরুর শেষ বংশধর ইয়াযৃদি গার্দকে রাজ্যভ্রষ্ঠ ও বিতারিত করিয়া সমগ্র পারস্য সাম্রাজ্য করতল গত করিতেছিল, যাঁহার ইঙ্গিতে জলপথে অগনিত রণতরী ভূমধ্যসাগরের তরঙ্গমালাকে মথিত করিয়া সগৌরবে হেলালী পতাকা বহিয়া বেড়াইতেছিল যাঁহার দুর্বার বাহিনী মিশরে রোমক শক্তি বিলুপ্ত করিয়া সুদুর পশ্চিম আফ্রিকা পর্যন্ত ইসলামের হুকুমাৎ প্রতিষ্টিত করিয়াছির, তাঁহারই নিধন হইল তাঁহার স্বগৃহে ব্যাধতাড়িত মৃগের ন্যায় নিতান্ত অসহায়। প্রকৃতিপুঞ্জের

যে শ্রদ্ধা ও প্রত্যয় পূর্ববর্তী খলিফাদ্বয়কে সর্ব অবস্থায় অভেদ্য বর্মের মত বেষ্টন করিয়া রাখিত, যাহার ফলে রক্ষীহীন অবস্থায়ও হযরত ওমর বৃক্ষতলে নিদ্রা যাইতে পারিতেন, ন্যায়ের মর্যাদা ক্ষুন্ন হওয়ার সেই অক্ষয় কবচ হইতে ওসমান বঞ্চিত হইয়াছিলেন। ওসমান হয়ত সকল তথ্য অবগত হইবার সুযোগ পান নাই। কিন্তু কোটি কোটি মুক, নিঃস্ব ও নিপীড়িতের প্রতিপালন ভার যাঁহার স্কন্ধ ন্যস্ত, তাঁহার পক্ষে মুহূর্তের অসাবধানতাও অমার্জনীয়। তাই ব্যক্তিগত জীবনের অশেষ পূণ্যকার্য সত্বেও নিধাতার অমোঘ বিচারে হযরতের প্রিয় সাহাবা এবং জামাতা, শ্রেষ্ঠ দানবীর ও কুরআনের সঙ্কলক খলিফা ওসমানের জীবন এইরূপ নির্মম লাঞ্ছনার ভিতর সমাপ্তি লাভ করিল।

চতুর্থ খলিফা হযরত আলী (রাঃ)

(৬৫৬–৬১ খৃঃ)

হযরত ওসমানের মৃত্যুর পর খিলাফতের প্রশ্ন পুনরায় নূতন জটিলতা লইয়া দেখা দিল। অনেকের ধারণা হইল, এবার হযরত আলীর খলিফা হওয়া একরূপ অবধারিত। কিন্তু আলী কোন প্রকার সাড়া দিলেন না। একে একে সাতদিন অতিবাহিত হইল, কোনই মীমাংসা হইল না। মিশরের লোকেরা আলীকে বিশেষভাবে অনুরোধ করিল খিলাফত গ্রহণ করিতে। আলী কহিলেন, মুস্‌লিম জাহানে এখন নানা প্রকার মতবিরোধ চলিতেছে। কুফার লোকেরা যুবায়েরকে চায়। বসরার লোকেরা তালহাকে চায়। অন্যান্য প্রদেশেও মতানৈক্য রহিয়াছে। এ অবস্থায় হঠাৎ কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ সমীচীন হইবে না। সকলে মিলিয়া একটা মীমাংসায় উপনীত হওয়া দরকার। মদিনাবাসীরাও আলীকে খলিফা হইতে অনুরোধ করিল; কিন্তু আলীর সেই একই কথা ঃ ওমরের সময়ের মত সকলে সমবেত হইয়া প্রকাশ্য সভায় খলিফা নির্বাচন কর, যিনি নির্বাচিত হইবেন তাঁহারই হস্তে আমরা বায়াৎ হইব। কিন্তু মুসলিম সাম্রাজ্য এখন আর সামান্য ভূভাগ মাত্র নহে। বহু বিভিন্ন প্রদেশের মতামতের সমন্বয় সাধন এক দুরূহ ব্যাপার। লোকে তাল্‌হা এবং যুবায়েরকে অনুরোধ করিল। তাঁহারাও খিলাফৎ গ্রহণে অস্বীকৃত হইলেন। পরিশেষে সাধারণ সভাই আহূত হইল। সভায় আলী খিলাফতের প্রার্থী না হইয়া প্রস্তাব করিলেন যে, সর্বাগ্রে আমাদের দেখা উচিত, হযরতের খাস সাহাবগণের মধ্যে কেহ খিলাফৎ গ্রহণে সম্মত আছেন কিনা। তাঁহাদের অনেকে উপস্থিত ছিলেন না। সভা পরদিনের জন্য স্থগিত রহিল। লোকেরা সা'দ বিন ওকক্কাস, সা'দ বিন যায়েদ, যুবায়েদ, তাল্‌হা, আবদুল্লাহ্‌ বিন ওমর

ইত্যাদি বিশিষ্ট সাহাবাগণের বাটিতে বাটিতে গিয়ে তাঁহাদের অভিপ্রায় জানিতে লাগিল। কিন্তু ইহারা কেহই এই বিশৃঙ্খলা সাম্রাজ্যের পরিচালনভার গ্রহণে সাহসী হলেন না। পরদিবস সভা আরম্ভ হইলে লোকেরা পুনরায় আলীকে চাপিয়ে ধরিল। একদিন যুবায়ের ও তাল্‌হা সভায় আসিলেন না বলিয়া পাঠাইলেন, সকলে যাহাকে মনোনীত করে আমরা তাঁহারই হস্তে বায়াৎ হইব। আলী এ কথায় সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না। তখন মালিক ওশ্‌তুর ও হাকিম বিন জাবালা গিয়া তাঁহাদিগকে পীড়াপীড়ি করিয়া সভায় হাযীর করিলেন। তাঁহারাও আলীকে বলিলেন, আপনার সম্মুখে আমরা কি ছার! তখন মালিক ওশ্‌তুরের অনুরোধে আলী হস্ত প্রসারিত করিলেন। প্রথমে তাল্‌হা, তৎপর যুবারের এবং পরে অন্য সকলে আলীকে হস্তচুম্বন দ্বারা খলিফারূপে গ্রহণ করিলেন। অতঃপর আলী মসজিদে গিয়া তাঁহার দীর্ঘ ধনুকে ভর দিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। দলে দলে লোক আসিয়া তাঁহার হস্তে বায়াৎ হইল। শুধু উমাইয়া বংশের দুই চারজন সরিয়া পড়িল। তাহাদের ভিতর মিশরের শাসনকর্তা আবদুল্লাহ্ বিন সা'দ বিন সরুর, সিরিয়ার শাসনকর্তা মু'আবিয়া ও ওসমানের মন্ত্রণাসচিব মারোয়ান ছিলেন অন্যতম।

উমাইয়া বংশের যে কয় ব্যক্তি হযরত আলীর নির্বাচনে সহযোগিতা করে নাই তাহারা মু'আবিয়ার নেতৃত্বাধীনে দল পাকাইতে লাগিল। সমৃদ্ধ দেশ সিরিয়ার শাসনকর্তা হিসাবে মু'য়াবিয়ার অর্থবল ও জনবল উভয়ই ছিল প্রচুর। প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের ভিতরও অনেকেই ছিল উমাইয়া বংশীয় অর্থাৎ মু'য়াবিয়ার জাতি। কাজেই কেন্দ্রীয় সরকার হযরত আবুবকর ও ওমরের সময়ের মত দৃঢ়ভিত্তিক ও শক্তিশালী হইতে পারিল না।

নূতন খলিফা কার্যভার গ্রহণ করিয়া কঠোর ন্যায়নিষ্ঠা সহকারে কুরআন ও শরীয়তের শাসন দ্বারা রাজ্যে শৃঙ্খলা স্থাপনে প্রয়াসী হইলেন। হযরত ওসমানের নিয়োজিত গভর্ণরদের মধ্যে যাঁহারা দুর্নীতি পরায়ণ বলিয়া কুখ্যাত হইয়াছিলেন তাঁহাদিগকে পদচ্যুত করিলেন। কিন্তু হযরত ওসমান মুসলিম রাষ্ট্রকে যে দারুণ অশান্তি ও বিক্ষোভের ভিতর ফেলিয়া

দেহত্যাগ করেন তাহার প্রতিকার শুধু শাসন–ব্যবস্থার কড়াকড়ি দ্বারা সম্ভবপর ছিল না। এজন্য নূতন খলিফা জনগণের মানসিক পরিবর্তনেরও চেষ্টা করিতে লাগিলেন। মদীনার মসজিদে তিনি পূর্বের মতই আধ্যাত্মিকতা এবং ত্যাগের মাহাত্ম্য প্রচার করিতে লাগিলেন। কিন্তু ভাগ্য তাঁহার ছিল বিপরীত। বিপদের কালমেঘ এমন এক কোণ হইতে দেখা দিল, যাহার কথা পূর্বে কেহই ভাবিতে পারে নাই। তার ফলে আলীকে মসজিদের বক্তৃতামঞ্চ ও খলিফার মন্ত্রণাগৃহ ছাড়িয়া পুনরায় জুলফিকার হস্তে সৈন্যবাহিনীর অধিনায়ক রূপে রণক্ষেত্রে ধাবিত হইতে হইল।

জঙ্গে জমল

হযরত ওসমান যখন নিহত হন নবপত্নী বিবি আয়শা তখন মক্কায় অবস্থান করিতে ছিলেন। হযরত আলীর শত্রুরা তাঁহার নিকট গিয়া এই দুঃসংবাদ অতি সকরুণ সুরে বর্ণনা করিয়া আলীর উপর এই হত্যার জন্য দোষারোপ করিল। বিশেষতঃ লোকেরা যখন বলিল, খলিফা ওসমান কুরআন তেলাওৎ করিতেছিলেন, এমন সময় আততায়ীর তরবারি তাঁহার উপর নিপাতিত হইয়াছে, তখন বিবি আ'য়িশার ক্ষোভের সীমা রহিল না। এদিকে তাল্‌হা, যুবায়ের প্রভৃতি দলপতিগণ যাঁহারা ভিতরে ভিতরে আলীকে ঈর্ষার চক্ষে দেখিতেন তাঁহারা আলীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ সৃষ্টির সুযোগ খুঁজিতে ছিলেন। তাঁহারাও মক্কায় গিয়া বিবি আ'য়িশার নিকট উপনীত হইলেন। তাল্‌হা কুফার শাসনভার ও যুবায়ের বসরার শাসনভার চাহিয়াছিলেন কিন্তু হযরত আলী তাঁহাদের সেই বাসনা পূর্ণ করেন নাই। ইহাতে তাঁহারা ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন। তাল্‌হা ছিলেন হযরত আবুবকর সিদ্দিকের গোত্রজ এবং এই সূত্রে বিবি আ'য়িশার জ্ঞাতি। যুবায়ের বিবি খাদিজার ভ্রাতুষ্পুত্র এবং আ'য়িশার সুপরিচিত। তাঁহারা আলীর উপর প্রতিশোধ লইতে বিবি আ'য়িশাকে প্ররোচিত করিলেন। ইঁহাদের চেষ্টায় আলীর বিরুদ্ধে মক্কায় একটি বিরোধী দল গঠিত হইতে অধিক বিলম্ব হইল না। এই দলের নাম হইল 'জামায়তে ইসলাহ্।'

কিন্তু অল্পসংখ্যক লোক লইয়া বীরকেশরী আলীর সম্মুখীন হইতে কেহ সাহসী হইলেন না। তখন দলপতিগণ সৈন্য সংগ্রহার্থে বসরা যাত্রা করিলেন। বসরা সমৃদ্ধ দেশ। বাণিজ্য ব্যপদেশে বসরার সহিত মক্কার কুরায়েশগণের সম্পর্ক ছিল নিবিড়। কাজেই সেখানে কার্যসিদ্ধি সহজ বিবেচিত হইয়াছিল। তথাপি তাঁহারা হযরতের প্রধানা পত্নী বিবি

হাফ্জাকেও সঙ্গে লইলেন। বিবি হাফ্জা হযরত ওমরের কন্যা আবুবকর-তনয়া আ'য়িশার পরেই তাঁহার স্থান। হযরত আলীর মা সর্বজনমান্য ব্যক্তির বিরুদ্ধে জনমত গঠিত করিতে এবং সৈন্য সংগ্রহ করিতে এই দুই শ্রেষ্ঠা রমণীর অসাধারণ প্রতিপত্তির সুযোগ গ্রহণ করা ছাড়া যুবায়ের ও তাল্হার পক্ষে অন্য কোনও উপায় ছিল না। তাঁহারা সরল প্রাণ বিবিদ্বয়কে বুঝায়াছিলেন, যুদ্ধ স্ত্রীলোকের ধর্ম নহে; আপনাদিগকে কিছুই করিতে হইবে না। শুধু বসরা পর্যন্ত আপনারা সঙ্গে থাকিবেন, তারপর যা' করিতে হয় আমরাই করিব। এইরূপে বার হাজার সৈন্য সংগৃহীত হইল। কিন্তু ইস্‌লামের প্রাথমিক যুগের সকল ভক্তের অন্তর হইতে তখনও হযরতের মহাশিক্ষার প্রভাব এককালে বিলুপ্ত হইয়া যায় নাই। বসরার শাসনকর্তা বৃদ্ধ ওসমান ইব্‌নে হানিফ নিয়মতন্ত্রের মর্যাদা রক্ষায় বদ্ধপরিকর হইলেন এবং সর্বসাধারণের নির্বাচিত খলিফার বিরুদ্ধে ব্যক্তি-বিশেষের এই উত্থান তিনি সমর্থন করিলেন না। ফলে ওসমানের সহিত মক্কার সৈন্যদের সংঘর্ষ হইল। ওসমান পরাজিত হইলেন। বয়োবৃদ্ধ বলিয়া বিবি আ'য়িশা তাহার প্রাণবধ নিষেধ করিয়াছিলেন। বৃদ্ধ জীবন ভিক্ষা পাইলেন বটে, কিন্তু নিদারুণ মনোদুঃখে মদিনায় চলিয়া গেলেন এবং হযরত আলীর নিকট সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিলেন। আলী অতিশয় দুঃখিত ও ক্রুদ্ধ হইলেন। হযরত ওসমানের হত্যার জন্য ইঁহারা খোদ খলিফার নিকট বিচারপ্রার্থী না হইয়া বিদ্রোহ করিয়াছে। আলী ইঁহাদের দমনের জন্য অবিলম্বে সৈন্যসহ বসরায় যাত্রা করিলেন (৩৬ হিঃ) উভয় পক্ষের সৈন্যদল ওয়াদি-আস-সাবা উপত্যকার খোরায়বা নামক স্থলে পরস্পরের সম্মুখীন হইল। উহা পরে জমলের প্রান্তর নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। জমল শব্দের অর্থ উষ্ট্র। এই যুদ্ধকে জঙ্গে জমল বা উষ্ট্রের যুদ্ধ বলা হয়। একটি উষ্ট্রের পতন এই যুদ্ধের ভাগ্য পরিবর্তন করিয়াছিল।

এই যুদ্ধে বিভিন্ন স্বার্থের বহু লোক বিভিন্ন মতলবে আলী পক্ষে যোগদান করিয়াছিল। এমন কি উমাইয়াদের লোকও খলিফার উদ্যোগ ব্যর্থ

করার উদ্দেশ্যে তাঁহার সৈন্যদলে মিশিয়া গিয়াছিল। আবার, যাহারা হযরত ওসমানের হত্যার ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট ছিল তাহারাও খলিফার সাহায্যে অগ্রসর হইয়াছিল এই ধারণায় যে, তাল্‌হা ও যুবায়ের জয়লাভ করিলে এই সকল অপরাধীর কাহারও গর্দনে শির থাকিবে না। খলিফার নিজস্ব সৈন্যদলের তুলনায় উক্ত দুই দলের সংখ্যা নগণ্য ছিল না।

উভয়দিকে সমবেত মুসলিম সৈন্য সন্দর্শনে করুণ হৃদয় আলীর প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। তার খিলাফতের জন্য এতগুলি মুসলিম নিহত হইবে? আলী আপোষ মীমাংসার জন্য প্রয়াসী হইলেন। নিজ সৈন্যগণকে আহবান করিয়া আদেশ করিলেন যাহারা হযরত ওসমানের হত্যার ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট তাহারা অবিলম্বে অপর সৈন্যগণ হইতে পৃথক হও। তাহাদের পরিচয় দুজ্ঞেয় নহে। আমি আশা করি, তাহাদিগকে পৃথক করার জন্য কোনও অস্ত্র ব্যবহারের প্রয়োজন ঘটিবে না। তাহাদের নিজ নিজ ঈমাই যথেষ্ট। রাজকীয় আদেশে বহু সৈন্য পৃথক পংক্তিতে দণ্ডায়মান হইল। ইহাদের ভিতর মহাবীর মালিক ওশ্‌তুরও ছিলেন। এই বীর বহুযুদ্ধে হযরত আলীর সাহায্যের উদ্দেশ্যে জীবনপণ করিয়াছেন। কি আপদে, কি সম্পদে, ইনি সর্বদা আলীর হিতাকাঙ্খী ছিলেন। এহেন মালিক ওশ্‌তুরকেও খলিফা খাতির করিলেন না। তাঁহারা পৃথক তাঁবুতে নিজ নিজ ভবিষ্যতের জণ্য প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

এদিকে আলী পৃথক পৃথকভাবে তাল্‌হা ও যুবায়েরকে আহবান করিয়া বলিলেন, ভাইসব, আমি তো তোমাদের হস্তে বায়াৎ হইতেই প্রস্তুত ছিলাম। তোমরা তখন খিলাফৎ গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিয়াছ এবং আমার উপর এই গুরুভার অর্পণ করিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছ, সকল বিপদে আমার সহায়তা করিবে। তবে কেন আজ এই বিবাদ? তোমাদের অন্তর জানে ওসমানের হত্যার সহিত আমার কোন সংশ্রব নাই। তোমাদের কি মনে পড়ে না, কত যুদ্ধে তোমাদের সহিত পাশাপাশি দাঁড়াইয়া একই মহাব্রতের উদযাপনে অস্ত্রচালনা করিয়াছি ও রক্তদান করিয়াছি? কত প্রাতঃ সন্ধ্যায় মহাপ্রভু মুহাম্মদের (সঃ) পাদমূলে একত্রে বসিয়া শাস্ত্রজ্ঞান অর্জন

করিয়াছি। আজ কি করিয়া ভাই হইয়া ভাইয়ের বুকে অস্ত্র নিক্ষেপ করিবে? মহাপ্রভুর শিক্ষা কি এমনই ক্ষণস্থায়ী সলিললেখা মাত্র? আর যদি ভ্রাতৃ-হত্যাই তোমাদের আকাঙ্ক্ষিত হয়, যদি নিরপরাধ আলীর শোণিতপাত দ্বারাই ওসমানের হত্যার প্রতিশোধ লওয়া তোমাদের বাসনা হয়, তবে আলীর উন্মুক্ত বক্ষ এই তোমাদের সম্মুখে প্রসারিত! উদ্দেশ্য সমাধা কর। দেশে যুদ্ধানল জ্বালিয়া মুসলিম রাষ্ট্রের ধ্বংস সাধন করিও না। আলীর মর্মস্পর্শী বাক্যে তাল্‌হা ও যুবায়েরের অন্তর গলিয়া গেল। তাঁহারা তরবারি স্পর্শ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন, যুদ্ধ করিবেন না। আপোষ বিচার দ্বারা শান্তি স্থাপন করিয়া গৃহে ফিরিবেন।

এদিকে মালিক ওশ্‌তুর প্রমুখ তীক্ষ্ণবুদ্ধি সেনানায়কগণ দেখিল, সন্ধি একরূপ স্থির এবং আলী যখন স্বয়ং সন্ধির প্রার্থী তখন অপর পক্ষের মনস্তুষ্টির জন্য তিনি হয়ত ওসমানের হত্যার প্রতিদানে তাঁহাদের প্রাণদণ্ডও করিতে পারেন। কাজেই সন্ধি হইলে মৃত্যু একরূপ অবধারিত জানিয়া তাঁহারা সন্ধির বিরোধিতা করিতে কৃতসংকল্প হইলেন।

সন্ধি শীঘ্রই স্থাপিত হইবে আশায় আলী নিশ্চিন্ত আছেন,- এমন সময় অকস্মাৎ মালিক ওশ্‌তুর তাঁহার নিজ ইরাকী বাহিনী লইয়া ভীম বিক্রমে যুবায়েরী সৈন্যের উপর আপতিত হইলেন। আক্রান্ত সৈন্যগণ প্রস্তুত ছিল না। তাহারা হতবুদ্ধি হইয়া যুবায়েরকে সংবাদ দিল যে, আলী প্রতারণা করিয়াছেন, আপনারা শীঘ্র সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হউন। তাল্‌হা ও যুবায়ের প্রথমে বিশ্বাস করিতে পারিলেন না যে, আলী এরূপ প্রতারণা করিতে পারেন। কিন্তু যখন দেখিলেন আলীর দক্ষিণহস্ত স্বরূপ মহাবীর মালিক ওশ্‌তুর বিদ্যুতের ন্যায় যুবায়েরী সৈন্যের উপর অস্ত্রচালনা করিতেছে তখন তাঁহাদের প্রতীতি হইল, সত্যই আলী প্রতারণা করিয়াছেন। তাঁহাদের ক্রোধের সীমা রহিল না। তাল্‌হা ও যুবায়ের উভয়েই মক্কার প্রথিতনামা যোদ্ধা।

তাঁহারা উন্মুক্ত তরবারি হস্তে খলিফার সৈন্যদলের উপর আপতিত হইলেন। যাহারা মালিক ওশ্‌তুরের সহিত যোগদান করে নাই তাহারাও নিস্তার পাইল না। এই দলের লোকেরা আসিয়া আলীকে বলিল, তাল্‌হা ও যুবায়ের যুদ্ধ করিবে না বলিয়া তরবারি স্পর্শ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়া আপনাকে প্রতারিত করিয়াছে। আলীরও অত্যন্ত বিস্ময় ও ক্রোধ জন্মিল। তিনি সেনাবাহিনীকে অবিলম্বে অস্ত্রধারণ করিতে ও যুবায়েরী সৈন্যের গতিরোধ করিতে আদেশ দিলেন। কিন্তু নিজে তখনও সন্ধি স্থাপনের চেষ্টা হইতে বিরত হইলেন না। যুদ্ধ স্থগিত করার জন্যে দূতের হস্তে কোরআন দিয়া শত্রু শিবিরে প্রেরণ করিলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে দূত মালিক ওশতুরের হস্তে নিহত হইল। সন্ধির শেষ চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইল। যুদ্ধের তীব্রতা ক্রমে চরমে উঠিল। আলী সন্ধির জন্য তাল্‌হা–যুবায়েরের যোগদান স্থাপন করিবার যুযোগ পাইলেন না। কারণ যে বিপ্লবী দল যুদ্ধক্ষেত্রে আত্মগোপন করিয়া ছিল তাহাদের অতর্কিত তীর নিক্ষেপের ফলে তাল্‌হা ও যুবায়ের উভয়ই নিহত হইলেন।

তৎকালে আরব রমণীগণ যুদ্ধবিদ্যায় অজ্ঞ ছিলেন না। যখন যুবায়েরী সৈন্যগণ চালক অভাবে ইতস্ততঃ ছত্রভঙ্গ হইতে লাগিল তখন কতিপয় প্রধান ব্যক্তির আকুল আহ্বানে বিবি আ'য়িশা তাঁবু হইতে নির্গত হইলেন এবং স্বয়ং তাহাদের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া উষ্ট্রপৃষ্ঠ হইতে সৈন্যগণকে নির্দেশ দিতে লাগিলেন। তাহারা আবার ঘুরিয়া দাঁড়াইল এবং প্রাণপণে অস্ত্রচালনা করিতে লাগিল। কিন্তু তাহাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ বিবি আ'য়িশার উষ্ট্র আহত হইয়া হাওদাসহ রণক্ষেত্রে বসিয়া পড়িল। সৈন্যগণ আর তাঁহাকে লক্ষ্য করিতে পারিল না। যুদ্ধের গতি আবার তাহাদের প্রতিকূলে চলিল। আলীর সৈন্য বিজয়লাভ করিল। এদিকে আলী দ্রুত গিয়া বিবি আ'য়িশার উষ্ট্রপার্শ্বে নতজানু হইলেন, যাহাতে কেহ উম্মুল মু'মেনীনের অসম্মান না করে। যুদ্ধান্তে আলী সসম্মানে তাঁহাকে উপযুক্ত রক্ষীসহ মদীনায় প্রেরণ করিলেন। মক্কা ও মদীনার বিদ্রোহ থামিয়া গেল।

মু'আবিয়ার বিদ্রোহ

অতঃপর পূর্বাঞ্চলে চ্যাল্‌ডিয়া ও মেসোপটেমিয়ায় বিদ্রোহ দেখা দিল। হযরত আলী আবার সেগুলি দমন করিতে ছুটিয়া গেলেন। কিন্তু বিদ্রোহ দমন করিয়া তিনি রাজধানীতে প্রত্যাগত হইতে না হইতে রাজ্যের আর এক প্রান্ত হইতে সমরানল জ্বলিয়া উঠিল। সিরিয়ার শাসনকর্তা মু'য়াবিয়া ছিলেন ইহার উদ্যোক্তা! পাছে সমগ্র উত্তর আরব এইভাবে বিদ্রোহ করে, এই আশঙ্কায় আলী তাড়াতাড়ি কুফায় রাজধানী স্থানান্তরিত করিলেন (৬৫৬ খৃঃ) এদিকে উমাইয়া বংশের যে সমস্ত গবর্ণর পদচ্যুত হইয়াছিল তাহাদের ভিতর কেহ কেহ বিদ্রোহী মু'আবিয়ার সহিত মিলিত হইল। তাল্‌হা ও যুবায়েরের নিধন অজুহাতে মু'য়াবিয়া আলীর রাজধানী কুফা আক্রমণের জন্য অগ্রসর হইলেন। অগত্যা আলী তাঁহার শাহীসৈন্য লইয়া সিফ্‌ফিনের প্রান্তরে মু,য়াবিয়ার সম্মুখীন হইলেন (৬৫৭ খ্রীঃ)।

মালিক ওশ্‌তুর এ দুর্দিনে আলীকে ত্যাগ করিলেন না। তিনি তাঁহার দুর্ধর্ষ ইরাকী সৈন্য লইয়া আলীর সহিত মিলিত হইলেন। কুফার শাসনকর্তা মু'সা বিন আল্‌ আশারীও তাঁহার কুফীবাহিনী লইয়া আলীর সঙ্গে যোগদান করিলেন। অপর দিকে, মু'আবিয়ার পক্ষাবলম্বন করিলেন মিশরের শাসনকর্তা উমাইয়া বংশীয় আমর বিন আ'স। সৈন্যবাহিনীর পরিচালনার ভার লইলেন আমর, মন্ত্রণা দিতে লাগিলেন কুটনীতি বিশারদ মারোয়ান। সিরিয়ার বহু প্রথিতনামা যোদ্ধা এই সময়ে পদমর্যাদা ও অর্থলোভে মু'য়াবিয়ার পক্ষে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। বস্তুতঃ সিফফিন যুদ্ধের আয়োজন ছিল যেমন বিরাট উহার স্থায়িত্বও হইয়াছিল তেমনি দীর্ঘ। তেমনি উহার ভাবীফল হইয়াছিল যুগান্তকারী। কেননা, এই যুদ্ধের পর হইতেই রাজতন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদের সূত্রপাত হয় এবং নবী-প্রবর্তিত

গণতান্ত্রিক নীতি ক্রমশঃ বর্জিত হইতে থাকে।

বস্তুতঃ সিফফিন যুদ্ধের মূল কারণ তালহা ও যুবায়েরের হত্যা ছিল না। দীর্ঘ দেড়শত বৎসর ধরিয়া বনি হাশিমদের বিরুদ্ধে বনি উমাইয়াদের যে বিদ্বেষ-বহ্নি ভিতরে ভিতরে ধূমায়িত হইতেছিল এবং যাহা হযরতের সাহচর্যের অমৃত মোক্ষণে কিয়ৎকালের জন্য সাম্যভাব ধারণ করিয়াছিল, মু'আবিয়ার এই বিদ্রোহ তাহারই কেন্দ্রীভূত বিক্ষোভের অগ্ন্যুদগার। হাশিমী বংশকে উৎখাত করিয়া নিজ উমাইয়া বংশে খিলাফৎ আনয়ন ছিল মু'আবিয়ার মুখ্য উদ্দেশ্য।

ফোরাত নদীর পশ্চিম তীরে রাক্কা নামক প্রসিদ্ধ বন্দরের পশ্চিমে সিফফিনের বিশাল প্রান্তর। এইখানে আলী-সৈন্য ও মু'আবিয়া সৈন্য পরস্পরের সম্মুখীন হইল। উভয় পক্ষের শিবির রাশিতে নদীতীর আচ্ছন্ন হইল। পার্শ্ববর্তী ফোরাতের পানি উভয় বাহিনীই স্ব স্ব আয়ত্তাধীন রাখিল। এই ফোরাতেরই কুলে কারবালার যুদ্ধে ইমাম-পক্ষ পানি অভাবে কি কষ্টেই না পতিত হইয়াছিল!

পূর্বেই বলিয়াছি সিফফিন যুদ্ধের আয়োজন ছিল যেমন বিরাট উহার স্থায়িত্বও হইয়াছিল তেমনি দীর্ঘ। এক্ষেত্রেও আলী যুদ্ধের প্রাথমিক অবস্থায় আপোষ বিবাদ মীমাংসার চেষ্টা করেন। কিন্তু মু'আবিয়ার দাবী ছিল অসঙ্গত। তাঁহার কথা হইল, তিনি হযরত ওসমানের হত্যার প্রতিশোধ লইতে আসিয়াছেন; এই হত্যা সম্পর্কে যাহাকে যাহাকে তিনি সন্দেহ করেন তাহাদের সকলকে না পাওয়া পর্যন্ত তিনি দামেস্কে প্রত্যাবর্তন করিবেন না। অথচ এমন অনেক লোককে তিনি সন্দেহ করিতে লাগিলেন যাহারা হযরত ওসমানের হত্যার জন্য মোটেই দায়ী ছিল না। আলী ইহাতে সম্মত হইতে পারিলেন না। সুতরাং যুদ্ধ চলিতে থাকিল। ক্রমে মহরম মাস আসিয়া পড়িল। এই মাসে আরবের লোকেরা যুদ্ধ করে না। এক মাসের জন্য যুদ্ধ স্থগিত হওয়ায় উভয় পক্ষ নিশ্চেষ্টভাবে শিবিরে বসিয়া দিন কাটাইতে লাগিল। এই অবসরে আলী আর একবার বিরোধ মীমাংসার প্রয়াস পাইলেন। কিন্তু কুট কৌশলী মু'আবিয়া এবার এক নূতন

চাল চালিলেন। তিনি বলিলেন, বিনা রক্তপাতে যুদ্ধ নিষ্পত্তি হইতে পারে শুধু একটি শর্তে। হযরত ওমরের মৃত্যুকালে যেরূপ সাধারণ সভা আহূত হইয়া খলিফা নির্বাচিত হইয়াছিল, সেইরূপ এক বিরাট সভা আহ্বান করা হউক। তাহাতে আলী ও আমার ভিতর লোকে যাহাকে নির্বাচন করে সে-ই খলিফা হইবে, অপর ব্যক্তি তাহার বশ্যতা স্বীকার করিবে। আলী উত্তর করিলেন, খিলাফতের প্রশ্ন ইহার ভিতর আসিতে পারে না। হযরতের যাবতীয় সাহাবা মিলিয়া আমাকে খিলাফতের দায়িত্ব অর্পণ করিয়াছেন। মুসলিম জনসাধারনও আমাকে খলিফা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে। এমতাবস্থায় আমার জীবদ্দশায় খিলাফতের প্রশ্ন আর দ্বিতীয় বার উঠিতে পারে না। ফলে সন্ধির প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইল। কিন্তু এই ঘটনায় মু'আবিয়া যুদ্ধাভিযানের প্রকৃত উদ্দেশ্য প্রকটিত হইল। মহরম মাস অতীত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই উভয় দল পুনরায় শক্র সংহারে প্রবৃত্ত হইল।

জঙ্গে সিফ্‌ফিন

পার্শ্বে ফোরাত নদী। ভীমা ভয়ঙ্করী এই নদী কত রাজ্যেরই না উত্থান-পতন দেখিয়াছে। কে জানিত এই ফোরাত তীরে, সিফ্‌ফিনের মরু প্রান্তরে, জুলফিকারের তেজ ব্যর্থ প্রতিপন্ন হইবে কুচক্রীদের কুট কৌশলের নিকট এবং শেরে খোদাকে এবার বিফল মনোরথ হইয়া রণক্ষেত্র ত্যাগ করিতে হইবে। যুদ্ধ প্রথমতঃ প্রাচীন প্রথানুযায়ীই চলিতেছিল। প্রসিদ্ধ যোদ্ধাগণ একে একে সমর ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া অপর পক্ষীয় বীরগণকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করিত। একের নিধনের সঙ্গে আর এক বীর আসিয়া তাঁহার স্থান পূরণ করিত। এইভাবে দীর্ঘ দিন ব্যাপী যুদ্ধে উভয় পক্ষের অনেক শক্তিশালী যোদ্ধা নিহত হইল। অথচ জয় পরাজয় নির্ণীত হইল না। দীর্ঘকাল শিবির সংরক্ষণের ফলে ক্রমে সৈন্যদের রসদপত্র ফুরাইয়া আসিল। তখন উভয় পক্ষই সমবেত আক্রমণে প্রস্তুত হইল। মুসলিম জাহানের খলিফা স্বয়ং অস্ত্র ধারণ করিলেন এবং সমর সাজে সজ্জিত হইয়া অশ্বপৃষ্ঠে শাহী সৈন্যের পুরোভাগে স্থান গ্রহণ করিলেন। শ্বেতশ্মশ্রু শ্বেতকেশ তাপস-খলিফার শুক্লাম্বরের উপর রণবেশ ও জুলফিকার আবার অতীত দিনের সেই মহাযোদ্ধা "শেরে খোদা" কে নূতন দীপ্তিতে প্রকট করিয়া তুলিল। সৈন্যগণ উল্লাসে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। আলীর নির্দেশে তাহারা সপ্তদলে বিভক্ত হইয়া সাত জন সুদক্ষ সেনাপতির অধীনে ব্যূহ রচনা করিল। কেন্দ্রস্থলে রহিলেন খলিফা স্বয়ং।

অপর দিকে মু'আবিয়াও যুদ্ধবিদ্যায় অপক্ক ছিলেন না। সিরিয়ার সমরক্ষেত্র ছিল তঁহার যৌবনের লীলাভূমি। দামেস্কের শাসন-ভার পাইয়া একদা তিনি রোমক সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে সমরায়োজন করিয়া ছিলেন। ভূমধ্যসাগরে তাঁহারই উদ্যোগে মুসলিম রণতরী ভাসমান হইয়াছিল।

সিরিয়ার সুশিক্ষিত যুদ্ধবাহিনী একরূপ তাঁহারই সৃষ্টি। তিনিও উপযুক্তভাবেই ব্যবস্থা গ্রহণ করিলেন। সৈন্যদলকে সপ্তদলে বিভক্ত করিয়া আলীপক্ষের সম্মুখীন হইলেন। বহু যুদ্ধের প্রখ্যাত সেনাপতিগণ তাঁহার বিশাল বাহিনীর বিভিন্ন শাখার নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন। সর্বোপরি, অধিনায়ক হইলেন তাঁহার জ্ঞাতিভ্রাতা মিশর বিজয়ী কূটনীতি বিশারদ আমর বিন আস্।

যুদ্ধের প্রারম্ভে আলী তাঁহার সৈন্যদলকে সম্বোধন করিয়া ধীরে উদাত্ত কণ্ঠে এক নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা করিলেন। কহিলেন, বীরগণ আল্লা'র নামে অস্ত্র ধারণ কর। তোমাদের উপরেই তোমাদের প্রিয় রসূলের প্রতিনিধির জীবন-মরণ, জয়-পরাজয় নির্ভর করিতেছে। কেহই নিজ প্রাণ বাঁচাবার জন্য ব্যস্ত হইও না, পরন্তু প্রত্যেকেই অপরকে রক্ষার চেষ্টা করিবে। প্রত্যেকেই মনে রাখিবে, আমারই উপর যুদ্ধের জয়-পরাজয় নির্ভর করিতেছে এবং আমি পলায়ন করিলে অপর সকলেও পলায়ন করিতে পারে। স্থিরচিত্তে সম্মুখে অগ্রসর হও, শত্রু যেন তোমাদের পৃষ্ঠ দেখিতে না পায়। কেহই নিজেকে সামান্য যোদ্ধা মনে কিরবে না, কেননা প্রত্যেকের চেষ্টার উপরই যুদ্ধের সামগ্রিক ফলাফল নির্ভর করিতেছে এবং আল্লাহ সর্বদাই বিশ্বাসিগণের সহায়তা করেন।

আলীর এই বাণী সৈন্যগণের মর্মস্পর্শ করিল। সমগ্র বাহিনী মৃত্যুপণ করিয়া শত্রুসেনার উপর আপতিত হইল। দামেস্ক সৈন্যও উচ্ছ্বসিত সাগরবারির ন্যায় ইহাদের উপর ঢলিয়া পড়িল। অস্ত্রে অস্ত্রে ঝঞ্জনা বাজিতে লাগিল। সূর্যকিরণে উভয় দলের শাণিত অসি ও বর্শাফলক অপূর্ব ঝলকে খেলা করিতে লাগিল। মূহুর্মূহু নরশোণিতে ভূমিতল রঞ্জিত হইতে লাগিল। মানুষের হুঙ্কার, অশ্বের গর্জন, গদা-গোর্জ ও তীর-বল্লমের সঞ্চালন, সব মিলিয়া যেন প্রলয়ের সূচনা করিল। প্রত্যুষ হইতে সমস্ত দিন এইভাবে যুদ্ধ চলিল। যোহর ও আসরের নামাজ আলী ও তাঁহার সৈন্যগণ যুদ্ধক্ষেত্রেই সমাধা করিলেন। একদলকে পুরোভাগে রাখিয়া অপর দল পশ্চাতে আসে ও নামায পড়ে। আবার, সে দল পুরোভাগে যায় ও অপর দলকে নামায পড়িবার সুযোগ দেয়। কোনও অবস্থায়ই যুদ্ধের বিরতি নাই। ক্রমে সূর্য

অস্তমিত হইল। রণভূমি অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল। কিন্তু যুদ্ধ থামিল না। বিশ্বাসিগণ সেই অবস্থায়ই মগরব ও ইশার নামাযও রণক্ষেত্রেই সম্পন্ন করিল। যুদ্ধাবস্থাই রজনী কাটিয়া গেল। আবার, নূতন সূর্য উদিত হইল। উদয়াকাশের রাঙ্গারশ্মি সৈন্যদলের বর্শাফলকে ও শিরস্ত্রাণে রক্তরাগ মাখিয়া দিল। যুদ্ধ চলিতে থাকিল।

বিলাসিতার ক্রোড়ে লালিত দামেস্ক সৈন্যগণ শিক্ষাপ্রাপ্ত ও রণপটু হইলেও দীর্ঘসময় ব্যাপী বিরামহীন যুদ্ধে ক্রমশঃ ক্লান্ত হইয়া পড়িতেছিল। মু'আবিয়া ইহা লক্ষ্য করিলেন। তিনি আরও বুঝিলেন, কঠোরতায় চির অভ্যস্ত মদীনা সৈন্যগণ যেভাবে মরণপণ করিয়া যুদ্ধ করিতেছে তাহাতে একপক্ষ একেবারে নির্মূল না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ বিরতির আশা নাই। তখন তিনি সমগ্র দামেস্ক সৈন্যদলকে একযোগে আলীকে কেন্দ্র করিয়া আক্রমণ চালাইতে নির্দেশ দিলেন। উদ্দেশ্য, আলীর পৃষ্ঠরক্ষী মূলব্যূহ বিধ্বস্ত হইলেই অন্য সব সৈন্য পলায়ন করিবে। দামেস্ক সৈন্যগণ তাহাই করিল। তাহাদের সমবেত আক্রমণের ফলে আলীর পার্শ্ববর্তী সৈন্যদল ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল। আলী মুহুর্মুহুঙ্কার দিয়া তাহাদিগকে তিষ্ঠিত বলিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে দামেস্ক সৈন্য পঙ্গপালের ন্যায় আলীকে তাঁহার হতাবশিষ্ট সৈন্যসহ ঘিরিয়া ফেলিল। যে সকল শাহীসৈন্য বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল তাহারা হতাশ হইয়া পৃষ্ঠভঙ্গ দিতে আরম্ভ করিল। তখন মৃত্যু অনিবার্য জানিয়া তাঁহার দ্বি-ধার তরবারি জুল্‌ফিকার হস্তে প্রবিষ্ট হইলেন এবং তাঁহার সেই প্রসিদ্ধ "হায়দারী হাঁক" হাঁকিয়া উন্মত্ত সিংহের ন্যায় প্রচণ্ড বিক্রমে শত্রুসৈন্য সংহার করিয়া চলিলেন। সিংহগর্জনে রণস্থলী কাঁপিয়া উঠিল। আলী-পুত্র হাসান, হুসাইন ও হানাফিয়া (মুহাম্মদ হানিফা) যুদ্ধক্ষেত্রের অন্য স্থল হইতে ইহা লক্ষ্য করিয়া দ্রুত অশ্বচালনা করিয়া পিতৃ সাহায্যে অগ্রসর হইলেন। ইমার নামক এক ভক্তবীর আলীকে এইরূপে বিপন্ন দেখিয়া এমনই আত্মহারা হইয়াছিলেন যে, শহীদ হইবার উদ্দেশ্য অন্তিম কলেমা 'শাহাদাৎ' পাঠ করিতে করিতে অসিহস্তে নিবিড় শত্রু

সৈন্যের ভিতর প্রবেশ করিলেন। সেনাপতি মালিক ওশতুর শাহীসৈন্যের অপর পার্শ্ব রক্ষা করিতেছিলেন। তিনি দেখিলেন, আর মুহূর্তকাল বিলম্ব করিলে আলীর মৃত্যু অনিবার্য। তিনিও দ্রুত অশ্ব চালনা করিয়া আলীর সম্মুখবর্তী শত্রুদলের উপর ভীমবেগে আপতিত হইলেন। দেখাদেখি আরও কতিপয় নেতৃস্থানীয় যোদ্ধা প্রাণ বিসর্জনে প্রস্তুত হইয়া আগাইয়া আসিল। বিক্ষিপ্ত পলায়নপর সৈন্যরা আবার ফিরিয়া দাঁড়াইল এবং আলীর পতাকা লক্ষ্য করিয়া আবার দামেস্ক সৈন্যদলকে আক্রমণ করিল। অসংখ্য অস্ত্রাঘাতে ক্ষত বিক্ষত ইমারের দেহ ভূপতিত হইতে দেখিয়া আলী এমনই মর্মাহত হইয়াছিলেন যে, তিনি দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া সম্মুখের বিপুল শত্রুব্যূহ মথিত করিয়া একেবারে মু'আবিয়ার শিবিরের সমীপবর্তী হন এবং তাঁহাকে দ্বৈরথ যুদ্ধে আহ্বান করেন। আলী উচ্চস্বরে হাঁকিয়া বলিলেন, রে দুর্বৃত্ত মু'আবিয়া, বৃথা কেন লোক ক্ষয় করিস। অস্ত্র ধারণ করিয়া আমার সম্মুখীন হ'। খিলাফতের প্রশ্ন আজ তরবারির দ্বারা মীমাংসিত হউক। মু'আবিয়া আমরের পরামর্শ চাহিলেন সেনাপতি আমর তাঁহাকে উৎসাহিত করিয়া কহিলেন, যাও, অস্ত্র হাতে আলীর গতিরোধ কর। যুদ্ধো আহ্বান প্রত্যাখ্যান করা আরবের বীরধর্ম নয়। মুসলিম জাহানে তোমার কলঙ্ক রটিবে। কিন্তু মু'আবিয়া রাজী হইলে না; কহিলেন, তুমি কি উম্মাদ? শেরে-খোদার সম্মুখে অস্ত্রধারণ করিয়া কে কবে জীবিত অবস্থায় গৃহে ফিরিয়াছে? পরাজয় অনিবার্য জানিয়া অগত্যা আমর তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ কূটনীতির আশ্রয় লইলেন এবং কয়েকজন পক্বশ্মশ্রু বর্ষীয়ান সৈনিকের বর্শার অগ্রে কুরআন বাঁধিয়া তাহাদিগকে শ্বেত পতাকাসহ ইরাকী বাহিনীর সম্মুখে সন্ধির প্রতীক স্বরূপ প্রেরণ করিলেন।

ইরাকী সৈন্যগণ শত্রুসৈন্যের বর্শার অগ্রে পবিত্র কুরআন বিলম্বিত দেখিয়া তরবারি কোষবদ্ধ করিল এবং আর কিছুতেই অগ্রসর হইতে সম্মত হইল না। আলী তাহাদিগকে বুঝাইলেন, ইহা ধূর্ত আমরের প্রতারণা মাত্র, যুদ্ধ ক্ষান্ত করিও না, অগ্রসর হও, শত্রু ধ্বংস কর, যুদ্ধের শেষ মীমাংসায় উপনীত হও। কিন্তু সৈন্যগণ কহিল, "হে আমীরুল মুমেনীন, ইসলাম ও

কুরআনের মর্যাদা রক্ষার জন্যই না, তোমাকে খলিফা করিয়াছি। তুমি যদি কুরআনের উপর অস্ত্র নিক্ষেপ করিতে বল, বুঝিব তুমি কাফের, তোমাকে হত্যা করাই আমাদের প্রথম কর্তব্য।" আলী এই প্রকার উত্তরে বিস্মিত ও বিব্রত হইয়া পড়িলেন। তিনি শতই চেষ্টা করিলেন প্রতিপন্ন করিতে যে ইহা প্রকৃত সন্ধির প্রচেষ্টা নহে, আসন্ন ধ্বংস হইতে আত্মরক্ষার জন্য শত্রুর ছলনা মাত্র। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। খারেজী দল অচল অটল। মু'সা আল আ'শারী প্রভৃতি সেনানায়কগণও চেষ্টা করিলেন তাহাদিগকে যুদ্ধরত করিতে কিন্তু কোনও ফলোদয় হইল না। তখন আলী সেনাপতি মালিক ওশতুরকে আহ্বান করিলেন। মালিক তখনও দিকহারা উন্মত্তের ন্যায় শত্রুসেনা নিধন করিয়া চলিয়াছেন। আলীর আহবানে বিরক্ত হইয়া বলিলেন, আজকার যুদ্ধের চূড়ান্ত না করিয়া আমি কিছুতেই শিবিরে ফিরিব না। আলী ইহা শুনিয়া অত্যন্ত অধীর হইলেন এবং বলিয়া পাঠাইলেন, নির্বোধ, তোর ইরাকী সৈন্যরা এদিকে আমাকে হত্যা করুক আর তুই ওদিকে আমার সিংহাসন কায়েম করার জন্য যুদ্ধ কর। অগত্যা মালিক অসি কোষবদ্ধ করিয়া প্রত্যাবর্তন করিলেন। যুদ্ধ স্থগিত হইয়া গেল।

সন্ধির প্রহসন

অতঃপর মু'আবিয়ার প্রস্তাবিত সন্ধি কিভাবে সম্পাদিত হইতে পারে ইহা লইয়া বাদানুবাদ চলিতে লাগিল। আমর বলিয়া পাঠাইলেন, উভয় পক্ষ হইতে একটি করিয়া মধ্যস্থ নির্বাচিত হউক, তাঁহাদের মীমাংসাই উভয় দল মানিয়া লইবেন। আলী-পক্ষীয় সেনানায়কগণও ইহা সঙ্গত মনে করিরেন। তদনুসারে মু'আবিয়ার পক্ষ হইতে স্বয়ং আমর এবং আলীর পক্ষে মু'সা আল আ'শারী মধ্যস্থ নিয়োজিত হইলেন। আলীর ইচ্ছা ছিল, মালিক ওশতুরকে তাঁহার প্রতিনিধি নিযুক্ত করেন। কিন্তু মু'আবিয়া তাহাতে রাজী হইলেন না মালিক ওশতুরকে তিনি ওসমান হত্যার একজন প্রধান উদ্যোক্তা বলিয়া মনে করিতেন। পক্ষান্তরে মু'সা উদার প্রকৃতির লোক। কুফার শাসন কর্তা থাকা কালীন তাঁহার ঋজু স্বভাব ও প্রকৃতিগত দুর্বলতা মু'আবিয়ার চোখে ধরা পড়িয়াছিল। আলী নিজ সেনানায়কগণের এই প্রকার যুদ্ধের অনিচ্ছা দেখিয়া বিরক্ত হইয়া মধ্যস্থদের উপর সালিস ন্যস্ত রাখিয়া রণক্ষেত্র ত্যাগ করিলেন। এদিকে সন্ধি-বৈঠক বসিল। কিন্তু যুক্তিতর্কে মু'সা আমরের প্রবল ব্যক্তিত্বের সম্মুখে স্বমত প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিলেন না। আমরের প্রস্তাব মত সাব্যস্ত হইল, আলী ও মু'আবিয়া এই উভয় বিবদমান ব্যক্তিকেই খিলাফতের সংশ্রব হইতে দূরে রাখিতে হইবে এবং অপর কোনও তৃতীয় ব্যক্তিকে খলিফা করিতে হইবে, যাহাতে এই গৃহ-বিবাদের অবসান হয়।

পরামর্শ অন্তে মধ্যস্থদ্বয় সভায় প্রবেশ করিলে সভ্যগণ উৎকণ্ঠিত চিত্তে তাঁহাদের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিল। প্রথমে মু'সা দণ্ডায়মান হইয়া এক বক্তৃতা করিলেন এবং তাঁহাদের মীমাংসার সারমর্ম প্রকাশ করিয়া বলিলেন, আমি খলিফার প্রতিনিধি হিসাবে অদ্য হইতে তাঁহার খিলাফতের দাবী রদ

করিতেছি। এক্ষণে মু'আবিয়ার প্রতিনিধি তাঁহার সম্বন্ধে কথা বলিবেন। নির্বোধ মন্তব্য শুনিয়া মদীনা পক্ষ বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইল। মু'সা উপবেশন করিতেই আবার দণ্ডায়মান হইলেন এবং আলীর শাসনাধীনে মুসলিম জাহানের নানাপ্রকারে অশান্তির উল্লেখ করিয়া বলিলেন, হযতর আলীর প্রতিনিধি এই সভায় তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়াছেন। হযরত আলী ইরাকিগণ তাঁহাদের মনোনীত প্রতিনিধির উক্তি মানিতে বাধ্য। ফলে খিলাফতের আসন এখন শূন্য। অতএব এই সভার মধ্যস্থ হিসাবে আমি হযরত আলীর স্থলে মু'আবিয়াকে মুসলিম জাহানের খলিফা বলিয়া ঘোষণা করিতেছি। এই কথা বলা মাত্র সভায় বিষম হট্টগোলের সৃষ্টি হইল। মু'সা মহা ক্রুদ্ধ হইয়া চেঁচাইয়া কহিলেন, হে আমরু, তোমার সঙ্গে কি আমার এই প্রকার কথা হইয়াছিল? কিন্তু গণ্ডগোলে তাঁহার কণ্ঠস্বর তলাইয়া গেল। মদীনা পক্ষ রোষে ফোঁপাইতে লাগিল। দামেস্কীরা জয়ধ্বনি করিতে করিতে সভাস্থল ত্যাগ করিল। অতঃপর আলীপক্ষ কি করিবেন তাহা স্থির করিবার পূর্বেই মু'আবিয়া সসৈন্যে দামেস্কে প্রস্থান করিলেন। আলীর সৈন্যগণ তখন একান্ত ক্লান্ত ও ভগ্নোৎসাহ। অগত্যা তাহারাও বিষন্ন চিত্তে কুফায় প্রত্যাবর্তন করিল। (১)

ইহার পর কিছুদিন ধরিয়া এই ব্যাপার লইয়া গণ্ডগোল চলিল। সালিসের শূন্যগর্ভতা সকলেই অনুভব করিল। হযরত আলী পূর্ববৎ কুফার রাজত্ব করিতে লাগিলেন। কিন্তু মু'আবিয়া আর কিছুতেই হযরত আলীর বশ্যতা স্বীকার করিলেন না।

(1) Ali Had almost every virtue except those of the ruler: energy, decision and foresight. He was a gallant warrior, a wise counseller, a true friend, and generous foe but had no telent for the stern realities of statecraft and was out-matched by unscrupulous rivals who knew that, "war is a game of deceipt". When his attempt to remove the Umayyad Governors appointed by Uthman was resisted by a show of force by Muawiya the able Umyyad Governot of Syria. Ali weakly agreed to submit the matter to arbitration. This brough upon him in Iraq, a strategic centre of the Empire to which he had of remover his seat of Government from to remote Medina, the revolt of a group of Arab conservatives who insisted that Ali had no right to submit the caliphate to arbitration as it has been conferred upon him by thy Godguided Judgment of the whole body of the faithful. One of this group, the Khawarijis or Seceders, murdered Ali in 661 A. D. after the arbitrators had awarded the caliphate to Mu'awiya, no doubt, on the ground of his greater fitness to govern.—A Short History of the Middle East by G, E, Kirk, page 19.

হজরত আলীর শাহাদাৎ

পাছে সমগ্র উত্তরাঞ্চল হস্তচ্যুত হয়, এই আশঙ্কায় হযরত আলী পূর্বেই মদীনা হইতে রাজধানী কুফায় স্থানান্তরিত করিয়া ছিলেন। কিন্তু চক্রান্তকারীদের হস্ত হইতে তাঁহার নিজ জীবন নিস্তার পাইল না। সিফ্‌ফিন যুদ্ধের পর তিনি সন্ধিশর্ত না মানার অজুহাতে খারিজী দল বিদ্রোহী হইল। তাহাদের মতে মুসলমানে মুসলমানে যুদ্ধ ঘটানোর অপরাধে আলী ও মু'আবিয়া উভয়েই দায়ি এবং দুই-এর কাহারও খলিফা উচিত নয়। তাহারত উভয়কেই হত্যা করার ফতোয়া দিয়াছিল। ৬৫৯ খৃষ্টব্দে খারিজী দল একবার বিদ্রোহী হইয়াছিল। তখন হযরত আলী বাধ্য হইয়া তাহাদের বিরুদ্ধে অভিযান করেন এবং নাহ্‌রোয়ান নামক স্থানে তাহাদিগকে পরাজিত করেন। এবার যুদ্ধ ব্যপদেশে খলিফার অনুপস্থিতির সুযোগ পাইয়া কুফার লোকেরা খারিজীদলের প্ররোচনায় বিদ্রোহ করিল। খলিফাকে রীতিমত যুদ্ধ করিতে হইল বিদ্রোহীদের দমনের জন্য। বিদ্রোহ দমিত হইল, কিন্তু খারিজীদের ভিতর গোপনে তাঁহার হত্যার আয়োজন চলিতে লাগিল। অবশেষে এক অশুভ প্রভাতে খারিজীদের এক ধর্মোন্মাদ ব্যক্তি কুফার মসজিদে হযরত আলীকে ফজরের নমাজরত অবস্থায় গুপ্ত আঘাতে হত্যা করে (১৭ রমযান, ৪০ হিজরী, ৬৬১ খৃঃ)।

কুফার লোকেরা হযরত আলীকে মৃত্যুকালে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, আমরা কি আপনার পুত্র শাহযাদা হাসানের হস্তে বায়াৎ হইব? উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, সে সব তোমরা পরে মীমাংসা করিয়া লইও। এখন পার্থিব কোনও বিষয়ে আমার চিত্তকে আকর্ষণ করিও না। এইরূপ পৃথিবীর ভিতর একজন শ্রেষ্ঠ বীর, বিদ্বান ও নীতিবিদ্ পুণ্যাত্মার মহামূল্য জীবনের অবসান হইল বর্বরতার নির্মম আঘাতে। সেই সঙ্গে চিরতরে মুছিয়া গেল নবীর প্রিয়ভূমি মদীনার রাষ্ট্রীয় গৌরব। অপরদিকে, সতর্ক মু'আবিয়ার বেলায় খারিজীদল কিছুই করিতে পারিল না। উমাইয়াদের প্রভাব-প্রতিপত্তি অতঃপর ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

হাশিমীদের বংশ তালিকা
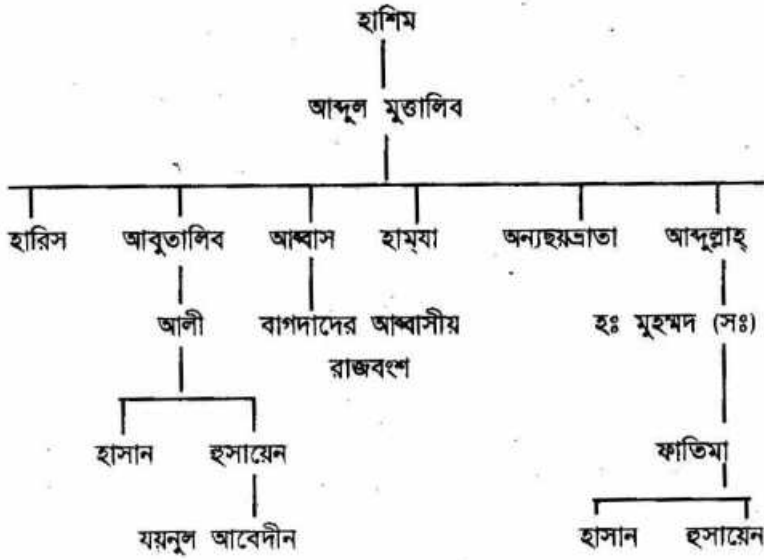
উমাইয়া বংশ তালিকা
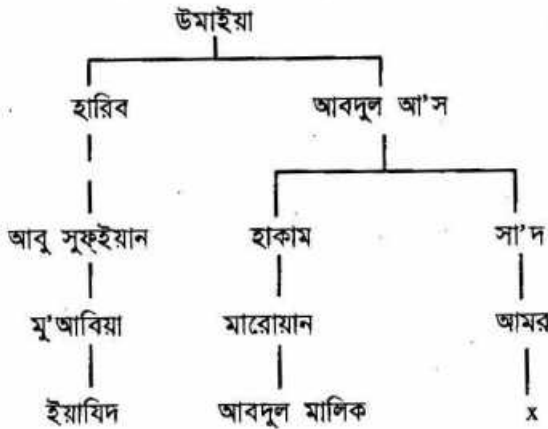
কারবালা ও ইমাম বংশের ইতিবৃত্তি

প্রথম অধ্যায়

ইমাম হাসানের সিংহাসন চ্যুতি

মুসলিম রাষ্ট্রের পঞ্চম খলিফা ইমাম হাসান কয়েক মাস মাত্র খিলাফতের অধিকারী ছিলেন। হযরত আলী যখন তাঁহার নূতন রাজধানী কুফায় নিহত হইলেন তখন তথাকার লোকেরা শাহযাদা হাসানকে সিংহাসনে বসাইল। চারিদিক হইতে দলে দলে লোক আসিয়া তাঁহার হস্তে বায়াৎ হইতে লাগিল। ইহাই ছিল স্বাভাবিক। কেননা তিনি ছিলেন জীবিতদের ভিতর নবীজীর সর্বজ্যেষ্ঠ বংশধর এবং আদর্শ মুসলমান। এই সময় তাঁহার বয়ক্রম ছিল ৩৬ বৎসর। (১) শিয়াগণের মতে হযরত আলীই ছিলেন নবীজীর যথার্থ উত্তরাধিকারী। সে দিক দিয়াও তাঁহার পুত্র হাসান ছিলেন খিলাফতের ন্যায্য দাবীদার। কুফায় শিয়াদের সংখ্যা ছিল অত্যাধিক। কাজেই শাহযাদা হাসানের পক্ষ সমর্থকের অভাব হইল না।

কিন্তু তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী দামেস্কের অধিপতি মু'আবিয়া তাঁহাকে স্বস্তিতে থাকিতে দিলেন না। হযরত আলীর মৃত্যু সংবাদ পাইবা মাত্র তিনি দামেস্ক হইতে নিজেকে সমগ্র মুসলিম জাহানের খলিফা বলিয়া ঘোষণা করিলেন এবং কুফা আক্রমণের জন্য আয়োজন করিলেন। ফলে রাজ্যাভিষেক হইতে না হইতে নূতন খলিফা হাসানকে অস্ত্রধারণ করিতে এবং যুদ্ধক্ষেত্রের জন্য প্রস্তুত হইতে হইল। মুসলিম রাষ্ট্রের সর্বত্র তখন ষড়যন্ত্র আর বিশৃঙ্খলা। সেই সুযোগে অপ্রস্তুত অবস্থায় তাঁহাকে বিব্রত করাই ছিল সুচতুর মু'আবিয়ার উদ্দেশ্য। তিনি অকস্মাৎ ইরাক অভিমুখে অভিযান করিলেন।

---

(১) ইমাম হাসানের জন্ম ৬২৫ খৃষ্টাব্দে (১৫ রমযান ৩য় হিঃ) এবং মৃত্যু ৬৬৯ খৃষ্টাব্দে।

হাসান এই সংবাদে কালবিলম্ব না করিয়া কায়েস নামক একজন প্রখ্যাত সেনাপতিকে একদল সৈন্যসহ তাঁহার গতিরোধ করিতে পাঠাইলেন এবং নিজে এক বৃহৎ বাহিনী গঠন করিতে ব্যাপৃত হইলেন। কিন্তু সৈন্য চালনার ভার যে সকল সেনাপতিকে অর্পণ করিবেন তাহাদের বিশ্বস্ততা সম্বন্ধে তাঁহার সম্যক্ জ্ঞান ছিল না। অথচ বাছাই করিবার সময়ও তখন ছিল না। যাহাদিগকে উপস্থিত পাইলেন তাহাদিগের উপর নির্ভর করিয়াই তিনি স্বয়ং যুদ্ধযাত্রা করিলেন এবং সসৈন্য ইরাকের পশ্চিম অঞ্চলে মুদাইন নামক প্রান্তরে উপনীত হইলেন।

ওদিকে প্রাবীণ রাজনীতিক মু'আবিয়ার কুট কৌশলের অন্ত ছিল না। কুফীদের বিশ্বাসঘাতকতারও সময় অসময় ছিল না। মুদাইন প্রান্তরে মু'আবিয়ার সহিত হাসানের সংঘর্ষ বাধিবার পূর্বেই কুফায় এক মিথ্যা সংবাদ রটিত হইল যে, সেনাপতি কায়েস পরাস্ত ও নিহত হইয়াছেন। এই সংবাদ প্রচারিত হইবা মাত্র কুফী সৈন্যদলে বিদ্রোহ ও বিশৃঙ্খলা দেখা দিল। তাহারা তাহাদের নিজ খলিফা ইমাম হাসানের তাঁবু লুণ্ঠন করিল। এমন কি, তাঁহাকে ধৃত ও বন্দী করিয়া শত্রুহস্তে তুলিয়া দিবারও আয়োজন করিল। সদ্য রাজ্যভার প্রাপ্ত খলিফা নিজেকে নিতান্ত বিব্রত বোধ করিলেন। চতুস্পার্শে বিশ্বাস ঘাতকের দল। কাহাকে যে বিশ্বাস করিবেন এবং কে যে তাঁহার শত্রু নয়, ইহা তিনি বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না। রাজত্ব করা এক মহা অশান্তিকর উপদ্রব বলিয়া তাঁহার মনে হইল। তিনি বিরক্ত হইয়া কুফায় প্রত্যাবর্তন করিলেন। ইত্যবসরে মু'আবিয়ার নিকট হইতে তিনি সন্ধি প্রস্তাবের পত্র পাইলেন। অবস্থা সকল দিক দিয়া প্রতিকূল দেখিয়া তিনি মু'আবিয়ার সন্ধি প্রস্তাব মঞ্জুর করাই যুক্তিযুক্ত মনে করিলেন। ইহা ছাড়া, তাঁহার গত্যান্তর ছিল না। কারণ মদীনা বহু দূরে, সেখান হইতে কোনও সাহায্য আসার সম্ভাবনা ছিল না।

এত সহজে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে মু'আবিয়া তাহা ভাবিতে পারেন নাই। তিনি খুশী হইলেন এবং হাসানকে সসম্মানে পত্র লিখিলেন। যে

বংশের দিক দিয়া আপনিই খিলাফতের জন্য উপযুক্ত ব্যক্তি; কিন্তু আপনার যদি এই বিশৃঙ্খল রাজ্যকে শাসনে রাখবার মত দৃঢ়তা থাকিত তাহা হইলে আমি নিরাপত্তিতে আপনার হস্তে বায়াৎ হইতাম। আপনার পরলোকগত পিতাও এই রাজ্য শাসনে রাখিতে পারেন নাই। এক্ষণে আপনি খিলাফতের দাবী পরিত্যাগ করুন। উহা ছাড়া আর যাহা চাহিবেন তাহাই পাইবেন। শান্তিকামী ও ধর্মানুশীলনরত হাসান আর দ্বিরুক্তি করিলেন না। পণ্ডিতজন-সুলভ ঔদার্যের সহিত তিনি সিংহাসনের দাবী ছাড়িয়া দিলেন এবং মু'আবিয়াকে খলিফা বলিয়া স্বীকার করিতে রাজী হইলেন এই শর্তে যে, মু'আবিয়া জীবিতকাল পর্যন্ত খলিফা থাকিবেন; তাঁহার মৃত্যুর পর হুসায়েন খলিফা নির্বাচিত হইবেন। মু'আবিয়া ইহাতে স্বীকৃত হইয়া গতিচ্যুত বাদশা হিসাবে হাসানকে উপযুক্ত মোশাহেরা দিতে স্বীকার করিলেন এবং খোরাসানের একটি উৎকৃষ্ট জেলার সমুদয় রাজস্ব তাঁহার জন্য বরাদ্দ করিবেন, এইরূপ আশা দিলেন।

অতঃপর প্রতিদ্বন্দ্বীহীন মু'আবিয়া মুসলিম জাহানের একচ্ছত্র খলিফা হইলেন। মু'আবিয়ার মতলব ছিল, যে-কোনও অঙ্গীকারে হাসানকে গদীচ্যুত করা। কারণ তাঁহার স্থির বিশ্বাস ছিল যে হাশিমী-বংশ হইতে তোনও প্রকারে একবার ক্ষমতা ছিনাইয়া লইতে পারিলে তাঁহারা আর কিছুতেই তাঁহার সহিত আঁটিয়া উঠিতে পারিবেন না। কাজেই হুসাইনের ভবিষ্যৎ আশা মরীচিকাতেই পর্যবসিত হইবে। হুসাইন ছিলেন তেজস্বী বীর পুরুষ। এই প্রকার সন্ধি প্রস্তাবে তিনি সম্মত ছিলেন না। কিন্তু কি করিবেন, ভ্রাতার সহিত বিরোধিতা তিনি কিছুতেই করিতে পারেন না, তাই নীরব রহিলেন।

খিলাফতের দাবি বিসর্জন দিয়া আলী পরিবার কুফা হইতে মদীনায় চলিয়া গেল। সেখানকার লোকেরা হাসানকে খলিফা রূপে পাইতে চাহিয়াছিল। কিন্তু তাহাদের সে বাসনা পূর্ণ হইল না। অগত্যা তাহারা ধর্মের দিক দিয়া তাঁহাকে রসূলুল্লা'র প্রতিনিধি অর্থাৎ 'ইমাম' হিসাবে গ্রহণ করিল। মুসলিম রাষ্ট্রে খলিফা হইতেছেন জাতির সর্বময় নেতা। সীয়াসৎ

(শাসন) ও শরীয়ৎ উভয় ক্ষেত্রেই তাঁহার কর্তৃত্ব। ইমাম তবে কিসের নেতৃত্ব করিবেন? স্থির হইল, তিনি হইবেন মুসলমানদের আধ্যাতিক জগতের গুরু বা পথ প্রদর্শক। মানুষের মনোজগৎ একটি পৃথক এলাকা। যেহেতু, হযরত রসুলের পর দুনিয়ায় নবী আর পয়দা হইবেন না, তাই ইমামের পদ সৃষ্টি হইল, নবীর স্থলে তাঁহার প্রতিনিধিত্ব করার জন্য।

হযরত আলী নিজে, এবং নবী-দৌহিত্র হিসাবে তাঁহার ঔরসজাত সন্তানগণ যে মুসলিম জগতের অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা লুটিতেছিলেন, ইহা মু'আবিয়ার মনকে পীড়া দিত। তিনি হযরত আলীর উপর হইতে মুসলমানদের ভক্তি-শ্রদ্ধা হ্রাস করার জন্য ওসমান-হত্যার পর হইতেই প্রকাশ্যে তাঁহার বিরুদ্ধে প্রচারণা শুরু করেন। মিসরীয়দের বিদ্রোহ ও খলিফা ওসমানের হত্যার জন্য তিনি হযরত আলীকেই দোষারোপ করিতেন। হযরত আলীর পিতৃকুল হাশিমী বংশের সন্তানদিগকেও তিনি রাজকীয় সর্ববিধ সুযোগ-সুবিধা হইতে বঞ্চিত করেন। হযরত আলীর প্রতি মু'আবিয়া এমনই বিদ্দিষ্ট ছিলেন যে, হযরত আলী খলিফা হওয়ার পর হইতেই মু'আবিয়া দামেস্কের জামে মসজিদে খোৎবা পাঠের সময় খোৎবার ভিতরই তাঁহার কুৎসা জুড়িয়া দিতেন। প্রকাশ্য সভায় তিনি হযরত ওসমানের ছিন্ন অঙ্গুলী ও রক্তমাখা কোর্তা দেখাইয়া বলিতেন, আলী যদি এই হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত না থাকিতেন তবে তিনি খলিফা হইয়াই ইহার বিচার করিতেন। এইভাবে তিনি সারা সিরিয়া দেশে হযরত আলীর বিরুদ্ধে জনমত খেপাইয়া তুলেন। ইহার ফলে সিরিয়াবাসিগণ উমাইয়া বংশের রাজত্বের শেষদিন পর্যন্ত তাঁহাদের সমর্থন যোগাইয়াছে এবং আলীবংশেও তথা হাশিমীদের বিরোধীতা করিয়াছে।

অশান্ত আরব-জাতির জন্য খেলাফায়ে রাশেদীনের পর মু'আবিয়ার ন্যায় কঠোর হৃদয় উমাইয়া শাসকই যে উপযুক্ত খলিফা ছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। মু'আবিয়া কখনও কৌশলে, কখনও অস্ত্রবলে বিরুদ্ধ পক্ষকে শায়েস্তা করিতেন। বিষপ্রয়োগ বা গুপ্তঘাতক দ্বারা শত্রুনিধন তাঁহার বিবেকে বাধিত না। এমন কি, তাঁহার কোনও বন্ধুজনও যদি অত্যাধিক

জনপ্রিয় হইয়া উঠিত তবে কোন্ গোপন মুহূর্তে যে মু'আবিয়ার বধ্য-তালিকায় তাহার নাম উঠিত সে ব্যক্তি তাহা জানিতেও পারিত না। সিরিয়া বিজয়ী মহাবীর খালেদের বীরপুত্র আবদুর রহমান সিরিয়াবাসীদের অত্যন্ত প্রিয় ছিল। মু'আবিয়া তাঁহাকে বিষপ্রয়োগে দুনিয়া হইতে অপসারিত করেন। হযরত আলীর দক্ষিণহস্ত স্বরূপ প্রসিদ্ধ বীর মালিক ওশতুরও গোপনে নিহত হইয়াছিলেন। অতঃপর মু'আবিয়া হাসানকে তাহার পথের কন্টক মনে করিতে লাগিলেন। তিনি জানিতেন, নবীন দৌহিত্র হিসাবে হাসানের সম্বন্ধে মুসলমানদের একটা গভীর মমত্ববোধ ও দুর্বলতা আছে এবং তিনি কখনও সশস্ত্র উত্থান মনস্থ করিলে তাঁহার সমর্থকের অভাব হইবে না। তাই শেষ পর্যন্ত হাসানকেও তিনি দুনিয়ার পৃষ্ঠ হইতে মুছিয়া ফেলিতে এবং এইভাবে উমাইয়া বংশকে নিষ্কন্টক করিতে মনস্থ করেন।

খিলাফৎ চিরস্থায়ীভাবে তাঁহার বংশধরদের অঙ্কশায়ী হউক ইহাই ছিল মু'আবিয়ার জীবনের স্বপ্ন। তাঁহার এ সাধ কি পূর্ণ হইবে না, এই চিন্তা অহর্নিশ তাঁহার চিত্তকে উদ্বেল রাখিত। তাঁহার পুত্র ইয়াযিদ ছিল উচ্ছৃঙ্খল, মৃগয়াবিলাসী ও গীতবাদ্যাসক্ত। তিনি কবিতা চর্চা করিতেন। মদ ও নারী ছিল তাঁহার প্রিয় বস্তু। শাসন কার্যের গুরু দায়িত্ব তাঁহার ভাল লাগিত না। মু'আবিয়া তাঁহাকে কষ্টসহিষ্ণু যুদ্ধ ক্ষম করার জন্য রাজধানী হইতে দূরে উত্তর সিরিয়ার মরুঅঞ্চলে কোনও এক পল্লীপ্রাসাদে তাঁহার বাস ও শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু অনেক চেষ্টা করিয়াও তাহাকে রাজকার্যের উপযুক্ত করিয়া গড়িয়া তুলিতে পারিলেন না। সেখানে মুক্ত প্রকৃতির কোলে লালিত হইয়া ইয়াজিদ একজন ভাল কবি, উৎকৃষ্ট শিকারী ও শ্রেষ্ঠ অশ্চচালক বলিয়া খ্যাতি লাভ করিলেন, কিন্তু রাজনীতি বা ধর্মীয় শিক্ষার ধার দিয়াও গেলেন না।

এইভাবে মু'আবিয়ার রাজত্বের আট নয় বৎসর কাটিয়া গেল। তিনি বার্ধক্যে উপনীত হইলেন। কিন্তু পুত্রের ভবিষ্যৎ এবং সেই সঙ্গে খিলাফতের মায়া তাহাকে অতিশয় বিব্রত করিয়া তুলিল। তাঁহার মৃতুর পর ইয়াযিদ যে খিলাফতের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় হাসানের পাশে দাঁড়াইতে পারিবে না

ইহা তাঁহার বুঝিতে বাকী রহিল না। পুত্রকে যখন মুসলিম জাহানের খিলাফতের উপযুক্ত করিয়া গড়িয়া তোলা কিছুতেই সম্ভবপর হইল না, তখন অগত্যা তিনি পুত্রের প্রতিদ্বন্দ্বীকেই কৌশলে অপসারিত করা অপরিহার্য মনে করিলেন। সুযোগ্য মন্ত্রী মারোয়ানের সহিত পরামর্শ হইল। মারোয়ানও এ কাজে খলিফার সর্বপ্রকার সহায়তা করিতে প্রতিশ্রুতি দিলেন।

ইমাম হাসানকে বিষ প্রয়োগ

আমীর মু'আবিয়া ও মন্ত্রী মারোয়ানের যোগাযোগ ছিল যেন সোনায় সোহাগ। তাঁহারা কখন্ যে কোন্দিকে তাঁহাদের শাণিত বুদ্ধি চালিত করিবেন কাহারও তাহা বুঝিবার সাধ্য ছিল না। মদীনায় ধর্মপ্রাণ ইমাম হাসান পরম শান্তিতে দিন কাটাইতে ছিলেন। রাজনীতির সহিত তাঁহার কোনও সংশ্রব ছিল না। উপাসনা, গ্রন্থ-পাঠ ও ধর্মকথার আলোচনায় তাঁহার দিন কাটিত। নানা দিগ্‌দেশ হইতে লোকেরা আসিত তাঁহার মধুর সংসর্গ উপভোগ করিতে এবং ধর্মকথা শুনিতে। কিন্তু ইহার ভিতর তাঁহার গৃহের শান্তি বিনষ্ট করিতে এক কালনাগিনী তথায় প্রবেশ করিল। মদীনার উপকণ্ঠে বাস করিত এক কুটিল রমণী। লোকে তাহাকে মায়মুনা "কুট্‌নী" বলিত। তাহার এ নাম সার্থক হইয়াছিল। অকস্মাৎ হাসানের গৃহে এই পাপিষ্ঠা নারীর যাতায়াত শুরু হইল।

ইমামের পত্নীদের ভিতর প্রথমা হাসনাবানু ছিলেন যেমন বুদ্ধিমতী, তেমনী ধার্মিক ও পতিপরায়ণা। তিনি ছিলেন গৃহের সর্বময়ী কর্ত্রী। দ্বিতীয়া স্ত্রীও স্বামীর প্রতি বিশ্বস্তা ছিলেন এবং সকল বিষয়ে হাস্‌নাবানুর সহিত পরামর্শ করিয়া চলিতেন। ইঁহারা উভয়েই গম্ভীর প্রকৃতি ও স্বল্পভাসিণী ছিলেন। মায়মুনা ইঁহাদের সহিত আলাপ করিয়া সুবিধা পাইল না। এই দুইটি রাশ-ভারী রমণীর সহিত তাঁহার গল্পের আসার মোটেই জমিত না। ইমামের কনিষ্ঠা পত্নী যায়েদা অল্পবয়স্কা ছিলেন ও সেইহেতু কিঞ্চিৎ প্রগল্‌ভা। এ বয়সে নারীদের দুনিয়ার ভোগবিলাসের দিকে কিঞ্চিৎ আকর্ষণ থাকা অস্বাভাবিক নয়। বয়ঃকনিষ্ঠা হিসাবে যায়েদা স্বামীর আদরিণী হইলেও যেহেতু স্বামী বেশীর ভাগ সময় ধর্মচর্চায় কাটাইতেন এবং অন্য

বেগমদেরও তাহাকে মন রাখিতে হইত, সেজন্য যায়েদার চিত্তে হয়ত কিছুটা অতৃপ্তি থাকাও অসম্ভব ছিল না। অবকাশ সময়ে কেহ তাঁহার সহিত গল্প জুড়িলে তিনি বেশ আনন্দ বোধ করিতেন এবং প্রাণ খুলিয়া তাহার সহিত আলাপ করিতেন। মায়মুনা বুঝিল, তাহার কার্যোদ্ধারের পক্ষে যায়েদাই উপযুক্ত পাত্রী। সে ঘন ঘন যাতায়াত করিয়া যায়েদার সহিত ভাব করিবার চেষ্টা করিল। মারোয়ানের প্রেরিত গুপ্তচরের আশ্বাসবাণী অনুযায়ী সে যায়েদার উপর প্রলোভনের নানা ফাঁদ বিস্তার করিতে থাকে। হাসানের ঐশ্বর্য্য নাই, ইয়াযিদ কত ধনৈশ্বর্যের মালিক– যে রাজপুত্র; তাহার সহিত বিবাহ হইলে যায়েদা কত সুখী হইবে; ইত্যাদি নানা কথা নানাছাঁদে সে যায়েদার কানে দিত। ধন, রত্ন, বস্ত্রালঙ্কার ও দাস–দাসীর উপর কর্তৃত্ব কোন্ রমণী না চায়, ইহাই ছিল মায়মুনার ধারণা। যায়েদার রূপ ছিল, যৌবন ছিল। অল্পবুদ্ধি নারী ময়মুনার কথা তন্ময় হইয়া শুনিত। কিছুদিন এইভাবে চলিল; যায়োদার ঘরে মায়মুনার যাতায়াত অবারিত ছিল। তাহার কোনও সময়–অসময়ও ছিল না। সে ইমামের পানাহার, নিদ্রা ও অন্যান্য দৈনন্দিন অভ্যাস সম্বন্ধে সমস্ত খবরই যায়েদার নিকট জানিয়া লইল।

অবশেষে সেই কালরাত্রি আসিল। সে রাত্রিতেও ইমাম পূর্ব অভ্যাসমত রজনীর শেষ–নামাজ সমাপ্ত করিয়া যায়েদার গৃহে সমাগত হইলেন। যায়েদা প্রতীক্ষায় ছিলেন। অন্যদিনের মতই তিনি স্বামীর সংবর্ধনা করিলেন। রাত্রি তখন গভীর। উভয়ের ভিতর কিছুক্ষণ আলাপ আপ্যায়ন চলিল। দুইজনে একত্রে বসিয়া কিঞ্চিৎ ফলাহারও করিলেন। তারপর উভয়ে শয্যা গ্রহণ করিলেন। কর্মক্লান্ত ইমাম অচিরেই নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িলেন। পার্শ্বে যায়েদার নিদ্রা হইল কিনা একমাত্র আলিমউল গায়েব ছাড়া অন্য কেহ তাহা জানে না। মধ্যরাত্রিতে ইমাম জাগিয়া উঠিলেন এবং পিপাসা বোধ করিলেন। এরূপ প্রায়ই হইত। তিনি জাগিয়া উঠিয়া পার্শ্বের রক্ষিত সুরাহী হইতে পানি ঢালিয়া পান করিলেন। প্রিয় পত্নীর নিদ্রাভঙ্গ করিলেন না। পানান্তে আবার শুইয়া পড়িলেন। রাত্রির পিপাসা নিবৃত্তির জন্য এইভাবে পানি রাখিবার ব্যবস্থা তাঁহার ঘরে বরাবরই থাকিত।

পানি পানের অল্পক্ষণ পরেই ইমামের দেহে প্রবল বিষক্রিয়া দেখা

দিল। পানিতেই যে বিষ ছিল তাহা বুঝা কষ্টকর ছিল না। কিন্তু উদারমতি ইমাম স্ত্রীকে কিছুই বলিলেন না। তাঁহার যন্ত্রণার শব্দে যায়েদা জাগিয়া উঠিলেন। যায়েদার ভাব দেখিয়া মনে হইল যেন তিনি কিছু জানেন না। সুরাহীর পানি পরীক্ষার জন্য তিনি উহা পান করিতে উদ্যত হইলেন, কিন্তু হাসান সে পানি ঢালিয়া ফেলিলেন। তারপর তিনি যায়েদাকে দিয়া পত্নী হাস্‌নুবানু ও পুত্র কাসেমকে ডাকাইলেন। কাসেম আসিয়া চাচা হুসায়েনকে ডাকিয়া আনিল। ক্রমে আরও সকলে আসিয়া উপস্থিত হইল। হুসায়েন ক্রোধে অগ্নিবৎ হইয়া আততায়ীর সংবাদ লইবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু ধৈর্যের অবতার ইমাম তাঁহাকে বারণ করিলেন এবং বলিলেন উপযুক্ত প্রমাণ অভাবে কাহাকেও শাস্তি দিতে নাই। আমাদের ভ্রম হইতে পারে, গায়েবের মালিক আল্লাহ্ ইহার বিচার করিবেন। তোমরা ক্ষ্যান্ত হও। নিজের অন্তিম সময় আগত জানিয়া তিনি সকলের নিকট জ্ঞাত, অজ্ঞাত সকল অপরাধের জন্য মার্জনা চাহিলেন। তাঁহার আততায়ীর সন্ধান মিলিলে তাহাকে যেন আল্লা'র ওয়াস্তে মাফ করা হয়, এই অনুরোধও সকলকে করিলেন। ইমামের জ্যোতির্ময় স্বর্ণকান্তি যন্ত্রণায় ম্লান হইয়া নীলবর্ণ ধারণ করিল। মহাবিষ হীরক চূর্ণ তাঁহার শরীরে প্রবেশ করিয়াছিল। উজ্জ্বল আয়ত চক্ষু ক্রমে নির্মীলিত হইয়া আসিল। বিপদভঞ্জন আল্লা'র নাম উচ্চারণ করিতে করিতে মহানুভব ইমাম ইহলোক হইতে বিদায় লইলেন। তাঁহার বয়ঃক্রম তখন ৪৫ বৎসর হইয়াছিল। রজনী প্রভাত হইতে না হইতে তাঁহার মৃত্যুসংবাদ শহরময় ছড়াইয়া পড়িল। সারা মদীনা ব্যাপীয়া শোকের মাতম গুমরিয়া উঠিল (৬৬৯) খৃঃ)।

ইমামের শেষ আকাঙ্খা ছিল তাঁর প্রিয় মাতামহ রসূলুল্লা'র কবরের পাশে যেন তাঁহাকে দাফন করা হয়। রওযার তত্ত্বাবধায়িকা বিবি আ'য়িশারও ইহাতে অমত ছিল না। কিন্তু মারোয়ানের প্রতিবন্ধকতায় তাহা হইতে পারিল না। হাশেমীদের সাধারণ কবরস্থান "জান্নাতুল বাকীয়া"য় ইমামের দেহ সমাহিত করা হইল।

যথা সময়ে মু'আবিয়া এ সংবাদ অবগত হইলেন। ইমামকে বিষ প্রয়োগে কৃতকার্যতার দরুণ মায়মুনা পুরস্কৃত হইল। কিন্তু তাহার সহকারিণী

বলিয়া কথিত যায়েদাকে কেহ লইতে আসিল না। তাঁহার খোঁজও কেহ করিল না। সকলের সন্দেহ-ভাগিনী হইয়া অভাগিনী নারী অভিমানে গৃহত্যাগ করিলেন। কে জানিত তাঁহার অপরাধ কতখানি। তাঁহার নিজ মুখের ভাষণ দুনিয়ার কেহ জানিল না। ইতিহাসের নির্যাতিতা এই হতভাগিনী রমণী দুনিয়ার কাহারও সহানুভূতি পায় নাই। তাঁহাকে বাঁচাইয়া গিয়াছেন শুধু তাঁহার মহৎ অন্তঃকরণ স্বামী। ইমামের অন্তিম অনুরোধ স্মরণ করিয়া তাঁহাকে কেহ কিছু বলিল না। কেহ তাঁহার গন্তব্য স্থানেরও সন্ধান লইল না। তিনি নিরুদ্দেশ হইলেন, কেননা মদীনার বুকে তাঁহার মুখ লুকাইবার স্থান ছিল না।

যায়েদা যে তাঁহার স্বামীকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করিয়াছেন একমাত্র মায়মুনা কুটনীর যবানবন্দী ছাড়া দুনিয়ায় তাহার কোনও প্রমাণ নাই। মায়মুনা খল, সে মিথ্যার বেসাতি করিত। তাহার সেই যবানবন্দীও আসিয়াছে উমাইয়া শিবির হইতে। উমাইয়া পক্ষ নিজেরা এই হত্যায় জড়িত, কাজেই তাহারা যে ইমামের কোনও পত্নীর ঘাড়ে দোষ চাপইয়া এই জঘন্য হত্যাকাণ্ডকে একটা মামুলি পারিবারিক ঘটনামাত্র বলিয়া প্রচার করিবে, ইহা স্বাভাবিক। যয়নাব নামে যায়েদার কোনও সপত্নী ছিল কোনও ইতিহাস একথা বলে না। আব্দুল জব্বার নামক কাহারও জয়নাব নাম্নী কোনও স্ত্রীকে বিবাহ করার জন্য ইয়াযিদ উন্মত্ত হইয়াছিলেন। এবং ইমাম হাসান ঐরূপ কোনও রমণীকে বিবাহ করিয়া ছিলেন, এ সব কাহিনী একান্তই কাল্পনিক। যায়েদার পর অন্য কোনও নূতন পত্নীকে ইমাম গৃহে আনিয়াছিলেন বলিয়াও জানা যায় না। এরূপ ক্ষেত্রে যায়েদা কাহার উপর হিংসায় স্বামী হত্যা করিবেন? যায়েদা ছিলেন ইমাম পরিবারের কুলবধু! সে পরিবারের শিক্ষা ও পরিবেশ ছিল উচ্চস্তরের। সে ক্ষেত্রে যায়েদা পরের প্ররোচনায় স্বহস্তে স্বামী হত্যা করিবেন, ইহা একান্তই অস্বাভাবিক মনে হয়। লোক চক্ষুর অগোচরে পানির সুরাহীর ভিতর কে বিষ ফেলিয়াছিল, মায়মুনা কি যায়েদা, কিম্বা কোনও উৎকোচ বশীভূতা দাসী, এ তথ্যও আজ পর্যন্ত রহস্যাবৃত রহিয়া গিয়াছে।

ইমাম হাসানের পৌরুষ ও যোগ্যতা সম্বন্ধে বিরূপ সমালোচনা করিতে গিয়া কোনও কোনও ঐতিহাসিক তাঁহাকে হেরেম বিলাসী ও স্ত্রৈণ বলিয়াছেন। (১) পরাজিত পক্ষকে সকল যুগেই এরূপ গ্লানি বহন করিতে হইয়াছে, ইহা ইতিহাসের সাক্ষ্য। অনেকের মতে মহাবীর আলীর পুত্রদের পক্ষে বিনাযুদ্ধে মু'আবিয়ার সহিত সন্ধিস্থাপন ও সিংহাসনের দাবীত্যাগ বীরোচিত হয় নাই। কিন্তু এ অভিযোগ কতখানি ন্যায্য তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। জনপ্রিয় ইমামকে সিংহাসনচ্যুত করার পর শত্রুপক্ষ যে তাঁহাকে হেয় প্রতিপন্ন করিতে ও জনসাধারণের সহানুভূতি হইতে বঞ্চিত করিতে চেষ্টা করিবে, ইহা স্বাভাবিক এবং সে উদ্দেশ্যে তাহাদের যে কোনও রকম মিথ্যা প্রচারণার আশ্রয় লওয়া বিচিত্র নহে। রাজনৈতিক কূটকৌশলের ইহাও একটি প্রকৃষ্ঠ অঙ্গ। কাজেই যে সকল দলিল পত্র উপরোক্ত মন্তব্যের ভিত্তি সেগুলি নির্বিচারে সত্য বলিয়া ধরিয়া লওয়া সুকঠিন। কুফায় হাসান যে নিতান্ত অসহায় অবস্থায় নিপতিত হইয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। সুদূর বিদেশে অবস্থান হেতু মদীনার শক্তিশালী বীরবৃন্দের সাহায্য তাঁহার পক্ষে সহজলভ্য ছিল না। ঐ সকল হিতৈষী ব্যক্তির সাহায্য হইতে বঞ্চিত না হইলে সন্মুখ যুদ্ধে শক্তিপরীক্ষা হয়ত হাসানের পক্ষে সম্ভবপর হইত। কুফার লোকেরা যখন তাঁহার সহিত অপ্রত্যাশিতভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করে তখন অসহায় হাসানের পক্ষে মু'আবিয়ার প্রাস্তাব মানিয়া লওয়া ভিন্ন অন্য কোনও পথই খোলা ছিল না। সেই অপ্রস্তুত অবস্থায় যুদ্ধে নামার অর্থ হইত সাক্ষাৎ মৃত্যু বরণ। তাহাতে ইসলামের বা রাষ্ট্রের কাহারও কোনও উপকার সাধিত হইত না। বিশেষতঃ মু'আবিয়া এক কালে নবীর একজন সাহাবী ছিলেন। বলিয়া বাহ্যতঃ ইসলামী কানুন ও শরীয়ত অনুযায়ী রাজ্য শাসন করিতেন বলিয়া মু'আবিয়ার বিরুদ্ধে সহসা জনমত গঠন করাও হাসানের পক্ষে সহজ সাধ্য ছিল না।

---

(1) His talents lay in field other than administration, namely in boudoir Though he died at the age of 45, he succeeded in making & unmaking one hundred marriages and in winning for himself a highly individual title—"the great divorcer". —The Arabs, by P. K. Hitti—p. 59.

তাহা ছাড়া, ইসলামী আইনে রাজ্য বা সিংহাসন কাহারও উপর উত্তরাধিকার সূত্রে অর্পে না। যোগ্যতার দিক দিয়া হাসান অবশ্য পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন এবং পিতার গুণরাশি অনেক খানি আয়ত্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু শাসন ক্ষমতা ভিন্ন জিনিস। শহীদ খলিফার পুত্র বলিয়াই তিনি সিংহাসনে উত্তরাধিকারী হইবেন এরূপ মত মুসলিম আইনবিদগণ সমর্থন করিতেন কিনা সন্দেহ। সে অবস্থায় যুদ্ধে লিপ্ত হইয়া অনর্থক লোকক্ষয় না করিয়া তিনি বুদ্ধিমানের কাজই করিয়া ছিলেন। দেখা যাইতেছে নবীর আশীর্বাদপূত মদীনার পক্ষপুট ত্যাগ করিয়া কূফায় রাজধানী স্থানান্তরের প্রায়শ্চিত্ত শুধু একা হযরত আলীকে করিতে হয় নাই, তাঁহার বংশধরদিগকেও করিতে হইয়াছিল।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইমাম হুসায়েন

(৬২৬-৬৮০ খ্রীঃ)

মুসলিম সাম্রাজ্যের শাসনকেন্দ্র যখন মদীনা হইতে স্থানান্তরিত হয় তখন হইতেই মদীনাবাসীদের রাষ্ট্রীয় গৌরব বিনষ্ট হইতে থাকে। যাহারা নবীর সাহাবী অথবা সহকর্মী ছিলেন, যাহাদের ধন-সম্পদ শক্তি ও জীবনের বিনিময়ে নবীন মুসলিম রাষ্ট্র গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাঁহারা প্রায় সকলেই এখন জীবনের পরপারে। তাঁহাদের সন্তান-সন্ততিটা উমাইয়াদের চক্রান্তের এখন রাজকার্য ও সামরিক পদাধিকার হইতে সর্বপ্রকারে বঞ্চিত। উমাইয়া খলিফা মু'আবিয়া দামেস্কে বসিয়া রাজত্ব করিতেন। তাঁহার পূর্বপুরুষদের আমল হইতেই দামেস্ক শহর উমাইয়াদের আশ্রয়স্থল হইয়াছিল। হাশিমী বংশীদের পক্ষে উহা ছিল একরূপ নিষিদ্ধ এলাকা। কোথায় আজ মদীনার গৌরব আবুবকর, ওমর, আব্বাস এবং যুবায়ের প্রভৃতি রাষ্ট্রনির্মাতাগণ, কোথায় বা আবু ওবায়দা, সা'দ, খালেদ ও দেরার প্রমুখ ইতিহাস প্রসিদ্ধ বীরবৃন্দ! হাশিমীদের মতই তাঁহাদেরও সন্তানদিগকে এখন শাসন ক্ষমতা তো দুরের কথা যুদ্ধকার্যে পর্যন্ত অংশ গ্রহণ করিতে দেওয়া হয় না। ইহাঁরা সকলেই নিতান্ত সাধারণ নাগরিকের পর্যায়ে নামিয়া গিয়াছেন। সকল দায়িত্বপূর্ণ চাকুরী ও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা এখন উমাইয়া বংশীদের কুক্ষিগত। তাই মদীনা নগরীর জ্যোতি এখন স্তিমিত, উহার জীবন প্রবাহও ক্রমে মন্থর হইয়া আসিয়াছে। ফলে ঐতিহ্যবান হাশিমীগণ এবং মদীনার অন্যান্য সম্ভ্রান্ত নাগরিকগণ এখন বিশেষ কোনও কাজ না

থাকায় শুধু ধর্মচর্চা ও কিতাব-কুরআনে তাঁহাদের সর্বশক্তি নিবদ্ধ রাখিয়াছেন। এই ক্ষমতা বঞ্চিত সম্ভ্রান্ত সম্প্রদায়ের সকলের পুরোভাগে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন নবীদৌহিত্র ইমাম হুসায়েন। নবী বংশের সর্বজ্যেষ্ঠা মুখপাত্র, মুসলিম জাহানের সর্বজন প্রিয় আদর্শ এবং শিয়াদের সর্বপ্রধান ধর্মগুরু অর্থাৎ 'ইমাম' হিসাবে সকল লোক তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিত। তিনিও কি বিদ্যাবত্তা, কি বুদ্ধিমত্তা, কি জ্ঞানগৌরব, সর্বদিক দিয়া নিজ উচ্চাসনের মর্যাদা পূর্ণভাবে রক্ষা করিয়া চলিতেছেন।

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হাসানের মৃত্যুর পর মু' আবিয়া-রাজত্বের আট নয় ব ৎসর অতীতের গর্ভে বিলীন হয়ে গেল। মুসলিম জাহানের চর্তুদিকে অন্যায়, অবিচার ও অত্যাচার মানুষকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছে। কিন্তু প্রতিকারের শক্তি কাহারও নাই। মু'আবিয়া বাহ্যতঃ শরীয়তের নামে রাজ্য শাসন করিতেন। কিন্তু তাঁহার মূল লক্ষ্য ছিল, তাঁহারা অসদুপায়ে অর্জিত রাজমুকুট যাহাতে তাঁহার বংশে চিরস্থায়ী হয় সেইদিকে চেষ্টা করা। তিনি তাঁহার পক্ষ সমর্থকদিগকে প্রশ্রয় দিতেন অতিরিক্ত এবং এই সকল লোকের দ্বারা অনুষ্ঠিত যুলুম ও পক্ষপাতিত্বের তিনি প্রতিকার করিতেন না মোটেই। ফলে রাজ্যময় ক্ষোভ ও নৈরাশ্যের একটা বেদনাকর পরিস্থিতি বিরাজ করিতেছিল।

মুসলিম জনসাধারণের এই দুঃখজনক পরিস্থিতি সহৃদয় হুসায়েনকে পীড়া দিত। কিন্তু ইহার প্রতিকারের শক্তি ও সুযোগ তাঁহার ছিল না। সাত বৎসর বয়সে হুসায়েন স্নেহময়ী জননীর করুণা হইতে বঞ্চিত হন। মহাবাহু পিতা এখন পরলোকে। সহযোগী জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাও তাঁহাকে একাকী ফেলিয়া জান্নাতবাসী হইয়াছেন। দুঃসময়ে তিনি এখন কাহার পাশে গিয়া দাঁড়াইবেন? মুসলিম সাম্রাজ্য এখন আর শুধু হিজায ও সিরিয়ায় সীমাবদ্ধ নহে। সুদূর ইরান হইতে মিশরের পশ্চিম সীমা পর্যন্ত উহার এলাকা এখন বিস্তৃত। এই বিশাল সাম্রাজ্যের সৈন্যবল, ধনবল সবকিছুই এখন মু'আবিয়ার হস্তে। ইহার সর্বত্র উমাইয়া বংশীয় অথবা উমাইয়াদের

অনুগ্রহ-পুষ্ট শাসকেরা শাসনতন্ত্র চালাইতেছে। তাহাদের সতর্ক দৃষ্টির অন্তরালে বিদ্রোহ সৃষ্টির সাধ্য কাহারও ছিল না। তাহা ছাড়া, জনমত এখন বিভক্ত। মু'আবিয়ার অনুসৃত শরীয়তী শাসন বাহ্যিক হইলেও অনেককে উহা বিভ্রান্ত করিয়া রাখিয়াছিল। তাহারা মনে করিত এক খলিফা গিয়াছে অন্য খালিফা আসিয়াছে, তাহাতে এমন কি আসে যায়? শাসনকার্য ইসলামী কানুন মোতাবেক চলিলেই হইল। কাজেই ইমাম হুসায়েন সকল দুঃখ-বেদনা বুকে চাপিয়া চুপ করিয়া থাকেন এবং মু'আবিয়ার সার্বভৌম প্রভুত্ব মানিয়া চলেন। কিন্তু এতদসত্ত্বেও মু'আবিয়ার শ্যেণদৃষ্টি সর্বদাই তাঁহার উপর নিবদ্ধ ছিল। তিনি খুঁজিতেন, হুসায়েন-চরিত্রে এমন কিছু পান কি না, যে অজুহাতে তিনি হুসায়েনকে নির্বাসিত বা প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিতে পারেন। তিনি সুযোগের প্রতিক্ষায় রহিলেন। তাঁহার বংশধরদের পথের প্রথম কন্টক হাসানকে ইহলোক হইতে সরাইয়া দেওয়া হইয়াছে। এখন অপর কন্টক হুসায়েন অবশিষ্ট। সুচতুর মু'আবিয়া নিশ্চিত বুঝিয়াছিলেন যে, তাঁহার পুত্রের বিরুদ্ধে যদি কখনও সশস্ত্র বিদ্রোহ উত্থাপিত হয়, উহা হুসায়েনকে কেন্দ্র করিয়াই হইবে। মুসলিম জনমত হুসায়েন বর্তমান থাকিতে অন্য কাহারও দ্বারা গঠিত বা চালিত হইতে পারে না।

মু'আবিয়ার দুর্ব্যবহার

ইমাম হাসানের মৃত্যুর পর মু'আবিয়া কয়েক বৎসর মদীনার ব্যাপার লইয়া বিশেষ কোনও উচ্চবাক্য করিলেন না। এদিকে ইয়াযিদকে মানুষ করিয়া তোলার সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইল। মু'আবিয়া তখন পুনরায় কুটিল পথ ধরিলেন। ওলিদ বিন মুগীরা ও মারোয়ানের পরামর্শক্রমে তিনি নিজের জীবদ্দশাতেই ইয়াযিদকে যুবরাজে প্রতিষ্ঠিত করিতে মনস্থ করিলেন, যাহাতে তাঁহার মৃত্যুর পর ইয়াযিদের সিংহাসন লাভে কোনও বিঘ্ন না ঘটে। উত্তরাধিকার সূত্রে সিংহাসন লাভ ছিল তদানিন্তন ইসলামী নীতির বিপরীত। কিন্তু মু'আবিয়া তথাপি পশ্চাৎপদ হইলেন না। ওলিদ বিন মুগীরা ও নিষ্ঠুর যিয়াদ (১) ছিল তাহার কুকর্মের জুড়ী। তাহারা উভয়েই তাঁহাকে এ কার্যে উৎসাহ যোগাইতে লাগিল।

এ যাবৎ ইসলামে নির্বাচন মারফৎ খলিফা নির্বাচিত হইয়া আসিয়াছে। মু'আবিয়া সে পদ্ধতি রহিত করার মতলব করিলেন। নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইলে ইমাম হুসায়েনের দাবী রোধ করা ইয়াযিদেব পক্ষে সুকঠিন হইবে, এইরূপ চিন্তা করিয়া হিজরী ৫১ সনে মু'আবিয়া রাজ্যের বিভিন্ন প্রদেশের গভর্নরদের নিকট ফরমান জারি করিলেন যেন জনসাধারণের নিকট হইতে ভাবী খলিফা হিসাবে ইয়াযিদের নাম বায়াৎ (আনুগত্য) গ্রহণ করা হয়। মদীনার গভর্ণর সাইদ বিন আসও যথা সময়ে এই প্রকার ফরমান লাভ করিলেন এবং মদীনাবাসীদিগকে উহার মর্ম অবহিত করাইলেন। উমাইয়া বংশীয় লোকজন ছাড়া মদীনার যাবতীয় কুরায়েশ, বিশেষ করিয়া হাশিমী গোত্রের লোকেরা, মু'আবিয়ার এই ফরমান সরাসরি অগ্রাহ্য করিল। গভর্নর এ সংবাদ যথাসময়ে

---

(১) এই যিয়াদ ছিল আবু সুফইয়ানের রক্ষিতা এক বেদুঈন নারীর গর্ভজাত জারজ সন্তান। নিষ্ঠুরতার জন্য লোকে তাহাকে 'কশাই (Ziad the Butcher) বলিত। মু'আবিয়া তাহাকে ভাই বলিতেন না, বাঁদী বাচ্চা বলিতেন; কিন্তু অপকার্য সাধনের সময় তাহার ডাক পড়িত। ইহারই পুত্র ওবায়দুল্লাহ্ ইব্‌নে যিয়াদ কারবালা যুদ্ধের অধিনায়ক হইয়াছিলেন।

মু'আবিয়ার গোচরে আনিলেন। মু'আবিয়া অতিসয় রুষ্ট হইলেন। অন্য কোনও প্রদেশ হইতে বিরোধিতার এরূপ সুস্পষ্ট প্রকাশ গোচরীভূত হইল না। মু'আবিয়া মুখে কিছু প্রকাশ করিলেন না। তিনি এক সহস্র সৈন্যসহ হজ্জের অছিলায় দামেস্ক হইতে নিক্রান্ত হইলেন।

মক্কার পথে মু'আবিয়া মদীনায় উপনীত হইলেন। নগর প্রবেশ কালে সর্বপ্রথম ইমাম হুসায়েনের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। মু'আবিয়াকে অপ্রসন্ন দেখাইতেছিল। ইমাম তাঁহাকে কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু প্রত্যুত্তরে মু'আবিয়া তাঁহাকে অনুরূপ কোনও প্রশ্ন না করিয়া গম্ভীর মুখে কহিলেন, একটি উষ্ট্র কোরবাণীর সম্ভাবনা দেখিতেছি, এখন আল্লাহ্ যা'কে তৌফিক দেন। হুসায়েন ইহাতে অপমানিত বোধ করিলেন এবং বলিলেন, আপনি আমাদের গুরুজন এবং বুজুর্গ ব্যক্তি; আপনার মুখে এরূপ উক্তি শোভা পায় না। মু'আবিয়া মুখ কাল করিয়াই কহিলেন, প্রয়োজন হইলে ইহার চাইতেও কটু কিছু ব্যবহার করা হইবে। ক্রমে মদিনায় অপরাপর নেতারা তথায় উপস্থিত হইলে আব্দুর রহমান ইবনে আবুবকর আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর এবং আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়েরকেও মু'আবিয়া অনুরূপ ভৎসনা করিলেন। অতঃপর মু'আবিয়া উক্ত নেতা চতুষ্টয়কে সঙ্গে লইয়া নগরে প্রবেশ করিলেন এবং সমস্ত দিন তাঁহাদিগকে সঙ্গে রাখিলেন কাহাকেও গৃহে যাইতে দিলেন না। কাহারও সহিত তাঁহাদের পরামর্শ করিতেও দিলেন না। মু'আবিয়ার এ আচরণ যে পূর্ব পরিকল্পিত এবং তিনি যে ভিতরে ভিতরে অতিশয় রুষ্ট ইহা কাহারও বুঝিতে বাকি রহিল না। তাঁহারা পরদিন মু'আবিয়াকে জানাইয়া মক্কায় প্রস্থান করিলেন। মু'আবিয়া ইহাতে কোনও আপত্তি করিলেন না। হয়ত তিনি ইহাই চাহিয়াছিলেন।

মু'আবিয়া বলিতেন, যেখানে জিহ্বার দ্বারা কষাঘাত যথেষ্ট সেখানে আমি চাবুক লাগাই না; আর যেখানে চাবুক দ্বারাই কাজ হয় সেখানে তলোয়ার চালাই না। বস্তুতঃ তাঁহার মত স্থিরমস্তিষ্ক যালিম, গভীরবুদ্ধি কুটনীতিক ও কঠোর প্রকৃতির শাসক আরবে কমই জন্মিয়াছে। তিনি কাহার উপর কোন্ কোন্ অস্ত্র প্রয়োগ করিবেন এবং আঘাতের মাত্রা কোন

অবস্থায় কতখানি হইবে, তাহা পূর্ব হইতে হিসাব করা থাকিত।

অবাধ্য নেতৃবর্গ তাঁহার রূঢ় আচরণে দুঃখিত হইয়া মদিনা ত্যাগ করিলে মু'আমিয়া নাগরিকদিগকে লাইয়া এক সাধারণ সভার অনুষ্ঠান করিলেন। সভায় তিন নিজ পুত্রের প্রসংসা প্রচার করিয়া তাহাদের নিকট হইতে ইয়াযিদের নামে বায়াৎ আহ্বান করিলেন। নেতৃহীন অবস্থায় উপস্থিত লোকেরা কেহ কোন প্রতিবাদ করিতে সাহস করিল না। মৌনতাই সম্মতি লক্ষণ বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইল।

হজ্জের সময় তখন আগত প্রায়। মু'আবিয়া হজ্জের নাম করিয়া মদিনা ত্যাগ করিলেন। যাইবার পূর্বে তিনি নবীপত্নী বিবি আ'শিয়ার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। মদীনার এই সর্বজনমান্য' মহীয়সী নারী মুসলিম জাহানের মদ-গর্বিত ফলিফাকে বালকের ন্যায় নিকটে বসাইয়া তাঁহার রূঢ় আচরণের কৈফিয়ৎ তলব করিলেন। বলিলেন, তুমি না আজ সৈন্যবল ও ধনবলে বলীয়ান হইয়া এরূপ উদ্ধত হইয়াছ, এই মুহূর্তে আমি যদি হুকুম দিয়া তোমার শিরচ্ছেদ করাই তবে কে তোমাকে এখানে রক্ষা করিতে পারে? কিন্তু তোমার সৌভাগ্য, আমার আল্লা'র রসুলের নিকট সেরূপ শিক্ষা পাই নাই। তাই তুমি নিস্তার পাইলে। চতুর মু'আবিয়া নির্বিকার ও সংযত ভাবে উত্তর করিলেন, উন্মুল মু'মেনীন (বিশ্বাসীগণের জননী) আমি জানি, নবী পাকের পবিত্র হুযরায় কখনও রক্তপাত হইতে পারে না; এ যে শান্তির ধাম। এই কথা বলিয়া এবং পুনরায় এরূপ আচরণ করিবেন না এইরূপ বলিয়া ওয়াদা করার পর, মু'আবিয়া বিবি আ'শিয়াকে সসম্ভ্রমে তসলিম জানাইয়া হুযরা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

মক্কায় উপনীত হইয়া মু'আবিয়া প্রথমে হজ্জব্রত সমাপন করিলেন। তৎপর মদীনার ন্যায় এখানেও তিনি এক সাধারণ সভা আহ্বান করিয়া নিজ পুত্রের বিবিধ গুণ বর্ণনা করিলেন এবং তাহার জন্য বায়াৎ আহ্বান করিলেন। সভায় ইমাম হুসায়েন, আব্দুর রহমান ইবনে আবুবকর, আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর ও মক্কার জননেতা আব্দুল্লাহ ইব্‌নে যুবায়ের স্ব স্ব স্থানে সশস্ত্র প্রহরী দ্বারা বেষ্টিত থাকিলেন। তাঁহাদের কাহাকেও কোনও

কথা বলার সুযোগ দেওয়া হইল না। মু'আবিয়া মুখে প্রকাশ করিলেন যে, মদীনার লোকেরা দল ও গোত্র নির্বিশেষে সকলে ইয়াযিদের নামে বায়াৎ হইয়াছে এবং এখানে মদীনার যে সব নেতা উপস্থিত তঁহাদের কোন আপত্তি নাই। কতক লোক ইহা বিশ্বাস করিল; কতক লোক ভয়ে চুপ করিয়া রহিল। এই ভাবে বায়াৎ গ্রহণ কার্য নির্বিঘ্নে সুসম্পন্ন করিয়া মুআবিয়া দামেষ্কে ফিরিয়া গেলেন।

ইসলামের পিঠস্থান মক্কা ও মদীনা এইভাবে নতি স্বীকার করার পর অন্যান্য প্রদেশে বিশেষ কোনও বাধা হইল না। কারণ মু'আবিয়া যে কিরূপ প্রতিহিংসা পরায়ণ, এবং গুপ্তহত্যা বা মিথ্যা অছিলায় নির্যাতন ইত্যাদি কোনও কার্যই যে তাঁহার অসাধ্য ছিল না, এ সব লোকে জানিত। তাঁহার গৌরবর্ণ ও দৃঢ় আকৃতি, নাতি স্থূল, দীর্ঘ, বলিষ্ঠ ও অনমনীয় দেহ এবং ক্রুর দৃষ্টি মানুষের মনের যুগপৎ ত্রাস ও নৈরাশ্যের সৃষ্টি করিত। অবশেষে হিজরী ৬১ সনে দর্পহারী আজরাইল তাঁহার সকল অহঙ্কার চূর্ণ করিয়া তাঁহাকে অন্ধকারায় নিক্ষেপ করিল (রজব, ৬১ হিঃ ৬৮০ খৃঃ)

মৃত্যুকালে মু'আবিয়া ইয়াযিদকে বলিয়া যান, চারি ব্যক্তি রহিল যাহারা তোমার নামে আজ পর্যন্ত বায়াৎ স্বীকার করে নাই। তাহারা হইল- আলী-পুত্র হুসায়েন, আবুবকর পুত্র আবদুর রহমান, ওমর-পুত্র আবদুল্লাহ, এবং যুবায়ের -পুত্র- আবদুল্লাহ। ইহাদের ভিতর হুসায়েনের সঙ্গে খুব সম্ভব তোমার যুদ্ধ হইবে। যুদ্ধ হইলে তাহাকে প্রাণে মারিও না। কারণ যে হযরত রসুলের ঘনিষ্টতম আত্মীয় এবং রসূল্লাহ'র শোণিত ধারা তাহার দেহে প্রবাহিত। তাহাকে হত্যা করিলে সমস্ত মুসলিম জাহান আলোড়িত হইয়া উঠিবে। ইহাদের ভিতর সর্বাপেক্ষা দুশী ব্যক্তি হইতেছে মক্কার যুবায়ের পুত্র আবদুল্লাহ। সে ব্যাঘ্রের ন্যায় ক্রুর এবং শৃগালের ন্যায় ধূর্ত। বিনা যুদ্ধে সেও হয়ত অধীনতা স্বীকার করিবে না। সম্ভবতঃ সে খিলাফতের অভিলাষী। এই ধড়িবাজ কুরায়েশ শৃগালটিকে হাতে পাইলে টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া কাটিয়া ফেলিবে। অপর দুই ব্যক্তি সম্বন্ধে তেমন ভাবনার কারণ নাই। আবদুর রহমান বৃদ্ধ হইয়াছে। আবদুল্লাহ ইবনে

পরম নিরীহ এবং ধর্মকর্মে আসক্ত। তাহারা বিশেষ কিছু করিতে পারিবে না, সহজেই বসে আসিবে।

মু'আবিয়ার চরিত্রে স্বার্থপরতা, নিষ্ঠুর ইত্যাদি ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও শাসক হিসাবে তিনি যে অত্যন্ত যোগ্যতা সম্পন্ন এবং বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। তিনি কেবল পুত্রের সিংহাসন কায়েম করতেই ব্যস্ত থাকেন নাই। তিনি সেনাবাহিনী সুগঠিত করেন ও রণতরীর প্রবর্তন করেন। খলিফা হইয়া তিনি অশান্ত আরবে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা করিয়াছেন। পূর্ব-রোমক সাম্রাজ্যের রাজধানী কনষ্ট্যান্টিনোপল জয়ের জন্য তাঁহার সময় জলস্থল উভয় পথে সৈন্য প্রেরিত হইয়াছিলেন এবং মোসলেম রণতরীসমূহ কনষ্ট্যান্টিনোপলের মাত্র সাত মাইল দূরে নোঙ্গর করিয়াছিল। কিন্তু খৃষ্টানদের প্রবল প্রতিরোধ বশতঃ মুসলিম বাহিনী আর অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারে নাই। তদীয় সেনাপতি ওক্‌বা মিশরের পশ্চিমে সমগ্র উত্তর আফ্রিকা জয় করেন এবং আটলান্টিকের তীর পর্যন্ত মুসলিম পতাকা উড্ডীন করেন। তিনি গভীর জঙ্গল কাটিয়া কায়রোয়ান শহর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। ইনিই সেই প্রখ্যাত মুসলিম সেনাপতি যিনি আটলান্টিক মহাসাগরের তরঙ্গ মালার ভিতর কোমোর জল পর্যন্ত অশ্ব নামাইয়া আক্ষেপে চীৎকার করিয়া বলিয়াছিলেন- হে আল্লাহ্ যদি এই অকুল জলরাশি আমাকে বাধা না দিত, আমি আরও অগ্রসর হইতাম এবং তোমার ধর্ম ও নামের মহিমা প্রচার করিতাম। ওক্‌বা যখন পশ্চিম দিগন্তে মুসলিম বিজয় প্রসারণে ব্যস্ত, সেই সময় পূর্বাঞ্চলে সেনাপতি মুহাল্লিব সিন্ধু দেশ ও সিন্ধুনদের নিম্ন উপত্যকা জয় করেন। মধ্য এশিয়ায়ও অপর এক সেনাপতি আফগানিস্তান পর্যন্ত মুসলিম অধিকার বিস্তৃত করেন। মহানবী মুহাম্মদের (সঃ) ওফাতের পর মাত্র ত্রিশ বৎসর যাইতে না যাইতে মু'আবিয়া কর্তৃক মুসলিম জাহানের শাসনতন্ত্রের পরিবর্তন আনয়ন অবাঞ্ছিত হইলেও উহা যে তাঁহার অসাধারণ সাহসিকাতা ও রাজনৈতিক বুদ্ধির পরিচালক তাহাতে সন্দেহ নাই।

ইয়াযিদের সিংহাসন আরোহন

মু'আবিয়া মৃত্যুর পর তদীর ব্যবস্থানুযায়ী সপ্তত্রিংশৎ বর্ষীয় ইয়াযিদ পিতৃ-সিংহাসনে আরোহন করিলেন (শাবান, ৬১ হিঃ ৬৮০ খৃঃ)। খলিফা হইয়াই তিনি মদীনা অঞ্চলের বিদ্রোহী চারি প্রধানের নিকট বশ্যতা আদায়ের জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। তত্রত্য শাসনকর্তা ওলীদ বিন ওক্‌বার নিকট হুকুম প্রেরিত হইল, হুসায়েনকে বায়াৎ করাইতে হইবে এবং সে অবাধ্য হইলে তাহাকে কোতল করিয়া তাহার ছিন্নশির দামেস্কে প্রেরণ করিবে। আবদুর রহামন ইবনে আবুবকর, আবদুল্লাহ্ ইবেন ওমর এবং আবদুল্লাহ্ ইবনে যুবায়ের সম্বন্ধে ও অনুরূপ আজ্ঞা প্রেরিত হইল।

মু'আবিয়ার সহিত হাসানের সন্ধির পর হইতে হুসায়েন রাজনীতি হইতে সম্পূর্ণ দূরে থাকিয়া ধর্ম চর্চায় জীবন কাটাইতেছিলেন। তাঁহার মন একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। জ্যেষ্ঠভ্রাতা হাসানের মৃত্যু (৫১) হিঃ) তারপর উম্মুল মু'মেনীন আ'য়িশার মৃত্যু (৫৮ হিজরী), তাঁহার প্রাণে চরম আঘাত হানে। তিনি চাহিয়াছিলেন শান্তিপূর্ণ এবং ধর্মজীবন। কিন্তু ইয়াযিদের ঔদ্ধত্য তাঁহাকে স্থির থাকিতে দিল না। চর্তুদিকে জনসাধারণ ও ইয়াজিদের খিলাফৎ প্রাপ্তিতে বিচলিত হইয়া পড়িয়াছিল। তাহাদের আশঙ্কা হইয়াছিল, ইসলাম বুঝি এইবার রসাতলে যায়। মু'আবিয়ার নিজ জীবন অনেক দুষ্কার্যের দ্বারা কলঙ্কিত হইয়া থাকিলেও ইসলামী বিধান সমূহ যাহাতে রাজ্যের সর্বত্র পালিত হয় সেদিকে তিনি দৃষ্টি রাখিতেন। কোনও বিধান সম্পর্কে মতদ্বৈত দেখা দিলে তিনি নিজের উপর দায়িত্ব না রাখিয়া বিবি আ'য়িশার শরণাপন্ন হইতেন এবং তাঁহার নিকট মীমাংসা চাহিয়াছেন। কিন্তু ইয়াযিদের কথা ছিল স্বতন্ত্র। ইসলাম, ওলি-আল্লাহ বা বোজর্গানে-দীণ, ইহার কোন কিছুরই তাহার কাছে মর্যাদা ছিল না (১)। এ হেন লোক খলিফা রূপে নবীর প্রতিনিধিত্ব করিবেন, অন্য লোক ইহা

বরদাশ্ত করিলেও স্বয়ং নবীর ওয়ারিশ তাহা কি করিয়া মানিয়া লইবে? ইমাম হাসান যখন মু'আবিয়ার অনুকূলে খিলাফতের দাবী পরিত্যাগ করেন তখন ইসলামের এতটা বিপন্ন হইবার আশঙ্কা দেখা দেয় নাই। কিন্তু এখন অবস্থা সম্পূর্ণ অন্যরূপ। ইসলামের এখন এক সঙ্কটময় মুহূর্ত উপস্থিত। ইয়াযিদের বশ্যতা স্বীকার দ্বারা নিজের নিরাপত্তা চাহিলে ইসলামকে বিসর্জন দিতে হয়। আর ইসলামের কল্যাণ চাহিলে সঙ্কটে পরিয়া শেষোক্ত বিপদ সঙ্কুল পথই বাছিয়া লইলেন। অন্যথা, শুধু ইসলামই আপনার সত্তা হারাইত না, দুনিয়ায় নবীবংশেরও কলঙ্ক রটিত।

ইয়াযিদের আদেশ অনুযায়ী গভর্নর ওলীদ ইমামকে ডাকিয়া পাঠাইলেন এবং যথোচিত সম্মানের সহিত তাঁহার নিকট ইয়াযিদের ফরমানের কথা প্রকাশ করিলেন। উত্তরে ইমাম ইয়াযিদের বায়াৎ স্বীকারে তাঁহার অক্ষমতা জ্ঞাপন করিলেন। ইহা যে একটানীতিগত প্রশ্ন, কোন প্রকার প্রতিদ্বন্দ্বিতা বা বিদ্বেষমূলক নয় তাহা তিনি বুঝাইয়া বলিলেন। ওলীদ মহা ফাঁফরে পড়িলেন। তিনি ইমামকে আরও বিশেষ ভাবে চিন্তা করিয়া দেখিতে অনুরোধ জানাইয়া বিদায় করিলেন।

---

(১) " Yezid was cruel and treacherour; his devpraved nature knew no pity nor justice. His pleasures were as degrading as his companions were low and vicious. He insulted the ministers of religion by dressing up a monkey as learned divine and carrying the animal mounted on a beautiful caparisoned Syrian donkey wherever he went. Drunken riotousness prevailed at Court and was naturally imitated in the streets of the capital"- A short History of the Saracens- by Ameer Ali, p83

তৃতীয় অধ্যায়

ইমামের মদিনা ত্যাগ

ইয়াযিদকে খলিফা বলিয়া অস্বীকার করার পরিণাম যে কি ইমাম তাহা ভালরূপেই বুঝিতেন। ইহার পর তিনি মদিনায় অবস্থান করিলে ইয়াজিদের সৈন্যসামন্ত সেখানেই তাঁহাকে বন্দী করিতে আসিবে এবং মদীনা শহরে রক্তস্রোত বহাইবে ইহা নিশ্চিত জানিয়া ইমাম মদিনা ছাড়িয়া মক্কা যাইতে মনস্থ করিলেন।

যাত্রার পূর্বে তিনি হযরতের রওযা ও 'জান্নাতুল বাকীয়ায়" গিয়া গুরুজনদের কবর যেয়ারৎ করিলেন। নুরনবীর মাযারে বসিয়া সমস্ত রাত্রি অশ্রুপাত করিলেন এবং তাঁহার জাগ্রত আত্মার নিকট এই মহাসঙ্কটে কর্তব্যে নির্দেশ চাহিলেন। এই অবস্থায় কখন যে তিনি রওজার পাশে ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন তাহা জানিতে পারেন নাই। ঘুমের ভিতর প্রিয় নানাকে স্বপ্নে দেখিলেন। তিনি ইমামের মস্তক ক্রোড়ে লইয়া বলিলেন, বাছা, যত কঠিন বিপদই আসুক তাহাতে ভাঙ্গিয়া পড়িও না। মনে রাখিও তুমি বেশী দিন দুনিয়ায় থাকিবে না; সত্বরই আমার নিকট চলিয়া আসিবে। এই অস্থায়ী জীবনে সুখ ও আরামের জন্য দুর্নীতি ও অধর্মের নিকট মস্তক নত করিও না।

সে দিন ছিল ৩রা শাবান। স্বপ্নাদেশ প্রাপ্তির পর ইমামের সকল দ্বিধা-ভয় কাটিয়া গেল। রজনী প্রভাত হইলে ইমাম আত্মীয় বান্ধব সকলের নিকট বিদায় লইয়া সপরিবারে মক্কায় রওয়ানা হইলেন। মদীনার আবাল বৃদ্ধ বনিতার অশ্রুসিক্ত নয়ন তাহাদের প্রিয় ইমামকে বিদায়ী সালাম জ্ঞাপন করিল। কেন যেন ইমামের মনে হইতেছিল, জন্মভূমি হইতে ইহাই তাঁহার শেষ বিদায়। তাই তাঁহার নিজের চিত্তও ছিল উদ্বেলিত।

মক্কায় ইমামকে সকলে সাদর অভ্যর্থনা জানাইল। কেহ কেহ এক মঞ্জিল আগাইয়া আসিয়া তাঁহার বক্ষে বক্ষ মিলাইল। তাহারা তাঁহার স্বগৃহে অর্থাৎ পৈতৃক বাড়ীতে তাঁহাকে লইয়া গেল। হযরত আব্বাসের পুত্র আব্দুল্লাহ্, ওমরের পুত্র আব্দুল্লাহ্ এবং ইমামের বৈমাত্রেয় ভাই মুহম্মদ আল হানাফিয়া (হানিফা) প্রমুখ হিতৈষী আত্মীয় বান্দব অনেকেই এই সময় মক্কায় ছিলেন। তাঁহারা ইমামকে পাইয়া একান্ত আহ্লাদিত হইলেন।

ইমাম কিছুদিন মক্কায় বেশ আনন্দ উল্লাসে কাটাইলেন, কিন্তু নিরাপদ হইতে পারিলেন না। সেখানে তাঁহার জীবন নাশের জন্য গোপন ষড়যন্ত্র চলিতে লাগিল। তিনচার মাসের মধ্যে পর পর তিনটি ষড়যন্ত্রের কথা তিনি জানিতে পারিলেন। তখন পুনরায় তিনি নিজকে নিতান্ত অসহায় ও বিপন্ন বোধ করিতে লাগিলেন।

ইতিমধ্যে কুফায় পুনরায় রাজনৈতিক পট-পরিবর্তন সংঘটিত হইয়া ছিল। কুফাবাসীরা ইয়াযিদের বশ্যতা অস্বীকার করিয়া ইমাম হুসায়েনকে তাঁহার পৈতৃক গদীতে বসাইবার সংকল্প করিয়াছিল। ইমাম মদীনায় থাকিতেই তাহারা ইমামকে কুফায় আহ্বান করিয়াছিল খিলাফৎ গ্রহণ করিতে। কিন্তু কুফীদের মত দীর্ঘদিন এক অবস্থায় থাকে না, তাই ইমাম তখন সে দিকে মনযোগ দেন নাই। অধুনা তাদের আকাঙ্খার তীব্রতাক্রমেই বাড়িয়া উঠিতেছিল। এবং পুনঃ পুনঃ তাহাদের পত্র ও প্রতিনিধি দল আসিয়া ইমামকে ব্যতি ব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল। কুফায় তাহারা বড় বড় সভা করিয়া সেখান হইতে হাজার হাজার লোকের দস্তখত সহ লিখিত দরখাস্ত ইমামের নিকট পাঠাইতে লাগিল এই মর্মে যে, মুসলিম জাহানের খলিফা হওয়া একমাত্র আপনাকেই সাজে। ইয়াযিদ কোন্ ছার যে সে এই ইসলামী রাষ্ট্র পরিচালনা করিবে। আমরা সহস্র সহস্র লোক আপনার পতাকা তলে সমবেত হইতে এবং আপনার জন্য জীবন উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত আছি। আপনি শীঘ্র আসিয়া আমাদের নেতৃত্ব গ্রহণ করুণ এবং কুফার সিংহাসনে উপবেশন করুন।

ইমাম দেখিলেন, তাঁহার সম্মুখে এখন দুইটি মাত্র পথ বিদ্যমান। হয় মক্কায় বসিয়া ইয়াজিদ বাহিনীর আক্রমণের প্রতীক্ষা করা অথবা কুফীদের আহ্বান মঞ্জুর করিয়া তাহাদের সাহায্য সম্মুখ যুদ্ধে ইয়াযিদের মোকাবেলা করা। অবশ্য শান্তির সহজ পন্থা ছিল ইয়াযিদের বশ্যতা স্বীকার। কিন্তু সত্যের আহ্বান তিনি উপেক্ষা করেন কি করিয়া? শুধু খাইয়া পড়িয়া বাঁচিয়া থাকাই তো জীবনের উদ্দেশ্য নয়। সে তো পশুর সমান। মুসলিম জাহান যে মুক্তির জন্য আর্তনাদ করিতেছে। অত্যাচারের ভয়ে মু'মিনগণ নীরবে সমস্ত অত্যাচার সহ্য করিতেছিল, কিন্তু অন্তর তাহাদের গুমরিয়া উঠিতেছিল অশাম্যপূর্ণ সাম্রাজ্যবাদী শাসনের নাগ পাশ হইতে মুক্তির জন্য। আর চাহিতেছিল ইসলামের অন্তর্নিহিত সত্য আপনার পুনঃ প্রকাশ। হুসায়েন ছাড়া আর কে এমন ছিলেন যিনি এই সঙ্কট মুহূর্তে আপন জীবনকে কোরবাণী করিয়া মুসলিম জাহানকে পাপমুক্ত করিতে ও ইসলামের গতিপথ পুনরায় বেগবসান্ত করিতে পারিতেন। তাঁহার অন্তর তাঁহাকে তারস্বরে বলিয়া দিতেছিল,. সে একমাত্র তুমি রসুলের 'পৌত্র তুমি, একাজ তোমারই সাজেঃ এ তোমার মহান কর্তব্য। হুসায়েন পক্ষে ইহা, ছিল, মুকুটের প্রলোভন নয়, আত্মদানের অলঙ্ঘ্য আহ্বান। সিংহাসন তাঁহার কাম্য ছিল না, তবে জনবলের তাঁহার প্রয়োজন ছিল, নতুবা তিনি ধর্মের জন্য, সত্যের জন্য, ন্যায়ের জন্য সংগ্রাম চালাইবেন কি করিয়া! এ সংগ্রামের ফল হইবে 'মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন।" সাধনার ফল কখনও ব্যর্থ হইবার নহে। যদি মন্ত্রের সাধন হয়, দুনিয়ায় ন্যায়ের রাজ্য পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইবে; যদি শরীর পতন হয়, তাঁহার রক্ত-সায়র হইতে উদ্ভুত হইবে নয়, মুজাহীদ দল, যাহারা যুগে যুগে জিহাদ চালাইবে ইসলামকে কলুস হইতে নিমুক্ত করার জন্য। তাঁহার লহু হইবে ভাবী কালের সেই বীর মুজাহীদদের জন্য রক্ত-বীজ। সুতরাং হুসায়েনের কর্তব্য নির্ধারণ করিতে আর দ্বিধা থাকিল না। যদি বীরপ্রসূ আরবের বীর্যবন্ত সন্তানগণ মরিয়া গিয়া থাকে এবং কেহ তাঁহার অনুসরণ না করে, কুফার মুসলিমগণ হয়ত তাঁহার পতাকাতলে সমবেত হইতে পারে। আর কেউ

যদি সাড়া না দেয়, ক্ষতি কি, আল্লাহ'র নামে একাই তিনি জীবন উৎসর্গ করিবেন।

ইমাম তাঁহার আত্মীয়-স্বজনদের নিকট এ বিষয়ে পরামর্শ চাহিলেন। কিন্তু তাঁহারা সকলেই একবাক্যে তাঁহাকে মক্কা ছাড়িয়া যাইতে নিষেধ করিলেন; শুধু মক্কার জননেতা আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের তাঁহাকে বারন করিলেন না। এই ব্যক্তি অগাধ ধনসম্পত্তির অধিকারী ছিলেন।(১)। শক্তি সাহস ও কুটনৈতিক বুদ্ধিও তাঁহার যথেষ্ট ছিল। মু'আবিয়া ইহারই সম্বন্ধে মৃত্যুকালে ইয়াযিদের নিকট সতর্কবানী উচ্চারণ করিয়াছিলেন। মক্কায় ইঁহার নেতৃত্বে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। কেহ কেহ মনে করেন, ইমাম হুসায়েন মক্কায় বসতি করিলে আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের প্রতিদ্বন্দ্বি হইতে পারেন, তাঁহার মনে এইরূপ আশঙ্কা ছিল। যাহা হউক, তাঁহার পরামর্শ ছিল এই যে, নিশ্চেষ্ট অবস্থায় মক্কায় গিয়া বসিয়া বিপদকে নিকটে ডাকিয়া আনার চাইতে কুফায় শক্তিসঞ্চয় করা ও বীরের ন্যায় লড়াই করাই গৌরবজনক।

ইমামের পিতৃকুলের ভিতর সর্বাপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ ও জ্ঞানপ্রবীণ ছিলেন আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস। তিনি বলিলেন কুফাবাসীদের মতির কোন স্থিরতা নাই। তাহারা তোমার পিতা আলীকে প্রবঞ্চিত করিয়াছে, হাসানের সহিত শঠতা করিয়াছে; তুমিও হয়ত সেখানে গিয়া দেখিবে ইতোমধ্যে তারা আবার মত পরিবর্তন করিয়াছে। হয়ত অন্য কোন প্রবলতর শক্তির প্রভুত্ব মানিয়া লাইয়া তাহারা তোমার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ

(1.) "Masudi states that during the caliphate of Othdman the companions of the prophet built for themselves magnificent mansions. The house built by Zubair son of Awwam (at Mecca) was in existence in the year 352 of theHegira when Masudi wrote, and was used by the marchants and bankers for business purpose. Zubair also built several mansions at Kufr, Fostat and Alexandria and these house with their gardens existed in good order in Masudi's time" A Short History of the Saracens- By Syed Ameer Alid- P. 56

করিতে প্রস্তুত হইয়াছে। ইমাম কহিলেন, তাহারা দেশশুদ্ধ লোক একতাবদ্ধ হইয়া আমাকে চাহিতেছে। শত শত পত্র লিখিতেছে এবং দলের পর দল তাহাদের প্রতিনিধিবর্গ আসিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতেছে, এ সবই কি ছলনা? আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস কহিলেন যদি একান্ত সেখানে যাইতে বাসনা কর তবে পূর্বে একজন বিশ্বস্ত লোককে তথায় পাঠাইয়া তথাকার প্রকৃত অবস্থা অবগত হও। যদি অবস্থা অনুকুল মনে কর, তখন যাইবে। ইমাম এই কথাই সমীচীন মনে করিলেন এবং নিজ চাচাতো ভাই মুসলিম বিন ওকীলকে গোপনে কুফায় প্রেরণ করিলেন।

মুসলিমের দৌত্য

মুসলিমের পিতা ওকীল ছিলেন হযরত আলীর সহোদর ভ্রাতা। ইমামের অনুরোধে মুসলিম দুইজনমাত্র বিশ্বস্ত অনুচরসহ গোপনে কুফায় চলিয়া গেলেন। তথায় তিনি হা'নী নাম এক পয়গম্বর ভক্ত মুসলমানের বাড়িতে আতিথ্য গ্রহণ করিলেন। ইমামের ভক্তগণের নিকট শীঘ্রই তাঁহার আগমনের সংবাদ প্রচারিত হইল এবং তাহারা দলে দলে আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে ও ইমামের নামে তাহার হাতে বায়াৎ হইতে লাগিল। একদিনে বার হাজার লোক বায়াৎ হইল। মুসলিম ইহাদের উৎসাহ ভক্তি ও দৃঢ়তা দর্শনে মুগ্ধ হইয়া সেই দিনই ইমামকে পত্র লিখিলেন যে, অদ্য বার হাজার লোক আপনার নামে আমার নিকট হইতে বায়াৎ হইয়াছে এবং আরও লাখ লোক বায়াৎ হইতে তৈয়ার। আপনি আসিলেই সমস্ত পরিষ্কার হইয়া যাইবে। ইহারা আপনার অত্যন্ত অনুগত এবং ইহাদের উৎসাহ খুব বেশী। আপনি আর অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া শীঘ্র চলিয়া আসুন।

দুইজন সর্দার এই পত্র বহন করিয়া ইমামের নিকট উপস্থিত হইল এবং কুফাবাসীদের আগ্রহাতিশয্যের কথা বর্ণনা করিল। ইমাম তাহাদিগকে আশ্বাস দিয়া কহিলেন, তোমরা যাও আমি শীঘ্রই আসিতেছি। এই সর্দারগণ চলিয়া যাইতেই আর একদল আসিয়া কহিল, হুজুর, বিলম্বের সময় নাই, শীঘ্রই চলুন। ইমাম তাহাদিগকেও পূর্ববৎ বিদায় করিয়া দিতে না দিতেই আর একদল আসিল। ইমামের আর সন্দেহ মাত্র রহিল না। তিনি তাহাদিগকে শীঘ্র আসিতেছি বলিয়া বিদায় করিয়া কুফা গমনের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। এদিকে বসরায় যে সমস্ত লোক ইমামবংশের ভক্ত ও অনুগত ছিল তাহাদিগকেও তিনি পত্র দ্বারা কুফায় যাইতে নির্দেশ দিলেন।

ঐ সময় নে'মান বিন বশীর নামক এক সাহাবী কুফায় গভর্নর ছিলেন। তিনি প্রাণে প্রাণে নবীবংশের উত্থান চাহিলেন, কিন্তু ব্যহ্যতঃ ইয়াযিদের ভৃত্য ছিলেন। বনি-উমাইয়াগণ তাঁহাকে বলিল, কি দেখিতেছ, আরও কি ঘুমাইয়া থাকিবে? মুসলিম দলে দলে লোকগিকে বায়াৎ করিতেছে। মুল্লুক যাইতে চলিল, রাষ্ট্রের মঙ্গল চাও তো এই মুহূতে মুসলিমর্কে গেরেফতার করিয়া কোতল কর এবং যাহারা তাহার হস্তে বায়াৎ হইয়াছে তাহাদিগকে শাস্তি প্রদান কর। ইমাম শীঘ্রই আসিয়া পড়িবে, তখন আর পারিয়া উঠিবে না। নে'মান সেদিক বড় দৃকপাত করিলেন না, যেন কিছুই কোথাও হয় নাই- বনি-উমাইয়াগণ দেখিল, নে'মান শৈথিল্য প্রকাশ করিতেছে। তখন তাহারা ইয়াযিদকে লিখিল, মুল্লুক হাত ছাড়া হইতে চলিয়াছে। সত্বর প্রতিকার করুন। তাহারা মুসলিমের কার্যকলাপ ও নে'মানের শৈথিল্যের কথা বিশেষ করিয়া ফেনাইয়া নিজেদের বিশ্বস্ততা সপ্রমাণ করিল।

এই পত্র পাইয়া ইয়াজিদের মস্তক ঘুরিয়া গেল। তাঁহার আশঙ্কা হইল, ব্যাপার এতদুল গড়াইয়াছে যেন তার তিলমাত্র উপেক্ষা করা চলে না। তখন ওবায়দুল্লাহ ইবনে যিয়াদের কথা তাহার মনে পড়িল। যিয়াদের নাম পূর্বে উল্লেখিত হইয়াছে। সে ছিল আবু সুফইয়ানের রক্ষিত এক বেদুইন রমনীর গর্ভজাত জারজ সন্তান। যেমন নিষ্ঠুর তেমনি নীচমতি ছিল এই লোকটি। মু'আবিয়া কখনও তাহাকে ভাই বলিয়া স্বীকার করিতেন না, বাঁদীবাচ্চা বলিতেন। কিন্তু কোনও জঘন্য বা নিষ্ঠুর কাজ সম্পাদনের বেলায় তাহার ডাক পড়িত। এ হেন লোকের পুত্র ওবায়দুল্লাহ ওরফে আব্দুল্লাহ ছিল পিতা অপেক্ষাও নির্মম। এই সময় আব্দুল্লাহ ইবনে যিয়াদ দক্ষিণ ইরাকের বসরার গভর্নর ছিল। ইয়াযিদ পত্র দ্বারা তাহাকে কুফার শাসনভার অর্পণ করিয়া অবিলম্বে তথায় যাইতে এবং ইমামের গতিরোধ করিতে হুকুম দিলেন। হুকুমনামায় ইয়াযিদ আরও লিখিলেন, যদি ইতোমধ্যে হুসায়েন কুফায় পৌছিয়া থাকে তাবে বন্দী করিয়া দামেস্কে

প্রেরণ করিবে। আর যদি সে প্রতিরোধ করে তবে তাহার উপর তলোয়ার চালাইবে এবং তাহার মস্তক কাটিয়া আমার নিকট প্রেরণ করিবে। তাহার প্রতিনিধি মুসলিম বিন ওকীল এখন কুফায় বসিয়া তাহার নামে কুফাবাসীদিগকে বায়াৎ করিতেছে। অবিলম্বে তাহার গর্দান লইবে এবং বিদ্রোহীদের সমুচিত শাস্তি প্রদান করিবে।

আব্দুল্লাহ্ ইবনে যিয়াদের কুফার শাসনভার গ্রহণ

আবদুল্লাহ ইবনে যিয়াদ ইয়াযিদে পত্র পাইয়া কুফায় গমনের জন্য প্রস্তুত হইলেন। নগরের শাসন ভার কনিষ্ঠ ভ্রাতার উপর ন্যস্ত করিয়া তিনি তথাকার দুই তৃতীয়াংশ সৈন্য সঙ্গে লইলেন এবং দ্রুত অগ্রসর হইতে লাগিলেন। সন্ধ্যার প্রাক্কালে কুফার উপকণ্ঠে কিমাবেন নামক স্থানে উপনীত হইয়া তিনি তাঁহার সৈন্যদলকে নগরের পশ্চাৎ দিক দিয়া কুফায় প্রবেশ করিতে নির্দেশ দিলেন এবং নিজে অল্প কয়েকজন বিশ্বস্ত অনুচর লইয়া সম্মুখ তোরণের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। যখন আব্দুল্লাহ নগর তোরণে উপনীত হইলেন তখন সন্ধ্যা অতীত হইয়াছে এবং বেশ অন্ধকার হইয়াছে। এই সময় তিনি বেশ পরিবর্তন করিয়া হিজাযী পোশাক পরিধান করিলেন। তলোয়ার কণ্ঠে ঝুলাইয়া আপাদমস্তক বস্ত্রাবৃত করিলেন। মাথায় কালো আমামা, বাম বগলে ধনুক এবং দক্ষিণ হস্তে কালো আ'শা (যষ্ঠি) ধারণ করিলেন। এই ভাবে সজ্জিত হইয়া আব্দুল্লাহ একটি মাত্র গোলামসহ উষ্ট্রপৃষ্ঠে নগরে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার রক্ষী অনুচরগণ আগে পিছে তাঁহাকে অনুসরণ করিল।

ইতোমধ্যে মগরিব উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে এবং এশার সময় আগত। কুফাবাসীগণ অহর্নিশ ইমামের আগমণ প্রতীক্ষা করিতেছিল। এই আসে, এই আসে এমনি ভাব। আবদুল্লাহ ইবনে যিয়াদ যখন ছদ্মবেশে নগরে প্রবেশ করিলেন, লোকেরা ভাবিল এই বুঝি ইমাম আসিলেন। চর্তুদিক হইতে আওয়ায উঠিতে লাগিল , আস্‌সালুম আলায়কুম, ইয়া ইবেন রসুলুল্লাহ, ইয়া ইব্‌নে রসুল্লাহ।

আব্দুল্লাহ ইবনে যিয়াদ এই সমস্ত প্রগল্‌ভতা দেখিয়া অন্তরে জ্বলিয়া গেলেন। তিনি শুধু হাত তুলিয়া সালাম লইলেন, মুখে কিছুই বলিলেন

না। মুখেও বস্ত্র উন্মোচন করিলেন না, সোজা গিয়া রাজপ্রাসাদের দ্বারে উপনীত হইলেন। সেখানে নে'মান বিন বশীর উপস্থিত ছিলেন। তাঁহার নিকট ইতিমধ্যে খবর গিয়াছিল যে, হযরত ইমাম হুসায়েন তশরীফ আনিয়াছেন। তিনি দ্রুত প্রাসাদ দ্বার বন্ধ করিয়া উপর হইতে বলিতে লাগিলেন, যে রসূল তনয়, এখান হইতে চলিয়া যান, ইয়াযিদ আপনাকে এই শহর কখনই ছাড়িয়া দিবে না। আমি ইহা চাহি না যে, আমার রাজধানীতে আপনি নিহত হন। উচ্ছ্বসিত জনতা ইমাম ভ্রমে আব্দুল্লা'কে ঘিরিয়া অগ্রসর হইতেছিল। তারারা শীঘ্র দরজা খোলার জন্য নে'মানকে পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল। কিন্তু নে'মান কেবলই বিলম্ব করিতে লাগিলেন ইতোমধ্যে আবদুল্লা'র সৈন্যদল অপর দিক দিয়া নগরে প্রবেশ করিল। আবদুল্লাহ তাহাদের অগ্রদূতকে দেখিতে পাইলেন। সে ব্যক্তি লোক দিগকে বলিতেছিল, তোমরা কি অন্ধ হইয়াছ, দেখিতেছ না, কুফার নয়া গভর্নর আবদুল্লাহ ইবনে যিয়াদ তোমাদের সম্মুখে উপস্থিত। আবদুল্লাহ তখন মুখ হইতে বস্ত্র উন্মোচন করিলেন এবং নে'মানকে ধমক দিয়া কহিলেন, দরজা খোল, আমি যিয়াদের পুত্র আবদুল্লাহ। বৃদ্ধ নে'মান তৎক্ষণাৎ দরজা খুলিতেছেন এবং আবদুল্লা'র রুদ্রমূর্তি দেখিয়া হতভম্ব হইয়া গেলেন। উপস্থিত লোকেরা লজ্জা ও ভয়ে দ্রুত সরিয়া পড়িল। এই রাত্রিতেই আবদুল্লাহ যিয়াদ নে'মানের নিকট হইতে কার্যভার বুঝিয়া লইলেন। পরদিন প্রাতে বৃদ্ধ দামেস্ক অভিমুখে রওয়ানা হইয়া গেলেন।

মুসলিমও শীঘ্রই আবদুল্লাহ যিয়াদের আগমন বার্তা লোকমুখে অবগত হইলেন। তিনি এ যারাৎ হানী ইবনে হানী নামক একজন বিশ্বাসী মুসলমানের গৃহে অবস্থান করিতেছিলেন। অতঃপর আব্দুল্লাহ কি করেন তাহাই দেখার জন্য মুসলিম উদগ্রীব হইয়া রহিলেন।

পরদিন আবদুল্লাহ যিয়াদ নগরের নেতৃস্থানীয় লোকদিগকে ডাকিয়া এক সভা আহ্বান করিলেন এবং সকলকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "দেখ আমি যিয়াদের বেটা আবদুল্লাহ। যিয়াদ কিরূপ নৃশংস ছিলেন তাহা তোমরা অবগত আছ। আমি ততোধিক। তোমাদের কীর্তিকলা আমি সমস্তই জানিতে পারিয়াছি। কে কে মুসলিমের নিকট হুসায়েনের নামে

বায়াৎ হইয়াছ তাহাও আমার জানিতে বাকী নাই আমি তাহাদের নাম জানি, বংশাবলী জানি, তাহাদের চেহারাও আমার সম্মুখে ভাসিতেছে। কিন্তু তাহাদিগকে আমি এই বারের জন্য ক্ষমা করিতেছি। তবে আমি চাই, তাহারা এই মুহূর্তে হুসায়েনের বায়াৎ ভঙ্গ করুক এবং পুনরায় ইয়াযিদের বশ্যতা স্বীকার করুক। অন্যথা তাহাদিগকে একে একে পিষিয়া মারা হইবে এবং তাহাদের জন-বাচ্চা বা গৃহাদির কোন চিহ্ন রাখা হইবে না।"

ভীরু কুফাবাসিগণ এই এক ধমকেই কম্পিত ও সন্ত্রস্ত হইয়া অচিরাৎ ইমামের বায়াৎ হইতে নিজদিগকে মুক্ত করিল এবং আবদুল্লাহ ইবনে যিয়াদের নিকট আনুগত্য প্রকাশ করিল।

আমাদের অনুগৃহীত ছিলে, এই বুঝি তোমার প্রতিদান? তুমি এখন ইয়াযিদের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া আপন গৃহে তাঁহার শত্রুকে পুষিতেছ। হানী ইয়াযিদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের অভিযোগ অস্বীকার করিল। তখন আব্দুল্লাহ যিয়াদ পূর্ব দিবসের সেই গুপ্তচরকে ডাকইয়া তাহার সম্মুখে উপস্থিত করিলেন এবং তাহার দ্বারা রাত্রির সমস্ত ঘটনা বিবৃত করাইলেন। হানী লজ্জিত হইল এবং বলিল, আমার গৃহে মুসলিম আছেন ইহা সত্য কিন্তু তিনি স্বেচ্ছায় আসিয়াছেন। অতিথিকে তাড়াইয়া দেওয়া আরবের রীতি বিরুদ্ধ। আব্দুল্লাহ যিয়াদ তখন বলিলেন, আচ্ছা বেশ, এইবার তবে গৃহে যাও এবং মুসলিমকে লইয়া আইস। হানী এই কার্য করিতে অস্বীকার করিল। আব্দুল্লাহ যিয়াদ তখন ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া গোর্জ তুলিয়া বৃদ্ধের মাথায় আঘাত করিল। মাথা কাটিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল। পরে তাহাকে বন্দীগৃহে স্থানান্তরিত করা হইল।

মুহূর্তে চারিদিকে সংবাদ রাষ্ট্র হইল যে, হানী নিহত হইয়াছে। তাহার বংশীয় তখন তলোয়ার লইয়া ছুটিল আব্দুল্লাহ যিয়াদের সহিত বুঝাপড়া করিতে। মুসলিমও এই সংবাদ শুনিয়াছিলেন। তিনিও তরবারি কোষমুক্ত করিয়া তাহাদের অনুসরণ করিলেন। হাজার হাজার লোক সেখানে জমায়েত হইল এবং হানীর ব্যাপার লইয়া হল্লা করিতে লাগিল। উত্তেজিত জনতা দেখিয়া আব্দুল্লাহ যিয়াদ দুর্গদ্বার বন্ধ করিয়া দিলেন এবং রক্ষীগণকে উপর হইতে তীর নিক্ষেপ করিতে বলিলেন। কিন্তু জনতা বিতাড়িত করা গেল না।

এইরূপ হট্টগোলের ভিতর দিবস কাটিয়া গেল। সন্ধ্যা সমাগত হইলে জনতা আপনি ছত্রভঙ্গ হইতে লাগিল। লোকেরা যে যাহার গৃহপানে চলিল। কিন্তু আশ্চর্য এই, মুসলিমকে কেহ ডাকিল না। কেহ তাঁহাকে জিজ্ঞাসাও করিল না। সন্ধ্যার অন্ধকারে পথে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া মুসলিম ভাবিতে লাগিলেন, এখন যাই কোথায়? হানীর বাড়ী তো আর যাওয়া চলে না। অনির্দিষ্ট ভাবে রাজপথ দিয়া চলিতে চলিতে যখন নগরের শেষ প্রান্তে আসিয়া পড়িলেন, তখন মুসলিম বসিয়া পড়িলেন। কারণ তারপর আর লোকালয় নাই।

মুসলিমের শিরচ্ছেদন

অতঃপর আব্দুল্লাহ ইবনে যিয়াদ মুসলিমের প্রতি মনোযোগ দিলেন। মুসলিমের অবস্থান ছিল তাহার অজ্ঞাত। তিনি ভাবিলেন মুসলিমদের বিরুদ্ধে যদি সাক্ষাৎ প্রমাণ জুটে তবেই তাঁহাকে হত্যা করা সহজ হইবে। অন্যথা অনেক শোণিতপাত হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। তা ছাড়া কুফার সমুদয় লোক একযোগে ক্ষেপিয়া উঠিলে রাষ্ট্রের নিরাপত্তা রক্ষা করাও কঠিন হইবে। বিশেষতঃ ইমাম হুসায়েন সংক্রান্ত ব্যাপারে লোকের একটি দুর্বলতা আছে। এইসব চিন্তা করিয়া আব্দুল্লাহ একজন বিশ্বস্ত গোলামকে তিন হাজার দেরেম মুদ্রাসহ মুসলিমের অনুসন্ধানে প্রেরণ করিলেন। তাহাকে বলিয়া দিলেন যে, তুমি লোকের নিকট নিজকে বসরার একজন দূত বলিয়া পরিচয় দিবে এবং বলিবে যে, বসরাবাসীদের পক্ষ হইতে আমি এই সামান্য নযর লইয়া আসিয়াছি হযরত মুসলিমের নিকট বায়াৎ হইবার জন্য। সেখানে হাজার হাজার লোক ইমামের সাহায্যার্থে প্রস্তুত রহিয়াছে। আমি তাহাদের বার্তা লইয়া অগ্রে আসিয়াছি। গোলাম তাহাই করিল। যেখানে দশ পাঁচজন লোক একত্রে দেখিল সেখানেই সে গভীর আকুলতার সহিত নিজের আবেদন প্রকাশ করিল। অজ্ঞ লোকেরা তাহার কথায় বিশ্বাস করিয়া তাহাকে হানীর বাড়ী লইয়া গেল। সে হানীর মারফৎ মুসলিমের সহিত সাক্ষাৎ করিল এবং রাত্রিরই কোনও এক ফাকে আসিয়া আব্দুল্লাহ ইবনে যিয়াদকে মুসলিমের অবস্থান ও কার্য কলাপ সম্বন্ধে খবর জানাইয়া গেল।

পরদিন হানী দরবারে আসিল না। আব্দুল্লাহ যিয়াদ তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। হানী আসিলে আব্দুল্লাহ যিয়াদ তাহাকে ধমক দিয়া কহিলেন নির্বোধ বৃদ্ধ, নিজে বিপদ নিজেই টানিয়া আনিয়াছ। তুমি না এতদিন

পার্শ্বে এক দরিদ্র কুটীর। সেখান হইতে এক বৃদ্ধা রমণী বাহির হইয়া আসিয়া মুসলিমকে জিজ্ঞাসা করিল, কে তুমি বিদেশী একাকী এখানে বসিয়া আছ? কি জন্য এখানে আসিয়াছ? এখন বিপদের দিনকাল, এখনই হয়ত সরকারী পাইক আসিয়া তোমাকে ধরিয়া লইয়া যাইবে। মুসলিম কহিলেন, মা আমি এক রাত্রির আশ্রয় প্রার্থী। রমণী দয়াবতী ছিল। সে দরজা খুলিয়া মুসলিমকে ভিতরে লইয়া গেল।

গভীর রাত্রিতে বৃদ্ধার পুত্র বাড়ী আসিল। সে জিজ্ঞাসাপত্র করিয়া মুসাফিরের পরিচয় অবগত হইল। তারপর সে ছুটিয়া গিয়া আব্দুল্লাহ যিয়াদের কেল্লায় সংবাদ দিয়া আসিল। তাহার মা জানিতে পারে নাই। মুসিলম ও না। পরদিন প্রত্যুষে সরকারী লোকেরা আসিয়া মুসলিমকে বাঁধিয়া লইয়া গেল। আব্দুল্লাহ যিয়াদের আদেশে মুসলিম কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইলেন।

এই সংবাদে কুফাবাসীদের ভিতর পুনরায় চাঞ্চল্য দেখা দিল। দুর্গদ্বারে লোকে ভিড় জমিতে লাগিল। তাহারা মুসলিম ও হানীর মুক্তির জন্য দাবী করিতে লাগিল। ইবনে যিয়াদ তখন এ ব্যাপারে একটা চূড়ান্ত করিতে মনস্থ করিলেন এবং তাঁহার আদেশে জল্লাদ মুসলিম ও হানীর মস্তক কাটিয়া দুর্গ-শীর্ষ হইতে জনতার সম্মুখে গড়াইয়া দিল। জনতা এই নিষ্ঠুর পৈশাচিক কাণ্ড দেখিয়া ত্রাসে ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল।

মুসলিম ইমামের কাজে আসিয়া মৃত্যুবরণ করিলেন। কিন্তু তা'তে তাঁহার তত দুঃখ হয় নাই, যতটা হইয়াছিল কুফার এই আকস্মিক পট-পরিবর্তনের কথা ইমামকে জানাইতে না পারায়। তাঁহারই পত্র ইমামকে কুফার পথে টানিয়া আনিতেছে, আর এখানে আসিয়া তিনি বিশ্বাসঘাতক শত্রুদের কবলে পড়িয়া প্রাণ হারাইলেন, এই দুঃখই ছিল মুসলিমের পক্ষে মর্মান্তিক।(১)

---

(১) কোনও কোনও গ্রন্থে উল্লেখিত আছে মুসলিমের সহিত তাঁহার দুই কিশোর পুত্র কুফায় গিয়াছিল এবং তাহারা তথায় অতি নির্দয় ভাবে নিহত হইয়াছিল। কিন্তু এ কাহিনীর সত্যতা সন্দেহজনক। যে অবস্থায় মুসলিম গোপনে দৌত্য কার্য করিতে কুফায় গিয়াছিলেন তাহাতে দুইজন নাবালক পুত্রকে সঙ্গে লওয়ার কাহিনীর কোনও সঙ্গতি দেখা যায় না। খুব সম্ভব মহরমের শোকাবহ কাহিনীকে অধিকতর করুণ করিবার জন্য গল্পকারদের দ্বারা ইহা কল্পিত হইয়াছিল।

— — —

চতুর্থ অধ্যায়

ইমামের কুফা যাত্রা

মুসলিমের নিকট নিশ্চয়তা পাইয়া ইমাম হুসায়েন মক্কা হইতে কুফা যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইলেন। এই খবর প্রচারিত হইলে মক্কার ছোট বড় বহু ব্যক্তি আসিয়া ইমামের সহিত সাক্ষাৎ করিল এবং তাঁহাকে মক্কা ত্যাগ করিতে বারণ করিল। কুফাবাসীদের কথায় প্রত্যয় করা কেহই সমীচীন বলিয়া মনে করিল না। ইমাম কহিলেন, কুফাবাসীদের চরিত্র আমি জানি, কিন্তু এখানে থাকিলেও ইয়াযিদ আমাকে নিষ্কৃতি দিবে না। বরং আমি এখানে থাকিলে আমার জন্য মক্কার পবিত্র ভূমিতে রক্তস্রোত প্রবাহিত হইবে। হাদীস শরীফে আছে মক্কায় কোন এক সময় শোণিত স্রোত বহিবে। আমি সেই শোণিত পাতের কারণ হইতে ইচ্ছা করি না। ইয়াযিদের সঙ্গে আমার যে লড়াই হইবে তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। লড়াইয়ের অভিশাপ মক্কায় টানিয়া আমি আল্লাহ'র ঘরের বেইজ্জতি করিতে চাহি না।

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস কহিলেন, হে রসূল-বংশধর, আল্লা'র ঘরের আশ্রয় ছাড়িও না। তোমার পিতা মদিনা ত্যাগ করিয়া কি দুর্দশায় পতিত হইয়াছিলেন তাহা তোমার অবিদিত নাই। তুমি নিজেও দেখিয়াছ, কুফাবাসীরা কি প্রকার শঠতা করিতে পারে। তাহাদের কথায় কোনও বিশ্বাস নাই, কসমেরও কোন মূল্য নাই। তাহারা অত্যন্ত ছলনাকারী ও কাপুরুষ।

হুসায়েন কহিলেন, চাচা, আপনি যাহা বলিলেন সবই সত্য এবং আপনার আদেশ বহু মূল্যবান। কিন্তু মুসলিম যে লিখিয়াছে বার হাজার কুফী ইতিমধ্যেই আমার নামে বায়াৎ হইয়াছে। তা ছাড়া পর পর তাহাদের সম্ভ্রান্ত দূতসমূহ আসিতেছে। পত্র যে কত আসিয়াছে তাহার কোন ইয়াত্তা নাই।

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস কহিলেন, যদি একান্তই যাইতে চাও তবে পুত্রকন্যা ও পরিবার সঙ্গে লইবার দরকার নাই। কতিপয় পুরুষ যোদ্ধা সহ একাই তুমি যাও। কারণ কুফাবাসীগণ খিলাফৎ প্রদানের জন্য শুধু তোমাকেই চায়। আর ইহাও নিশ্চিত যে, ইয়াযিদের সঙ্গে যুদ্ধ তোমার হইবেই। সে ক্ষেত্রে পরিবার সঙ্গে লওয়া কিছুতেই সঙ্গত নহে। ভাবিয়া দিখ, ইয়াযিদের ঐশ্বর্য আছে, সৈন্যবল আছে, রাজকীয় ক্ষমতা আছে; তোমার কিছুই নাই। অর্থই সকল কার্যের মূল। অর্থ ব্যতীত শুধু ধর্মের জন্য কে তোমার পক্ষে যুদ্ধ করিবে?

ইমাম কহিলেন, আমি বিবেচনা করিতেছি। ইমামের বৈমাত্রেয় ভাই মুহম্মদ আল হানাফিয়া (মুহম্মদ হানিফা) অশ্রুসিক্ত নয়নে ইমামকে অনুরোধ করিলেন, আপনি আমাদিগকে ছাড়িয়া যাইবেন না। ইমামের অন্যান্য বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয় স্বজনেরাও তাঁহাকে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করিল। কিন্তু ইমাম কাহারও কথা শুনিলেন না। মৃত্যুর আহ্বান যেন 'নিশির ডাকের মত তাহাকে কুফার পথে ভুলাইয়া লইয়া চলিল। তিনি নিজেও মনকে এই বলিয়া প্রবোধ দিলেন যে, কুফার হাজার হাজার লোক আমাকে চায়। আমি তাঁহাদিগকে আল্লা'র রাস্তায় হেদায়েত না করিয়া নিজ প্রাণের মায়ায় ঘরের কোণে বসিয়া থাকিলে সে হইবে কাপুরুষতা। ইহার পর আল্লা'র কাছে কিবলিয়া জবাব দিব?

অতঃপর ইমাম আর কাল বিলম্ব না করিয়া মক্কা হইতে কুফার পথে যাত্রা করিলেন। হজ্জের মৌসুম তখন আগত, কিন্তু ইমাম সেজন্য দেরী করিলেন না, পাছে হজ্জের ভিতরই ইয়াযিদ মক্কা আক্রমণ করিয়া বসে। তাঁহার তো অসাধ্য কিছুই নাই। স্ত্রীপুত্র পরিজন সকলেই সঙ্গে ছুটিল। কাহাকেও বারণ করিয়া রাখা গেল না। আত্মীয় বন্ধু ও অনুগত্যেরাও অনেকে নাছোড়-বান্দা হইয়া ইমামের সঙ্গ লইল। ইমামের অল্পবয়স্কা পীড়িত কন্যা ফাতিমা ছোগ্‌রা যাইবার জন্য বায়না ধরিল। কিন্তু অসুস্থ বলিয়া ইমাম তাহাকে কিছুতেই সঙ্গে লইলেন না। বালিকা কত কাঁদিল, বলিল, আব্বাজান, তোমার ঐ দুইট চক্ষুই আমার ঔষধ। তুমি আমাকে দেখিলেই আমি ভাল হইয়া যাইব। তোমার স্নেহদৃষ্টি হইতে বঞ্চিত হইলে

আমি বাঁচিব না। ইমাম কহিলেন, মা, তুমি উম্মে ছাল্‌মার নিকট এখন থাক। পথের কষ্ট তোমার সহ্য হইবে না। তুমি আরাম হইলেই তোমাকে ডাকিয়া কাছে লইব। কিন্তু নিয়তি হয়ত তাঁহার অলক্ষ্যে তখন হাসিতেছিল। আত্মীয়, অনুগত, স্ত্রী-পরিজন ও দাসদাসী লইয়া মোট বিরাশীজন মানুষের এক ক্ষুদ্র কাফেলা ইমামের নেতৃত্বে ৩রা যিলহজ্জ মক্কা ত্যাগ করিল।

পথে বিপদ সঙ্কেত

মক্কা হইতে কুফা প্রায় আটশত মাইল দূর। রাস্তা চিরন্তন। কত উটের কাফেলা চলে সে পথে। কাজেই সে পথ সকলের পরিচিত সেই পথে চলিল ইমাম-পরিবার। কাফেলা দ্রুত অগ্রসর হইতে লাগিল। কয়েকদিন পথ চলার পর প্রসিদ্ধ কবি ফারযুকের সহিত ইমামের সাক্ষাৎ হইল। ইনি একজন নবী ভক্ত আরব ছিলেন। ইমাম তাঁহার নিকট কুফার অবস্থা জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি তাঁহার কবি-সুলভ ভাষায় উত্তর দিলেন, কুফাবাসিগণ আপনার সহিত, তাহাদের তলোয়ার শত্রুর কলেবরের সহিত, আর ভাগ্যের মীমাংসা আসমানের সহিত।

মরুময় হিজাযের পূর্ব সীমানা পার হইয়া কাফেলা ইরাকের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিল, তথাপি কুফার কোন সৈন্যদল বা নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ইমামকে অভ্যর্থনা করিয়া লইতে আসিল না। ইমাম চিন্তিত হইলেন। তবে কি মুসলিম তাঁহার রওয়ানা হওয়ার সংবাদ অবগত হন নাই।

আর কিছুদূর অগ্রসর হইয়া কাফেলা যখন সায়ালবিয়া নামক স্থানে উপনীত হইল তখন ইমাম মুসলিমের নিধন বার্তা ও কুফাবাসীদের ভাবান্তরের সংবাদ লোক মুখে অবগত হইলেন। এই দুঃসংবাদে ইমাম মর্মাহত হইলেন। তিনি তখন মদীনায় প্রত্যাবর্তনের কথা ভাবিতে লাগিলেন এবং সঙ্গীয় লোকদের সহিত এ বিষয়ে আলোচনা করিলেন। তাঁহাদের ভিতর শহীদ মুসলিমের পুত্র ও ভ্রাতৃগণ ছিলেন। তাঁহারা সকলে একবাক্যে বলিলেন, আমরা চাই মুসলিমের অন্যায় হত্যার প্রতিশোধ। হয় প্রতিশোধ, নতুবা জীবন বিসর্জন। বাঁচিয়া থাকিয়া এ মুখ দেশে গিয়া কাহাকে দেখাইব? ইহা শুনিয়া ইমাম ব্যথিত হইলেন এবং কাফেলার এই মুষ্টিমেয় সৈন্য সাহায্যে প্রতিশোধ গ্রহণ অসম্ভব জানিয়াও তিনি ইহাদের

মনোভাবের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্য গৃহে প্রত্যাবর্তনের ইচ্ছা পরিত্যাগ করিলেন। মুসলিম যে তাঁহারই কাজে আসিয়া জীবন হারাইয়াছে এ চিন্তা ইমামকে বিশেষ পীড়া দিতেছিল।

আরও কিছুদূর অগ্রসর হইলে ইমাম দেখিতে পাইলেন, পথিপার্শ্বে ময়দানে এক বিস্তৃত তাঁবু। উহার শীর্ষে একটি তলোয়ার ঝুলিতেছে, আর দ্বারে একটি তেজস্বী অশ্ব রজ্জুবদ্ধ রহিয়াছে। ইমাম কৌতুহলী হইয়া অনুসন্ধানে জানিতে পারিলেন, কুফার প্রসিদ্ধ সওদাগর আবদুল্লাহ কুফী এই তাঁবুতে অবস্থান করিতেছেন। ইমামের উপস্থিতির সংবাদ পাইয়া আবদুল্লাহ ইমামের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং বলিলেন, ইয়া ইবনে রসুল, আপনি প্রতারিত হইয়াছেন। কুফাবাসিগণ আপনার পক্ষ ত্যাগ করিয়াছে এবং সেখানে আপনার নিধনের আয়োজন সম্পূর্ণ। আমি এই সংবাদ বলিবার জন্যই এখানে আপনার প্রতীক্ষায় আছি। ইমাম কহিলেন, ভাই আব্দুলা তুমি যদি আমাকে প্রকৃতই ভালবাস তবে আমার সঙ্গে যোগদান কর না কেন, যাতে আপদে বিপদে আমার সাহায্য করিতে পার। আব্দুলা কহিলেন সে হয় না ইমাম। সমস্ত কুফা আপনার বিপক্ষে আর ইয়াযিদের সৈন্য সংখ্যা প্রচুর। সে ক্ষেত্রে আমি তাহাদের বিরোধিতা করিতে অক্ষম। আমাকে ক্ষমা করুন। তবে আমার তাঁবুশীর্ষে ঐ তলোয়ার, আর দ্বারে অশ্ব প্রস্তুত। আপনি যদি ইচ্ছা করেন উহা লইয়া পলায়ন করিতে পারেন। এই অশ্বের সমান তেজোগামী অশ্ব ইরাকে আর নাই, আর এই তলোয়ার দ্বারা শত্রুকে এক আঘাত বৈ দ্বিতীয় আঘাতের প্রয়োজন হয় না। কাজেই আপনাকে অনুসরণ করিয়া কেহ কৃতকার্য হইতে পারিবে না। কিন্তু ইমাম এরূপে পলায়ন করা কাপুরুষতা মনে করিয়া আব্দুল্লা'র প্রস্তাব সরাসরি প্রত্যাখ্যান করিলেন। কাফেলা সম্মুখ পানে আগাইয়া চলিল।

ইমাম নানা দুশ্চিন্তায় বিব্রত। যন্ত্র চালিতের মত কেবল আগাইয়াই চলিয়াছেন কিন্তু কোথায় যাইবেন, কি করিবেন, কিছুরই যেন স্থিরতা

নাই। সমস্তই চোখের সম্মুখে ঝাপসা হইয়া আসিতেছে। কুফায় গিয়া কোনও ফল নাই, ইহা নিশ্চিত। আবার, এত অল্প লোক লইয়া ইয়াযিদ সৈন্যের মোকাবেলা করাও নিরর্থক। অথচ যাইবেনই বা কোথায়? ইতোমধ্যে হোর নামক এক সেনাপতির সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল। হোর ইয়াযিদ পক্ষীয় সেনাপতি। তিনি এক হাজার সৈন্য লইয়া ইমামের গতিরোধ করার জন্য পথ আগলাইয়া আছেন। এইক্ষণে সামান্য কয়েক জন অনুচর লইয়া তিনি সম্মুখ পথঘাট পর্যবেক্ষণে বাহির হইয়াছিলেন। তিনি ইমামকে সালাম জানাইয়া আদবের সহিত বলিলেন, ইয়া সৈয়দ, আপনি আর অগ্রসর হইবেন না। কুফা আর আপনাকে চায় না। আপনি দক্ষিণে অথবা বামে পথ দেখুন। কিন্তু মদীনার পানে যাইবেন না। সে পথ আপনার জন্য এখন বিপদ সঙ্কুল। আব্দুল্লাহ যিয়াদের নিয়োজিত প্রধান সেনাপতি ওমর বিন সা'দ সসৈন্যে আপনার দিকে আসিতেছেন। তাঁহার পৌছিবার বেশি বিলম্ব নাই। আর মদিনার রাস্তায় সতর্ক প্রহরী সমূহ বিভিন্ন মঞ্জিলে মোতায়েন রহিয়াছে। আপনি হয়ত জানেন না, যেদিন আপনি ইরাকের সীমান্ত অতিক্রম করিয়াছেন সেইদিন হইতে আপনার গতিবিধি প্রত্যহ গুপ্তচর মারফৎ আব্দুল্লাহ যিয়াদের গোচরীভূত হইতেছে। আপনি আমার কথায় বিশ্বাস করুন আমি ইয়াযিদের বেতনভোগী হইলেও মনে প্রাণে নবীবংশকে শ্রদ্ধা করি।

ইমামের কাফেলা তখন উত্তর-পূর্ব দিকে কুফা অভিমুখে অগ্রসর হইতেছিল। তিনি জানিতেন না যে, আব্দুল্লাহ যিয়াদ তাঁহার আগমন বার্তা পূর্বেই অবগত হইয়াছেন এবং সমস্ত রাস্তায় সৈন্যমোতায়েন করিয়াছেন। অগত্যা তিনি কুফার রাস্তা ত্যাগি করিয়া বাম দিকের পথ ধরিলেন এবং ক্রমাগত উত্তর মুখে চলিতে লাগিলেন। কিন্তু সেনাপতি হোর তাঁহার সঙ্গে সঙ্গেই চলিলেন। তিনি ইমামকে বলিলেন, আমার উপর আব্দুল্লাহ যিয়াদের হুকুম, আপনাকে বন্দী করা। কাজেই আমি এ অবস্থায় প্রকাশ্যে আপনাকে ছাড়িয়া দিতে পারি না। তা দিলে আমার গর্দান যাইবে। রাত্রির অন্ধকারে আপনি কাফেলা সহ অন্যদিকে চলিয়া যাইবেন, যেন আমি কিছুই জানিতে পারি নাই।

হোরের কথায় ইমাম দারুণ সন্দেহে নিপাতিত হইলেন। হোর শত্রু কি মিত্র কিছুই বোঝা গেল না। কাফেলা আরও আগাইয়া চলিল। সন্ধ্যা সমাগমে তাঁহারা কুফা হইতে প্রায় ৪০ মাইল উত্তর-পশ্চিমে, ফোরাতের পশ্চিম তীরে এক বিস্তীর্ণ ময়দানে উপনীত হইলেন। অন্ধকারে দিকমণ্ডল আচ্ছন্ন হইয়া আসিল। আর পথ দেখা যায় না। অগত্যা কাফেলা সেইখানে বিশ্রাম করিতে থামিল।

হোর অন্ধকারে অদৃশ্য হইয়া গেলেন। অধিক রাত্রিতে নক্ষত্রালোকে ময়দানে বালুকারাশি যখন কিঞ্চিত আভাযুক্ত হইল তখন কাফেলা পুনরায় ভিন্নপথ ধরিয়া চলিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু সেই সীমাহীন বিস্তৃতির ভিতর নকীবেরা কিয়ৎকাল পরেই দিগ্‌ভ্রান্ত হইল। সমস্ত রাত্রি ঘুরিয়া ফিরিয়া প্রভাতলোকে তাহারা দেখিতে পাইল, সন্ধ্যার পর যে স্থান হইতে তাহারা নির্গত হইয়াছিল, পুনরায় সেই স্থান তাহাদের সম্মুখে দৃষ্টিগোচর হইতেছে। অদূরে ফোরাত নদী। নির্জন ময়দান। কৃচিৎ নদী তীর দিয়া দুই একটি মনুষ্য মূর্তির আনাগোনা দেখা যায়। প্রাতে একজন পথিক লোককে ডাকাইয়া ইমাম জিজ্ঞাসা করিলেন, এই স্থানের নাম কি? লোকটি বলিল, মারিয়া। ইমাম কহিলেন, এই স্থানের আর কোনও নাম আছে? লোকটি উত্তর করিল, ইহাকে লোকে 'কারবালা' ময়দানও বলিয়া থাকে। শুনিয়া ইমামের শরীর রোমাঞ্চিত হইল। এই সেই কারবালা। সহিসেরা কাফেলা অন্যত্র লইবার চেষ্টা করিল। কিন্তু উষ্ট্র ও অশ্বগুলিকে আর একপদও অগ্রসর করান গেল না। ক্লান্ত পশুগুলি সেই যে শুইয়া পড়িল মনে হইল তৃষিত মরুর শুষ্ক রসনা যেন এক রাত্রিতে তাহাদের জীবনী শক্তি শুষিয়া লইয়াছে। অগত্যা ইমাম সেই স্থানেই শিবির সন্নিবেশ করিতে আদেশ দিলেন।

আফ্রিকায় ফাতেমীয় সাম্রাজ্য ও খিলাফৎ প্রতিষ্ঠা

ইসমাইলী প্রথম ইমাম মুহম্মদ বিন ইসমাইল পরলোক গমন করিলে, তাঁহার পুত্র যাফরকে ইসমাঈলিগণ "আল মুসাদ্দিক" উপাধি দিয়া তাঁহার স্থলে গদী-নেশীন ইমাম করে। ইঁহাদেরই এক বংশধর মুহম্মদ আল হাবীব যখন ইসমাইলীদের গদী-নেশীন ইমাম, সেই সময় ইসমাইলীদের ধর্মীয় প্রচারণা রাজনীতির খাতে প্রবাহিত হয় এবং অচিরে বিপ্লবী রূপ গ্রহণ করে। মুহম্মদ আল হাবীব ছিলেন আব্বাসীয় নেতা মুহম্মদের মত অত্যন্ত তেজস্বী পুরুষ। তিনি যেমন সাহসী ছিলেন, তাহার বুদ্ধিও ছিল তেমনি প্রখর। এরূপ ব্যক্তির উচ্চাকাঙ্খী হওয়া স্বাভাবিক। তিনি ইরাকের উত্তর সীমান্তে অবস্থিত এমিসা (গ্রীক নাম হেমস) শহরের অনুতিদূরে সালামিয়া নামক স্থানে গোপনে বাস করিতেন। ইরাক ও পারস্যের মধ্যবর্তী এইস্থানে ইসমাইলী শিয়াদের বৃহত্তম শক্তিকেন্দ্র। এইখান হইতো ইরাক-আযমের সকল শিয়াকেন্দ্রের সহিত যোগাযোগ রক্ষা করা সহজ এবং অপেক্ষাকৃত নিরাপদ ছিল। সালামিয়ার এই গোপন আশ্রম হইতে ইমাম মুহম্মদ বিভিন্ন দেশে তাঁহার প্রচার পাঠাইতেন।

খলীফা মুতামীদের রাজত্বকালে, ইমাম মুসা আল কাযেমীর বংশধর ইমাম হাসান আল আশকারী যখন সামার'র বন্দীশিবিরে দেহত্যাগ করেন, ঐ সময় হইতে ইসমাইলগণ তাহাদের ইমাম মুহম্মদ আল হাবীবের নেতৃত্বে বিপুল উদ্যমে তাহাদের দলগত প্রচারণায় আত্মবিয়োগ করে। বিবি ফাতিমার একজন শক্তিমান বংশধরের পক্ষে জনগণের সমর্থন লাভ তখনকার দিনে কঠিন ছিল না। অল্প দিনের ভিতর হিজায, ইমেন, বাহরায়েন, সিন্ধু প্রদেশ, মিশর ও উত্তর আফ্রিকায় ইমাম মুহম্মদের বিপুল সংখ্যক সমর্থক জুটিল। পরবর্তী খলীফা মুতাযিদ বিল্লা'র শাসন আমলে (৮৯২-৯০২ খৃঃ)। ইসমাইলীদের দ্যম বিশেষ ভাবে সাফল্য মণ্ডিত হয়। এই সময়ই সালামীয়ার

কার্য নহে। তোমার পিতা আলীও তাহা পারেন নাই। তাই তাহার আমলে কেবল ঝগড়া–ফ্যাসাদ আর যুদ্ধবিগ্রহ চলিয়াছে। তুমি অবাধ্য হইলে তোমার সঙ্গে যুদ্ধ অবশ্যাম্ভাবী। যুদ্ধে ফলাফল অনিশ্চিত। তবে খুন–খারাবী যে যথেষ্ট হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। অতএব তুমি এইবেলা রাজ্য লালসা ত্যাগ করিয়া ইয়াযিদের আনুগত্যতা স্বীকার কর। আমি ইচ্ছা করি না যে, তুমি আমার হস্তে নিহত হনও(১)

উত্তরে ইমাম লিখিলেন, ওমরু, আমি তিনটি প্রস্তাব করিতেছি' হয় আমাকে মদীনায় ফিরিয়া যাইতে দাও, আমি সেখানে গিয়া নির্জনে আল্লা'র নাম জপ করিয়া বাকী জীবন কাটাইয়া দিব। অথবা, আমাকে কোনও দূরদেশে যাইতে দাও, সেখানে আমি ইসলামের জন্য আমরণ জিহাদ করিব। আর না হয় আমাকে তোমাদের খলিফা ইয়াযিদের নিকট লইয়া চল, তিনি আমার সম্বন্ধে যেরূপ ভাল মনে করেন সেইরূপ ব্যবস্থা করিবেন।

ওমর কহিলেন, আচ্ছা আমি আবদুল্লাহ যিয়াদকে সমস্ত কথা লিখিয়া জানাইতেছি। সেখান হইতে সম্মতি আসিলেই সমস্ত পরিষ্কার হইয়া যাইবে।

আব্দুল্লাহ যিয়াদ ইহার উত্তরে ওরমকে লিখিলেন– পহেলা দফা, তুমি হুসায়েনকে আমার সম্মুখে উপস্থিত কর। সে আমার হস্তে ইয়াযিদের নামে বায়াৎ হইবে। তারপর আমার মারফৎ সে ইয়াযিদের নিকট প্রেরিত হইবে।

ওরম এই পত্রের মর্ম ইমামকে অবগত করাইলেন। ইমাম ইবনে যিয়াদের এই ধৃষ্টতাপূর্ণ জবাবে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন এবং বলিয়

(১) ওমর ছিলেন ক্যাডেসীয় যুদ্ধের বিজয়ী বিখ্যাত সেনাপতি সা'দ বিন ওক্কাসের পুত্র। সা'দ বিন ওক্কাস ছিলেন হযরত রসূলের একজন সাহাবী। খলিফা ওমর মৃত্যু কালে তাহার উত্তরাধিকারী নির্বাচনের জন্য যে পঞ্চায়েত নিযুক্ত করেন এসই সালিসী প্রধানদের মধ্যে সা'দ ছিলেন অন্যতম। গোড়ার দিকে ওমর ইমাম বিদ্বেষী ছিলেন না। আব্দুল্লাহ যিয়াদ বহু অর্থ দিয়া এবং মক্কা–মদীনার গভর্নরের পদে স্থায়ী ভাবে তাঁহাকে অর্পন করিবেন এই রূপ ওয়াদা করিয়া কারবালাযুদ্ধে নেতৃত্ব গ্রহণের তাঁহাকে বাধ্য করেন।

পাঠাইলেন, –ইবনে যিয়াদ কে যে আমার নিকট হইতে সে বায়াৎ গ্রহণের অভিলাষ করে? ইয়াযিদ আমার আত্মীয়, আমি তাহার নিকট যাইতে পারি, কিন্তু ইবনে যিয়াদেন নিকট কখনই নয়। তাহার যদিও কোন লাভের আশা থাকে সে কোন বিশ্বস্ত লোককে আমার সাথে পাঠাইতে পারে। আর, তোমারা যদি আমার কোনও প্রস্তাবেই রাজী হইতে না পার, তবে আমার একার জীবন লইয়া আমার সঙ্গীয় অপর সকলকে ফিরিয়া যাইতে দাও। তাহারা তো কোনও অপরাধ করে নাই।

ওরম ইহাও আবদুল্লাহ যিয়াদকে লিখিয়া পাঠাইলেন। তিনি উত্তরে বলিলেন, –না কখনই না। হুসায়েনকে অগ্রে আমার নিকট বায়াৎ হইতে হইবে।, তারপর অন্যকথা।

পহেলা মহররম ইমাম কারবালায় পৌছেন। এই সব চিঠিপত্র আদান-প্রদান সাতদিন কাটিয়া গেল। অষ্টম দিবসে আব্দুল্লাহ যিয়াদ বিরক্ত হইয়া ওমরকে লিখিলেন, তোমাকে কি যুদ্ধ করিতে এবং হুসায়েনের মস্তক আনিতে পাঠাইয়াছি, না এই সকল বাহুল্য আলাপ করিয়া সময় নষ্ট করিতে পাঠাইয়াছি? এই পত্র পাওয়া মাত্র হয় হুসায়েনকে বন্দী করিয়া আনিবে, না হয় তাহার ছিন্নশির আমার নিকট পাঠাইবে। আব্দুল্লাহ দূতকে বলিয়া দিলেন, যদি ওমর এই পত্র পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধে অগ্রসর না হয় তবে তাহাকে জানাইও তাহাকেও কয়েদ করা হইবে এবং তাহার স্থলে অন্য সেনাপতি নেতৃত্ব গ্রহণ করিবে। দূত রওয়ানা হইয়া গেল। আব্দুল্লাহ যিয়াদ শিমার বিন যিল্-জওশনকে ডাকাইয়া কহিলেন, ওমর বড় শৈথিল্য ও বিশ্বাস ঘাতকরা করিতেছে। সে অন্তরে হুসায়েনর পক্ষে, প্রকাশ্যে আমার অধীন। তুমি অদ্যই কারবালা রওয়ানা হইবে। কাসেদ ইতিপূর্বে চলিয়া গিয়াছে। যদি আমার পত্রানুযায়ী কাজ শুরু না হইয়া থাকে তবে ওমরকে বন্দী করিবে এবং নিজে কার্যোদ্ধার করিবে। হুসায়েনের কর্তিত মস্তক আমি তোমার নিটক চাই।

আটই মহরম সন্ধ্যায় শিমার রওয়ানা গেল এবং নয়ই তারিখে আসরের সময় ওমরের সৈন্যদলে যোগদান করিল। তখনই সে যুদ্ধ আরম্ভ করিতে চাহিল। কিন্তু ওমর ইতোপূর্বেই কাসেদের পত্রানুযায়ী সৈন্যদলকে

যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইতে হুকুম দিয়াছিলেন। এবং ইমামের নিকট সংবাদ পাঠাইলেন যে, ইবনে যিয়াদেন উত্তর আসিয়াছে, যুদ্ধ ভিন্ন অন্য কোনও পথ নাই; পরদিন প্রভাতেই যুদ্ধ শুরু হইবে, ইমাম যেন প্রস্তুত থাকেন। ওমর যে কথা শিমারকে জানাইয়া তখনকার মত তাহাকে নিরস্ত করিলেন।

আব্দুল্লাহ ইবনে যিয়াদেন হুকুম ছিল, ফোরাতের পানি দখলে লইবে যাহাতে হুসায়েন পক্ষ কিছুতেই পানি না পায় এবং তৃষ্ণাকাতর হইয়া হুসায়েন আত্মসমর্পণে বাধ্য হইবে। এই আদেশ অনুযায়ী নয়ই মহরম প্রত্যুষে ইবনে হিযায নামক একজন সেনাপতি পাঁচশত সৈন্যসহ ফোরাত তীরে প্রেরিত হইয়াছিল। তাহারা ফোরাত তীর ঘিরিয়া ফেলে এবং ইমাম শিবিরের পানি সংগ্রহের পথ বন্ধ করে দেয়। নদীতীর বেষ্টিত হইতে দেখিয়া ইমাম প্রমাদ গণিলেন এবং আপন চাচাত ভাই আব্বাস আলমদারকে পাঁচজন অনুচর সহ নদীতীরে প্রেরণ করিলেন প্রয়োজনীয় পানি সংগ্রহ করিতে, যাহাতে পরদিন যুদ্ধাবসান পর্যন্ত শিবিরে পানির অভাব না ঘটে। আব্বাস নদীতীরে যাইতেই শত্রু পক্ষের সহিত সংঘর্ষ বাধিল। অনুচরগণ নিহত হইল। আব্বাস আহত অবস্থায় শিবিরে প্রত্যাবর্তন করিলেন। পানির কোনও যোগাড় হইল না। পূর্বের আনীত পানি ইতিমধ্যেই শেষ হইয়া গিয়াছিল। দারুণ গ্রীষ্মে পিপাসার বেগ ছিল অদম্য শিবির বাসীদের দুর্ভাবনার সীমা রহিল না। নারী ও শিশুরা ক্রন্দন করিতে লাগিল। ক্ষণে ক্ষণে আল্ আ'তাশ, আল্ আ'তাশ(পিয়াস, পিয়াস) এই কারতশব্দ খীমার ভিতর হইতে শ্রুত হইতে লাগিল।

দশই মহররম-আশুরার রাত্রি

নয়ই মহররমের দিবাগত রাত্রিকে "আশুরার রাত্রি বলা" হয়। ঐ রাত্রি হইতে আরবী দশই মহরম শুরু। ইমাম শিবিরেরর পক্ষে উহা ছিল সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ রজনী। পানির অভাবে রাত্রিতে কাহারও আহার হইল না। আহারে কাহারও প্রবৃত্তিও হইল না। মৃত্যু আসন্ন জানিয়া সকলেই সমস্ত রাত্রি উপাসনায় কাটাইল। সবার মুখে কলেমা শাহাদাৎ। সুবেহ সাদেকের প্রথম আভা পূর্বাকাশে প্রস্ফুট হওয়া মাত্র শিবিরবাসিগণ ফজরের নামাজের জন্য প্রস্তুত হইল। শুষ্ককণ্ঠেই সকলে প্রাণ ভরিয়া আল্লাহকে ডাকিয়া লইল। ক্রমে ঐতিহাসিক দশই মহররমের রক্তিম সূর্য পূর্বগগনে উদিত হইল। বিস্তৃত মরুর বুকে রক্তের আভা ছড়াইয়া গেল। উভয় পক্ষের শিবির শ্রেণীর চূড়ায় চূড়ায় রক্তের লালিমা সেই ভয়াবহ দিবসের পূর্বাভাস জানাইয়া দিল। ইমাম তাঁহার পুরুষ সঙ্গিগণকে সমবেত করিয়া সকলের বুকে বুক মিলাইলেন এবং কহিলেন, ভাই সব তোমাদের যাহা কর্তব্য ছিল তাহা তোমরা সম্পূর্ণ করিয়াছ। এখন মহা পরীক্ষার দিন উপস্থিত। শত্রুগণ অসংখ্য। আমি জানিতাম না যে, এখানেই আমাদিগকে যুদ্ধ করিতে হইবে। আমি নিজের জীবনের মায়া কাটাইয়াছি। আমি মরিব। কিন্তু তার আগে তোমাদিগকে আমার বায়াৎ দিতেছি। যাহার যাহার ইচ্ছা শিবির ত্যাগ করিয়া প্রস্থান কর। কেননা শত্রুরা শুধু আমাকেই চায়। তোমাদের সঙ্গে তাহাদের কোন বিরোধ নাই। তোমরা যাও কেহ কিছু বলিবে না। স্বেচ্ছায় কেহ নিজ জীবন মৃত্যুর মুখে তুলিয়া দিও না। আমি চাইনা যে, আমার কারণে তোমরা কেহ ধ্বংশের মুখে পতিত হও।

উচ্ছ্বসিত করুণায় ইমামের দু'নয়ন ছল ছল করিতেছিল। সঙ্গিয় বীরগণ রমণীগণ, গোলাম গণ, ভৃত্যগণ সকলেই উত্তর করিল- প্রভু, একি

বলিতেছেন? আমরা কি এই সময় রসুলের বংশধরকে বিপদের মুখে তুলিয়া দিয়া স্ব স্ব জীবন লইয়া পলায়ন করিতে পারি? আপনি তো নিঃসন্দেহে আমাদিগকে মুক্তি দিলেন, কিন্তু কিয়ামতের দিন আপনার নানা হযরত রসুলকে আমরা কি বলিয়া মুখ দেখাইব? সেদিন কি এই বলিব, হে রসুল, আমরা কি সেই সব ব্যক্তি যারা তোমার বংশধরকে সঙ্গে লইয়া গিয়া মৃত্যুর মুখে নিক্ষেপ করিয়া স্ব স্ব জীবন লইয়া পলায়ন করিয়াছিল? আমরা আল্লা'র নামে শপথ করিয়া বলিতেছি, কিছুতেই আমরা এই রণস্থল হইতে মুখ ফিরাইব না। আপনি আমাদিগকে লড়াই করিতে হইবে বলিয়া আনেন নাই বটে, কিন্তু আমরা তো লড়াই এর জন্য প্রস্তুত হইয়াই আসিয়াছি। আমরা কাফনের বস্ত্র পরিধান করিয়া আছি এবং অস্ত্রোপরে মস্তক রক্ষিত করিয়াছি। আমরা আজ আপনার জন্য নিজদিগকে কোরবান করিব। যতক্ষণ আমরা সকলে নিহত না হই ততক্ষণ পর্যন্ত শত্রুরা আপনার নিকট আসিতে পারিবে না। সাধ্য কি আমরা জীবিত থাকিতে শত্রুগণ রসুলের বংশধরের অঙ্গে অস্ত্রাঘাত করে। আমাদের এই জীবন আমরা আল্লাহ্ ও রসুলের নাম উৎসর্গ করিয়া দিয়াছি। আপনার ইজ্জত রক্ষার জন্য। এই বলিয়া সকলে "আল্লাহ্ আকবর" রবে ভীষণ ধ্বনি করিয়া উঠিল এবং শেষ বিদায়ক্ষণ নিশ্চিত জানিয়া একান্ত মনে তক্‌বীর পাঠ করিতে লাগিল।

ইমাম ইহাদের আত্মত্যাগের মহোৎসাহ দর্শনে মমতায় বিগলিত হইলেন। অশ্রুবিন্দু বাঁধ ঠেলিয়া নয়নের কোণে ভাসিয়া উঠিল। তিনি গদগদ কণ্ঠে কহিলেন, বিশ্বাসী ভাইসব, প্রাণাধিক বন্ধুসব, তোমাদিগকে আল্লাহ পুরস্কৃত করুন, এই আশীর্বাদ করি। তোমাদের এই আত্মত্যাগ যেন আল্লা'র দরবারে শহীদের মৃত্যু বলিয়া মঞ্জুর হয় এবং কিয়ামতের ময়দানে আল্লাহ্ যেন তোমাদিগকে গৌরবান্বিত করেন, এই প্রার্থনা করি।

এ দিকে খীমার ভিতর পানির অভাব ক্রমশঃ অধিকতর তীব্রভাবে অনুভব হইতেছিল। যাত্রীরা সমস্ত রাত্রি পানির সাক্ষাৎ পায় নাই। পূর্বদিবসেও অনেকেই পানি পায় নাই। শিশুগণ পানির পিপাসায় অস্থির হইয়া কাঁদিতেছিল। ইমাম ভিতরে গিয়া সকলকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন,

শিশুগণের ক্রন্দন থামাও, কারণ শত্রু অতি নিকট, তাহারা আমাদের দুরাবস্থা বুঝিতে পারিলে আরও উৎসাহিত হইয়া উঠিবে। এবং আমার সৈন্যগণের বুকের বল কমিয়া যাইবে। এই বলিয়া তিনি আকাশের দিকে তাকাতেই প্রার্থনা করিলেন, হে আল্লাহ, যাহারা আমাকে এমন করিয়া প্রতারিত করিল এবং আমার বায়াৎ ভঙ্গ করিয়া আমাদের সর্বনাশ করিল তাহাদের বিচার তোমার হস্তে রহিল। তুমি সকল প্রতিকারের মালিক।

অতঃপর ইমাম সঙ্গীয় বীরগণকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে বলিয়া নিজে যুদ্ধসাজ পরিধান করিলেন। মাথায় বাঁধিলেন নবীর আমামা, গায়ে পরিলেন নবীর অঙ্গের জামা। কোমরে 'পরিলেন' হাসানের প্রিয় কটিবন্ধ; আর তার সঙ্গে দুলিল আলীর প্রদত্ত কোষবদ্ধ জুলফিকার। পৃষ্ঠে ঢাল, বাম করে বর্শা, উন্নত বপু। এই মূর্তিতে ইমামকে দেখিলে কে বলিতে পারিত, ইনিই সেই মদিনার মসজিদে তাসাউফের ব্যাখ্যাকারী সিদ্ধপুরুষ হুসায়েন! এমনই ছিল সে কালের বীর মুযাহিদ ও আউলিয়াদের শিক্ষা ও জীবনাদর্শ! দামামার সুর বাজিতেছিল। তৃষ্ণাকাতর অশ্বগুলি সে সুরে তৃষ্ণা ভুলিয়া নৃত্যের তালে পা তুলিতেছিল। অদুরে বীর সেনারা সজ্জিত হইয়া তাহাদের নেতার আদেশের অপেক্ষা করিতেছিল। অসি, বল্লম, ঢাল, গোর্জ, যাহার যাহা ছিল লইয়াই তাহারা প্রস্তুত হইয়াছিল। ইমাম তাঁহার প্রিয় অশ্ব দুলদুলে সওয়ার হইলেন। বদনে উজ্জ্বল কান্তি, মস্তকে ঈষৎ-পক্ক লম্বিত কেশ, চিবুকে ধূসর-শ্মশ্রু, অক্ষির পিঙ্গল তারকায় গভীর মর্মভেদী দৃষ্টি। সমস্ত মিলিয়া ইমামকে এমনই সৌম্যদর্শন ও মহীয়ান করিয়া তুলিতেছিল যে, ভক্ত ও অনুচরদের প্রাণ তাহাতে অপূর্ব উন্মাদনায় মাতিয়া উঠিল। ক্ষণিকের তরে তাহারা ক্ষুধা-তৃষ্ণা ও চিন্তা-ভাবনা বিস্মৃত হইল। ঘন ঘন "আল্লাহ আকবর" রবে তাহারা রণক্ষেত্র কাঁপাইয়া তুলিল।

অশ্বারূঢ় ইমাম আপন সৈন্য ও অনুচরগণকে সারিবদ্ধ করিয়া ব্যূহ রচনা করিলেন। ব্যূহ আর কি? চল্লিশজন অশ্বারোহী আর চৌত্রিশ জন পদাতিকের এক ক্ষুদ্রদল। তার মধ্যে কতক ছিল গৃহভৃত্য ও গোলাম এবং কতক ছিল উষ্ট্র-অশ্বের সহিস ও রাখাল (১)। যোদ্ধাগণকে দক্ষিণে ও

বামে সন্নিবিষ্ট করিয়া মধ্যস্থলে ইমাম নিজের জন্য স্থান নির্ধারিত করিলেন। সৈন্যগন শ্রেনী বদ্ধ হইলে ইমাম অশ্ব ছাড়িয়া উটনীতে আরোহন করিলেন এবং যুদ্ধ বিরতির শেষ চেষ্টা সম্পন করিতে শত্রু ব্যূহের সম্মুখনি হইলেন।

ইমাম তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,-হে নবীর উম্মতগন, যাহারা জান এবং যাহারা জান না, সকলকেই আমি জানাইতেছি আমিই রসুলুল্লা'র নাতি ও মহাবীর আলির পুত্র হুসায়েন। জগৎমাতা ফাতিমা আমার জননী। আমি সেই হুসায়েন যাহার সম্বন্ধে হযরত রসুল বলিয়াছেন যে, আমি বেহেশতের যুবকগণের সর্দার হইব এবং আমার বেহেশতে দাখিল আল্লাহ কর্তৃক অঙ্গীকৃত। আমি জীবনে কখনও মিথ্যা কথা বলি নাই, নামাজ লঙ্গন করি নাই, কখনও কোনও বিশ্বাসীর মনে কষ্ট দেই নাই। তোমরা কি সেই হুসায়েনকে আজ স্বহস্তে কাটিতে আসিয়াছ? তোমাদের কি হইয়াছে যে, তোমরা তোমাদের প্রিয় পয়গম্বরের প্রিয় দৌহিত্রকে বধ করিবার জন্য সকল উম্মত্ত হইয়াছ? তোমদের মনে কি আল্লাহ হইতে ডর নাই? রসুলের কথা স্মরণ করিয়া কি তোমাদের মনে শরম বিবেচনা হয় না? আমি তো জীবনে কাহাকেও হত্যা করি নাই, কাহারও কোনও প্রকার ঋণ অপরিশোধিত রাখি নাই এবং আমার উপর কাহাও দ্বেষ নাই। তবে কেন, কোন অযিলায়, তোমরা আমার হত্যাকে 'হালাল' বলিয়া মানিয়াছ? আমি তো দুনিয়ার বাদশাহীর মায়া কাটাইয়া মদীনায় নবীর রওযায় আল্লা'র ধ্যানে রত ছিলাম। শত্রুগণের অত্যাচারে আমি মদীনা ছাড়িয়া মক্কায় গেলাম ও আল্লা'র ঘরে আশ্রয় নিলাম। তারপর তোমরা কুফাবাসিগণই তো পুনঃ পুনঃ পত্র লিখিয়া ও দুতের পর দুত পাঠাইয়া আমাকে ডাকিয়া আনিয়াছ আমার নামে বায়াৎ স্বীকার করিতে। যখন আমি

(১) কোনও কোন বর্ণনায় দেখা যায়, ইমাম-শিবিরে নারী শিশু ভৃত্য ইত্যাদি লইয়া সর্বমোট লোক সংখ্যা ছিল দুইশত। সম্ভবতঃ মক্কাত্যাগের পর পথিমধ্যে কাফেলার কিছু দল-পুষ্টি হইয়াছিল। সে রূপ হইয়া থাকিলে ইমামের যোদ্ধা সংখ্যা হয়ত ৭৪ জনের কিঞ্চিৎ অধিক হইবে। কিন্তু তথাপি ইয়াযিদ সৈন্যের তুলনায় উহা যে নগণ্য ছিল তাহা বলাই বাহুল্য।

আসিলাম তখন তোমরা শুধু বিশ্বাস ভঙ্গ কর নাই। অধিকন্তু, আমাকে বধ করিবার জন্য কোমর বাঁধিয়া দাঁড়াইয়াছ। আজ আমি তো মাদিগকে সেই কথা বলিতেছি যাহা বলিয়া হযরত মুসা ফেরাউনকে আহবান করিয়াছিলেনঃ জগৎ-পিতা আল্লা'র নিকট হইতে আমার ও তোমাদের জন্য করুণা ভিক্ষা করিতেছি। যদি তোমরা আমার কথায় ঈমান না আন তবে অনুমতি দাও আমি তোমাদের নিকট হইত চলিয়া যাই। আমাকে যাইতে দাও। যদি আমাকে সহায়তা করিতে না পার অন্ততঃ আমাকে হত্যা করিও না। আমাকে পথ ছাড়িয়া দাও, আমি আল্লার কা'বা ঘরে অথবা নানার রওযায় ফিরিয়া যাই এবং সেখানে আল্ল'র ধ্যানে বাকী জীবন কাটাইয়া দেই। আখেরে মীমাংসা হইবে, সত্য পথে কে ছিল?

কুফাবাসিগণ এই আহ্বান শুনিল, কিন্তু কেহই কোনও উত্তর করিল না। কিছু কাল উত্তরের প্রতীক্ষায় থাকিয়া ইমাম পুনরায় কহিতে লাগিলেন। -আল্লা'র শোকর যে আমি আমার কর্তব্য পালন করিতে পারিয়াছি। আমি এখন আল্লা'র সামনে বে'কসুর। কর্তব্য ভঙ্গের দোষে আর দায়ী থাকিব না।

তৎপর কুফার যে সমস্ত জননেতা ইমামকে পত্র প্রেরণ করিয়াছিল, একে একে তাহাদের নাম করিয়া ইমাম কহিতে লাগিলেন, তোমরাই না আমাকে পত্র লিখিয়াছিলে ও কুফায় আসিতে আহবান করিয়াছিলে? আজ তোমরাই আমাকে হত্যা করিতে আসিয়াছ? কেহ কোনও জবাব দিল না। সেনাপতি ওমর বিন সা'দ স্বয়ং এই পত্র লেখকদের মধ্যে একজন ছিলেন। কিন্তু এইক্ষণে তিনিও নিরুত্তর রহিলেন। ইমাম রহিলেন। ইমাম তখন আকাশের পানে হাত তুলিয়া মোনাযাত করিলেন,-ইয়া ইলাহি, আমি সঙ্কটাপন্ন, তুমিই আমার একমাত্র ভরসা। তুমি তোমার কর্তব্য পালন কর।

প্রার্থনা শেষ করিয়া ইমাম নিজ ব্যুহে ফিরিয়া আসিলেন এবং উটনী হইতে অবতরণ করিয়া পুনরায় অশ্বপৃষ্ঠে সওয়ার হইলেন। তিনি নিজে যুদ্ধারম্ভ করার দুর্নাম লইলেন না; শত্রু পক্ষ হইতে প্রথম অস্ত্র ক্ষেপণের প্রতীক্ষায় থাকিলেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়

কারবালার যুদ্ধ

ইমামের মর্মস্পর্শী আবেদনের পর ইয়াজিদ বাহিনীতে কিছুক্ষণের জন্য নিস্পন্দ ভাব বিরাজ করিল। তারপর চলিল কানাকানি ও গড়িমসি। কে আগে ইমামের উপর অস্ত্র নিক্ষেপ করিয়া গোনাহ্গারের ভাগী হইবে, ইহাই হইল সমস্যা। সেনাপতি হোর ওমরকে বলিল, হে ওমর, অর্থের লালসায় আমরা কি পরকাল হারাইব? চল, ইমামকে ছাড়িয়া গৃহে ফিরিয়া যাই। ওমর কহিল, তুমি কি পাগল হইয়াছ? ইমামকে বন্দী না করিয়া ছাড়িয়া গেলে কি আমাদের কাহারও গর্দান থাকিবে? হোর বিরক্ত হইয়া ইয়াযিদ ব্যূহ হইতে নিক্রান্ত হইলেন এবং ইমামের দলে যোগদান করিলেন। তাহার ভ্রাতা ও গোলাম সহ ত্রিশজন অনুচরও তাঁহার অনুসরণ করিল। হোর ইমামের জন্যে নিজ জীবন উৎসর্গ করার ইচ্ছা জানাইলে ইমাম তাঁহাকে এই যুদ্ধের ফলাফল পূর্বাহ্নে ভাবিয়া দেখিতে বলিলেন। হোর উত্তর করিলেন, তিনি ইমামের চরণ তলে জীবন উৎসর্গ করিতে কৃতসংকল্প হইয়াই আসিয়াছেন, মৃত্যু ভয়ে তিনি ভীত নহেন। ইমাম কহিলেন, আল্লাহ্ তোমাকে পুরস্কৃত করুন।

এতদ্দর্শনে শিমার সেনাপতি ওমরকে ডাকিয়া কহিলেন, ওমর, কি দেখিতেছ, আর বিলম্ব নয়। অন্যথা একে একে তোমার সকল ইরাকী সৈন্যই হুসায়েনের পক্ষে চলিয়া যাইবে। ওমর তৎক্ষাণাৎ ধনুকে তীর সংযোগ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, সাক্ষী রহ সকলে, প্রথমে যে ব্যক্তি ইমামের প্রতি অস্ত্র নিক্ষেপ করিল, সে এই ওমর। সঙ্গে সঙ্গে তীর ইমাম ব্যূহের দিকে ছুটিয়া চলিল। যুদ্ধ শুরু হইয়া গেল। দামামার তালে তালে উভয় পক্ষের যোদ্ধাদের ধমনীতে মারণ-রক্ত নাচিতে লাগিল।

প্রথমে ইয়াযিদ-ব্যুহের দুইজন পদাতিক সৈন্য তরবারী হস্তে নির্গত হইল এবং ইমাম পক্ষের লোকগণকে দ্বন্দ্ব যুদ্ধে আহ্বান করিল। তাহারা মধ্যবর্তী ফাঁকা স্থানে চক্রাকারে ঘুরিয়া ঘুরিয়া তলোয়ার ভাঁজাইতে লাগিল। ইমাম-শিবিরের ওহাব ইব্‌নে আবদুল্লাহ তাহাদের সন্মুখীন হইল। ওহাবের এক আঘাতে প্রথম সৈন্যের মস্তক ভূতলে লুটাইয়া পড়িল। তখন দ্বিতীয় সৈন্য ওহাবের মস্তক লক্ষ্যে তলোয়ার চালাইল। কিন্তু সেও মুহুর্তের ভিতর নিহত হইল। শত্রুপক্ষ রোষে গর্জিয়া উঠিল এবং সালেম নামক একব্যক্তি ছুটিয়া আসিয়া তরবারিরর এক আঘাতে ওহাবের বামহস্ত দেহচ্যুত করিল। ওহাব দক্ষিণ হস্তের আঘাতে সালেমকে দ্বিখণ্ডিত করিল। কিন্তু রক্তস্রাবে অবশ হইয়া নিজেও ভূপতিত হইল। ইমাম শিবিরের ইয়াযিদ বিন হাসীন বর্শা হস্তে আসিয়া ওহাবের স্থান পুরণ করিল। শত্রু পক্ষের ইয়াযিদ বিন মকিল তাহাকে আক্রমণ করিতে গিয়া হাসীনের বর্শায় গাঁথা পড়িল। শত্রুপক্ষ বিস্মিত হইল এবং কাব বিন জাবের নামক এক দুর্ধর্ষ সেনানী বল্লম হস্তে ছুটিয়া আসিয়া হাসীনকে বধ করিল ইমাম পক্ষের ওমর বিন কাবাৎ তাহার গতিরোধ করিতে আসিল কিন্তু টিকিতে পারিল না, অচিরেই নিহত হইল। ওমরের ভাই আলী ইব্‌নে কাবাৎ ছিল ইয়াযিদ দলে। সে ভাইয়ের মৃত্যু দর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া দ্রুত অশ্বারোহণে অগ্রসর হইল এবং ইমামের প্রতি লক্ষ্য করিয়া উত্তেজিত স্বরে বলিল, ভাইকে দলে টানিয়া মৃত্যুমুখে ঠেলিয়া দিয়াছি। এইবার দেখ তার প্রতিশোধ। ইমাম উপেক্ষার সহিত তাহার দিকে তাকাইয়া দেখিলেন, কোনও জবাব দেওয়া প্রয়োজন মনে করিলেন না। কিন্তু নাফ নামক আর এক যোদ্ধা ইমামের পক্ষ হইতে ইহার জবাব দিল এবং বলিল, বিধর্মী কুক্কুর। এক টুকরা রুটীর লোভে পরকাল বেচিয়া দিয়াছিস, তাই রসুলের নাতিকে গালি দিস্। কথা শেষ হইবার পুর্বেই নাফের তরবারি আলীকে এক আঘাতে দ্বিখণ্ডিত করিল। যুদ্ধের তীব্রতা বাড়িয়া চলিল।

শত্রুপক্ষ বুঝিতে পারিল, অর্ধভুক্ত হইলেও লৌহমুষ্টি মাদানী সৈন্যদের সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধে, বিলাসে লালিত ইরাকী সৈন্যরা আঁটিয়া উঠিবে না।

বিশেষতঃ মাদানী সৈন্যগণ আজ মরিয়া হইয়া যুদ্ধে নামিয়াছে। তখন তাহারা স্থির করিল দূর হইতে তীর নিক্ষেপে ইহাদিগকে কাবু করিতে হইবে। তাহারা চতুর্দিক হইতে ইমাম শিবির ঘিরিয়া ফেলিল এবং কাহাকেও আক্রমণের সুযোগ পাইলেই দূর হইতে তীর নিক্ষেপ করিতে লাগিল। ইমাম-সৈন্য সতর্কতার সহিত সেগুলির প্রতিরোধ করিতে থাকিল। তথাপি ইমামের কতিপয় সৈন্য ও অশ্ব তীরের আঘাতে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। এদিকে ইমাম পক্ষও সাধ্যমত আক্রমণ চালাইতে থাকে। সেনাপতি হোর ও তাঁহার অনুচরগণ ইয়াযিদ বাহিনীর উপর আপতিত হইয়া বহু শত্রু নিধন করিয়া নিজেরা নিহত হইলেন। শহীদ মুসলিমের পুত্র আবদুল্লাহ এবং দুই ভাই যাফর ও আবদুর রহমান অসামান্য বীরত্বের সহিত শত্রুক্ষয় করিতে করিতে মৃত্যু বরণ করিল। হুসায়েনের ভগিনী বিবি জয়নাব তাঁহার দুই কিশোর পুত্র মুহাম্মদ ও আওনকে নিজ হস্তে যুদ্ধসাজ পরাইয়া দিলেন। তাহারও দুইটি ভাই অসি হস্তে নির্গত হইয়া সম্মুখ যুদ্ধে বীরের ন্যায় শহীদ হইলেন।

সেদিন ছিল জুমার নামাযের দিন। জুমা' দূরের কথা, যোহরের সময় হইলেও শত্রুগণের আক্রমণ স্থগিত হইল না। তাহারা বন্য পশুর ন্যায় হিংস্র হইয়া উঠিয়াছিল। ইমাম পক্ষ যুদ্ধরত অবস্থায়ই অগ্র পশ্চাৎ হইয়া একে একে নামাযে-খওফ (সংক্ষিপ্ত নামায) পড়িয়া লইল। নামায অন্তে দেখা গেল ইমাম পক্ষে সৈন্য প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। শুধু ইমামের কয়েকটি ভাই, জন কয়েক বিশিষ্ট খিদমৎগার এবং ইমাম পরিবারের সন্তানগণ মাত্র অবশিষ্ট আছে। ইমাম ইচ্ছা করিলেন, এবার তিনি নিজেই অস্ত্র ধারণ করিয়া জয়-পরাজয়ের শেষ মিমাংসা করিয়া ফেলিবেন। কিন্তু যমীর বিন আসীর নামক এক বিশিষ্ট খাদেম ইমামের সম্মুখে হাত জোড় করিয়া দাঁড়াইল এবং বলিল, হুজুর, আমরা জীবিত থাকিয়া স্বচক্ষে আপনার মৃত্যু কি করিয়া দেখিব? আমরা যে কয়জন আছি আমাদিগকে শেষ হইতে দিন। এই বলিয়া সে শত্রুসৈন্যের উপর ঝাপাইয়া পড়িল এবং শত্রু বধ করিতে করিতে নিজে শহীদ হইয়া গেল। এইভাবে বিশিষ্ট সেবকদলের যে কয়জন অবশিষ্ট ছিল তাহারাও একে একে প্রভুর জন্য জীবন দান করিল।

অতঃপর ইমামের ছয় বৈমাত্রেয় ভাই আবুবকর, ওমর, ওসমান, আউয়াল, যাফর ও আবদুল্লাহ্ একে একে শত্রু সেনার উপর আপতিত হইয়া শহীদ হইলেন। ইঁহারা ছিলেন হযরত আলীর কনিষ্ঠা স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তান। ইমামের চাচাত ভাই আব্বাস আলমদার পূর্বদিন আহত হইয়াছিলেন। তিনি অস্ত্র ধারণ করিয়া ইমামের নিকট দাঁড়াইলেন। ইনি ছিলেন শহীদ মুসলিমের সহোদর ভ্রাতা এবং ইমাম পক্ষে পতাকবাহক। তিনি বলিলেন, ভাইজান, এইবার আমাকে বিদায় দিন। ইমাম মমতা বিগলিত কণ্ঠে কহিলেন, আব্বাস, তুমি এ দলের পতাকাবাহী, তুমি কি করিয়া আমাদের আগে মরিতে চাও? বিশেষতঃ চাচার সন্তানেরা আর সকলেই এই অভাগার জন্য প্রাণদান করিয়াছে। এক মাত্র তুমিই অবশিষ্ট। আমার স্বার্থে তোমাকে কোরবানী করিলে আখেরাতে চাচার নিকট কি করিয়া মুখ দেখাইব? আব্বাস কহিলেন, ভ্রাতঃ আপনার শোক, আমার মৃত ভাইদের শোক, ইমাম বংশের বীর সন্তানগণের শোক, এত আগুন অন্তরে লইয়া আমি কি করিয়া বাঁচিয়া থাকিব? তার চেয়ে মৃত্যু অধিকতর আরামদায়ক। যাই, ইয়াযিদ সৈন্যের লহু–দরিয়ায় স্নান করিয়া সর্বশোকের জ্বালা নিবারণ করি। এই সময় পশ্চাৎ দিক হইতে খীমার শিশু ও রমণীগণের কাতর কণ্ঠস্বর কানে আসিতেছিল। একই শব্দ–পানি, পানি। আব্বাস আলমদার আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। ইমামের পদ চুম্বন করিয়া একটি মশক হস্তে নদীর দিকে অগ্রসর হইলেন এবং বহু কষ্টে নদীতে নামিয়া মশক পূর্ণ করিলেন। কিন্তু পানি আনা তাহার ঘটিল না। শত্রুর তীরের আঘাতে নদী তটেই তিনি প্রাণ হারাইলেন। পানি সংগ্রহের শেষ চেষ্টাও এইভাবে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইল।

মহাবীর কাসিম

অতঃপর ইমামবংশের কিশোর ও যুবকগণ ব্যতীত যুদ্ধে যাইবার আর কেহ অবশিষ্ট ছিল না। ইমামের ইচ্ছা ছিল না যে, বংশের ভবিষ্যৎ আশা ভরসার স্থল এই সন্তনেরা যুদ্ধে গিয়া প্রাণ হারায়। কিন্তু তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র মহাবীর কাসিম তাঁহার এই সঙ্কল্প ব্যর্থ করিয়া দিল। কুড়ি-বাইশ বৎসরের এই যুবক রণসাজে সজ্জিত অবস্থায় চাচার নিকট আসিয়া দাঁড়াইল, যুদ্ধ গমনে তাঁহার অনুমতির জন্য। অল্প দিন আগে কাসিমের বিবাহ হইয়াছিল হুসায়েনের পরমা সুন্দরী নাবালিকা কন্যা সুকায়নার (সাকিনা) সহিত। কথিত আছে, মৃত্যুকালে হাসান এই বিবাহের জন্য আকাঙ্খা প্রকাশ করিয়া গিয়াছিলেন। হুসায়েন মৃত ভ্রাতার সেই আকাঙ্খা পূরণ করেন। তখন কে মনে করিয়াছিল, এই নব দাম্পত্য সুখ মুঞ্জর করেন নাই; সুকায়না ছিল শিক্ষিতা এবং সুকবি। মদীনার বীরশ্রেষ্ঠ কাসিমকে স্বামীরূপে পাইয়া সে নিজেকে ধন্য মনে করিয়াছিল। কাসিমের দীর্ঘ তনু, প্রশস্ত ললাট, উন্নত নাসিকা ও বিশাল বক্ষ যুবক সমাজে তাঁহাকে নেতৃত্ব সুলভ বৈশিষ্ট্য প্রদান করিয়াছিল। কত আরব বালাই না এই সৌম্য দর্শন বীর যুবার বাহুপাশে আবদ্ধ হইবার জন্য কামনা করিত। কিন্তু বিধাতা অপর কাহারও সে আকাঙ্খা পূর্ণ করেন নাই। কাসিমকে যুদ্ধে যাইতে হুসায়েন কত বারণ করিলেন। কিন্তু মেষ সাবকের মত নিশ্চেষ্ট অবস্থায় শিবিরে বসিয়া প্রিয় চাচার মর্মান্তিক মৃত্যু দেখিবে, কাসিম সে পাত্র ছিল না। তাঁহার কাতর প্রার্থনায় অগত্যা হুসায়েন কহিলেন, যাও বাবা, আগে তোমার দুঃখিনী মাতার অনুমতি লইয়া আইস। কিন্তু সে অনুমতি আগেই লওয়া ছিল। তথাপি চাচার ইঙ্গিতে কাসিম পুনঃ শিবিরে প্রবেশ করিলেন এবং মায়ের কদমবুছি করিলেন। আরব রমণীরা

বংশানুক্রমে বীরজায়া ও বীর-প্রসবিনী। মাতা মুখে কোনও দুঃখ প্রকাশ করিলেন না। শুধু মমতায় তাঁহার আঁখি পল্লব সিক্ত হইয়া উঠিল। কিন্তু তিনি হৃদয় দৃঢ় করিলেন এবং পুত্রের মস্তকে হস্ত রাখিয়া তাহাতে স্নেহ স্পর্শ বুলাইলেন। মায়ের পশ্চাতে দাঁড়াইয়া অভাগিনী সুকায়না অপলক নেত্রে স্বামীর পানে চাহিয়াছিল। এ জীবনের মত সে প্রিয়তমকে দেখিয়া লইতেছিল। শুষ্ক পদ্মের মত তাহার কচি মুখখানি মুষড়াইয়া গিয়াছিল। দুট আঁখির সজল পল্লব তাহার অশ্রুধারাকে রুখিয়া দিয়াছিল, পাশে পিশাচ মরুর তৃষিত নিঃশ্বাস সে পবিত্র বারি শুষিয়া লয়। তাহার ভাষাহারা মৌনীতে এবং চোখের তারকায় যে বুকফাটা বেদনা এতক্ষণ আত্মগোপন করিয়াছিল, স্বামী-স্ত্রীর দৃষ্টি বিনিময়ে সেই রুদ্ধ আবেগ পরম করুণায় উদ্বেল হইয়া উঠিল। তাহাদের অন্তরের বেদনা শুধু তাহারাই জানিল, আর জানিল তাহাদের অন্তর্যামী। ক্ষণিকের জন্য কাসিম যেন সম্বিৎ হারাইলেন। কিন্তু সে নিমিষ মাত্র। তিনি পত্নীর চিবুক স্পর্শ করিলেন এবং দীঘ-প্রাণে তাহার মেষ আশীষ ও প্রণয় পরশ জানাইয়া দ্রুতবেগে শিবির হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন, পাছে দুনিয়ার মায়া তাঁহার অধীর চিত্তকে আচ্ছন্ন করিয়া না বসে। কাসিম বিদায় লইলেন। ইহজীবনের জন্য সে বিদায়। খীমার ক্ষুব্ধ বাতাস তাঁহার অর্দ্ধস্ফুট বিদায় বাণী কুড়াইয়া আনিয়া নিস্পন্দ সুকায়নার কানে দিল,-চিন্তা কি, প্রিয়তমা, আবার দেখা হইবে; বীরের বাঞ্ছিত অমর লোকে আমাদের দেখা ও মিলন হইবে। সে মিলনের পর আর বিচ্ছেদ নাই, আর বিরহও নাই(১)।

অশ্বারোহণে কাসিম কালান্তক যমের ন্যায় শত্রু সৈন্যের উপর আপতিত হইলেন। সে আক্রমণের প্রচণ্ডতার সন্মুখে ইয়াযিদের সৈন্যেরা টিকিতে পারিতেছিল না। ইহা দেখিয়া সেনাপতি ওমর শামদেশীয়

---

(১) ইতিহাসে উল্লেখ আছে, পতিগত প্রাণা সুকায়না (সকিনা) জীবনে আর বিবাহ করেন নাই। আজীবন ধর্ম সাহিত্য ও কবিতা চর্চায় সময় কাটাইয়াছেন। বিদুষী ও শুদ্ধচারিণী বলিয়া মদীনায় তাঁহার খ্যাতি ছিল।

বিখ্যাত পাহলোয়ান আরজককে ডাকিয়া তাঁহার গতিরোধ করিতে আদেশ করিলেন। আরজক ছিল বয়ঃপ্রবীণ ও বিরাটকায় এক দৈত্য বিশেষ। সে একটি অপরিণত বয়স্ক যুবকের সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধে অবতীর্ণ হইবে ইহা ভাবিতে লজ্জাবোধ করিতেছিল। আরজক ইতঃস্তত করিতেছে, ইতোমধ্যে কাসিম সম্মুখের সৈন্যদল পর্যুদস্ত করিয়া একেবারে ওমরের সন্মুখে আসিয়া উপনীত হইলেন। ক্রোধে গর্জিয়া কহিলেন, হে ওমরু, ফেরু, পালের পশ্চাতে আত্মগোপন করিয়া আছ কেন? যদি হিম্মৎ থাকে এস, সন্মুখ যুদ্ধে অস্ত্র ধারণ কর। অর্থের লোভে পরকাল বেচিয়া দিয়াছ। শেষে রসুলের নাতিকে খুন করিতে আসিয়াছ? এস, তোমার খুনের সাধ মিটাইয়া দেই। কিন্তু ওমর আগাইয়া আসিল না। আরজক দেখিল, আর বিলম্ব করা চলে না। সে তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্রকে ইঙ্গিত করিল কাসেমের মস্তক কাটিয়া আনিতে। কিন্তু সে ব্যক্তি কাসিমের সমীপবর্তী হইবার সঙ্গে সঙ্গে তাহার এক আঘাতে দ্বিখণ্ডিত হইয়া অশ্ব হইতে গড়াইয়া পড়িল। ইহা দেখিয়া আরজকের দ্বিতীয় পুত্র রোষে গর্জিয়া কাসিমের সন্মুখে আসিল। কিন্তু সেও চোখের নিমিষে ভাইয়ের অবস্থা প্রাপ্ত হইল। এইভাবে একে একে আরজকের চারি পুত্র শমন সদনে প্রেরিত হইল। তখন আরজক ক্ষিপ্ত ব্যাঘ্রের মত উন্মত্ত হইয়া কাসিমের উপর আপতিত হইল এবং বজ্র গভীর স্বরে কহিল, দুঃসাহসী যুবক, ধন্য তোমার অস্ত্র শিক্ষা, ধন্য তোমার বাহুবল। কিন্তু এবার তোমার নিস্তার নাই। স্বয়ং আজরাইল তোমার সন্মুখে। সামাল এইবার, বলিতে বলিতেই আরজকের বিশাল বর্শা কাসিমের বক্ষ দৃষ্টে চালিত হইল। চতুষ্পার্শ্বে বীরগণ রুদ্ধশ্বাসে এই ভয়াবহ কাণ্ড দেখিতেছিল। তাহার চক্ষুর পলক ফেলিয়া পুনঃ চাহিয়া দেখিল, কাসিম ভূপতিত হয় নাই পরন্তু ক্ষিপ্রহস্তে ঢাল পাতিয়া সে আঘাত ফিরাইয়া দিল এবং হুঙ্কার দিয়া কহিল, উদ্ধত সৈনিক, সিংহ শাবকের গায়ে আঘাত হানিয়াছ, এইবার নিজেকে সামাল কর। মুখের বাক্য শেষ হইবার আগেই কাসিমের বজ্রসম বর্শা আরজকের মস্তকে আপতিত হইল। আরজক মাথা নীচু করিয়া সে আঘাত ব্যর্থ করিয়া দিল বটে কিন্তু তাহার

বিশাল বপু পুনঃ সোজা হইবার আর অবকাশ পাইল না। বিদ্যুৎ গতিতে কাসিমের দীর্ঘ তরবার তাহার গ্রীবা স্পর্শ করিল, আর সঙ্গে সঙ্গে মহিষ মুণ্ডের ন্যায় তাহার বিশাল মস্তক সশব্দে ভূতলে পড়িয়া গড়াইতে লাগিল।

ইহা দর্শনে ইয়াযিদ বাহিনীতে মহা হুলস্থুল পড়িয়া গেল। কেহই আর কাসিমের সন্মুখীন হইতে সাহসী হইল না। কাসিমও পিপাসায় কাতর হইয়াছিলেন। তিনি অশ্বের বল্গা শিথিল করিয়া শিবিরে ফিরিলেন এবং কাতর স্বরে হুসায়েনকে বলিলেন, চাচাজান, একবিন্দু পানি, তাহা হইলে আমি পাপিষ্ঠ ওমরের মস্তক কাটিয়া তোমার চরণতলে উপহার দেই। ইমাম মর্মান্তিক কষ্টে উত্তর করিলেন, বেটা, পানি কোথায় পাইব? তোমার পিতা "হাওজে কাওসার" এর পানি হাতে লইয়া তোমার প্রতীক্ষায় আছেন, ক্ষণপরে সেই পানি পান করিয়া প্রাণ শীতল করিবে। এখন আল্লার নামে সবুরী মানো। নিরাশ হৃদয়ে কাসিম পুনঃ অশ্বে সওয়ার হইয়া ময়দানে আসিলেন এবং দ্বৈরথ যুদ্ধে শত্রুগণকে আহ্বান করিতে লাগিলেন। কিন্তু কেহই তাঁহার সন্মুখীন হইল না। সৈন্যদলে এই ত্রাস দেখিয়া ওমর ক্রুদ্ধ হইয়া হাঁকিয়া বলিলেন, তোমরা নির্বোধের মত দাঁড়াইয়া তামাসা দেখিতেছ? একজন সামান্য বালককে সকলে মিলিয়া শেষ করিতে পারিলে না? তখন ওমরের ইঙ্গিতে সকলে সমবেত ভাবে কাসিমের উপর তীর নিক্ষেপ করিতে লাগিল। কাসিম ঢাল ও বর্শার সাহায্যে আত্মরক্ষা করিতে করিতে শত্রুসংহার করিয়া চলিলেন। কিন্তু সে আর কতক্ষণ? অসংখ্য তীর জর্জরিত হইয়া মহাবীর কাসিম ভূপতিত হইলেন। হুসায়েন পরিবারে হাহাকার পড়িল। মৃতদেহ খীমার ভিতর আনিলে রোরুদ্যমানা সুকায়না সেই রক্তমাখা দেহ জড়াইয়া ধরিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। মাসুম সতী-বালিকার নসীবে এত দুঃখও লিখিয়া ছিলেন নিঠুর বিধি।

ইহার পর হাসানকে অপর পুত্র বীরবাহু আব্দুল্লাহ আসিয়া চাচার নিকট বিদায় চাহিলেন। সেই একই প্রকার আপত্তি ও খণ্ডন। যুবক উন্মুক্ত তরবারি হস্তে শত্রুব্যূহে প্রবেশ করিল এবং ভাইয়ের ন্যায় বীরত্ব দেখাইয়া পরিশেষে মৃত্যুবরণ করিল।

বীরশ্রেষ্ঠ আলী আকবর

রুদ্ধ শোকাবেগ অধীর অবস্থায় ইমাম কোনও মতে আত্মসংবরণ করিতেছিলেন, এমন সময় তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র আলী আকবর বিদায় লইতে আসিল। মাতা মাহারবানু স্বহস্তে তাহার গায়ে যুদ্ধসাজ পরাইয়া দিয়াছিলেন। অষ্টাদশ বর্ষীয় এই বীর যুবক আলী আকবর দেহের অনুপম সৌন্দর্যে মদীনা শহর মোহিত করিয়াছিল। নবীজীর ন্যায়ই তাহার দেহ ছিল লাবণ্যময় ও তেজঃপুঞ্জ এবং কণ্ঠস্বর ছিল নবীজীর মতই সুমিষ্ট। তাহার কমনীয় মুখকান্তি দেখিলে লোকে মনে করিত শারদীয় পূর্ণচন্দ্র যেন ধূলার ধরায় নামিয়া আসিয়াছে। কথিত আছে, সাহাবীদের মনে কখনও তাহাদের পরমপ্রিয় নবীজীর হারানো কণ্ঠস্বর শুনিবার খায়েশ জাগিলে তাঁহারা এই যুবককে আহ্বান করিতেন এবং তাহার অমৃত মাখা বাক্য শ্রবণ করিতেন। আলী আকবর পিতার সন্মুখে হাত জোড় করিয়া অনুমতি চাহিল পুত্রের শেষ কর্তব্য সম্পাদনের জন্য। ইমাম তাহার মস্তকে হাত বুলাইয়া করুণ বিজড়িত কণ্ঠে কহিলেন, বাছা, তুমি যে নবী বংশের সবারই কলিজার টুকরা। কি করিয়া তোমাকে এই কারবালার মরুভূমিতে বিসর্জন দিব? পুত্র কহিল, আব্বা, আপনার অঙ্গে শত্রুর আঘাত পড়িতে থাকিবে আর আমরা দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া তাহাই দেখিব, এজন্যই কি আমাদের জন্ম হইয়াছিল? আমরা কি এমনই অপদার্থ, কুলাঙ্গার? এই বলিয়া আলী আকবর আর পিতার কাতর চোখের দিকে চাহিল না, ছুটিয়া অশ্বে আরোহণ করিল। দেখিতে দেখিতে যুবক শত্রুব্যূহের ভিতর অদৃশ্য হইয়া গেল। শুধু শত্রুসৈন্যের ভিতর ছুটাছুটি, হড়াহুড়ি ও ধূলি উত্থান দেখিয়া বুঝা যাইতে লাগিল তড়িৎগতি আলী আকবরের অবস্থিতি কখন কোন্

খানে। আলী আকবর সন্মুখে সৈন্য ক্রমাগত কাটিয়া চলিয়াছে, আর পশ্চাৎ হইতে শত্রু সেনা পুনঃতাহাকে ঘিরিয়া ফেলিতেছে, কিন্তু কেহই তাহার গতিরোধ উদ্দেশ্যে দ্বন্দ্বযুদ্ধে অগ্রসর হইতেছে না। সেনাপতি ওমর বিস্মিত দৃষ্টিতে ইহা লক্ষ্য করিতেছিলেন। কুমারের নবনীত অঙ্গে কেহই অস্ত্রাঘাত করিতেছে না দেখিয়া তিনি দূর হইতে তীর বর্ষণের আদেশ দিলেন। অল্পকাল পরেই তীরে জর্জরিত অবস্থায় আলী আকবর রক্তমাখা দেহে দীর্ঘ কুঞ্চিত কেশ উড়াইতে উড়াইতে পিতার তাঁবুতে ফিরিয়া আসিল এবং জড়ি কণ্ঠে কহিল, বড় পিয়াস আব্বা, বড় পিয়াস, এক বিন্দু পানি। ইমামের কলিজা ফাটিয়া যাইতে লাগিল। বলিলেন, পানি কোথায় পাইব, বাবা! এ যালিমের দেশে কি পানি মিলে? আল্লাহ্ তোমার জন্য "হাওজে কাওসারের" পানি মওজুত রাখিয়াছেন। এ দুর্দিনে তাকেই স্মরণ কর। কিন্তু আলী আকবর আর কথা কহিতে পারিল না। তখন ইমাম তাঁহার নিজের জিহ্বা পুত্রের মুখের ভিতর প্রবেশ করাইলেন। পুত্র তাহা শোষণ করিয়া আবার উঠিয়া দাঁড়াইল এবং পুনরায় যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়া বীরের ন্যায় লড়িতে লড়িতে শত্রুর হস্তে প্রাণ বিসর্জন দিল।

কনিষ্ঠ আলী আ-সাদও কিশোর হস্তে অস্ত্র ধারণ করিয়া ভাইয়ের অনুগমন করিয়াছিল। সেও জান্নাতে চলিয়া গেল। ক্রমাগত শোকের পর শোক জমিয়া ইমামের অন্তর নিঃসাড় করিয়া দিয়াছিল। পুত্রগণকে ঠেকাইয়া রাখিতে পারেন নাই। তাঁহার চিন্তার ভিতর সমস্তই যেন এলোমেলো হইয়া আসিতেছিল।

ইহার পর ইমাম খীমার ভিতর প্রবেশ কারিলেন, স্ত্রী, কন্যা ভগিনী এবং অন্যান্য পবিজন বর্গের নিকট শেষ উপদেশ বলিয়া বিদায় লইতে। সর্বকনিষ্ঠ পুত্র যয়নুল আবেদীন পীড়িত অবস্থায় বিবি উম্মে কুলসুমের হিফাযতে শয্যাশায়ী ছিল। ইমাম কহিলেন, এই বালকটিকে তোমরা সযত্নে রক্ষা করিও। নবী আধ্যাত্মিক গুপ্তধন 'বিলায়েত' যাহা নবী আমার পিতার নিকট গচ্ছিত রাখিয়া গিয়াছিলেন এবং পরে আমার ভাইও আমি পিতার নিকট হইতে লাভ করিয়াছিলাম, তাহা এই বালকের বক্ষে

আমানত রাখিয়া আমি আজ দুনিয়া হইতে চলিয়া যাইতেছি। আমার আশা, এই বালকের মারফতই নবীর 'বিলায়েত' অর্থাৎ রূহাণী জগতের অনুশাসন দুনিয়ায় জারী থাকিবে। দুনিয়ায় তাঁহার নবুয়তের আর কেহ উত্তরাধিকারী হইবে না, কিন্তু তাঁহার 'বিলায়েত' ইমাম পরম্পর ভিতর দিয়া ছেদহীন অবস্থায় কিয়ামত পর্যন্ত জাগ্রত থাকিবে। এই বলিয়া ইমাম নিজ বক্ষের সহিত যয়নুলের বক্ষ সজোরে চাপিয়া ধরিলেন এবং ক্ষণকাল নির্মীলিত চক্ষে স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। তারপর বালককে সস্নেহে চুম্বন করিয়া তাহার ফুফু আমার জিম্মায় ছাড়িয়া দিলেন।

ইমামের অস্ত্রধারণ

পত্নী শাহারবানুর নিকট বিদায় লইতে ইমাম তাঁহার নিকটবর্তী হইতেই দেখিলেন তাঁহার দুগ্ধপায়ী কচি শিশু আলী আসগর পিপাসায় মায়ের কোলে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া আছে। ইমাম আর সহিতে পারিলেন না। মৃতকল্প পুত্রের জন্য আত্মাভিমান বিস্মৃত হইলেন এবং পুনরায় শত্রু সমীপে পানির ভিক্ষায় বাহির হইবেন স্থির করিলেন। তিনি শিশুকে কোলে লইয়া শিবিরের বাহিরে আসিলেন এবং শত্রুদের সম্মুখীন হইয়া কহিলেন, আমি না হয় তোমাদের শত্রু। কিন্তু এ দুধের শিশু কি অপরাধ করিয়াছে? সে পানির অভাবে মরিতেছে, তোমাদের ঘরে কি শিশু সন্তান নাই? একে একটু পানি দাও।

কেহ উত্তর করিল না। এক পাষণ্ড হুসায়েনকে লক্ষ্য করিয়া তীর নিক্ষেপ করিল। তীক্ষ্ণ তীর শিশুর বুকে লাগিয়া তাঁহার পৃষ্ঠদেশ পার হইয়া গেল। ইমামের জামা রক্তে রঞ্জিত হইয়া গেল। শোকাতুর পিতা ব্যথায় প্রস্তরবৎ হইয়া গেলেন। কোনও রূপ. শোক প্রকাশ করিলেন না। তাঁবুতে ফিরিয়া আসিয়া মৃত শিশুকে শাহারবানুর ক্রোড়ে ফিরাইয়া দিলেন এবং কহিলেন, নাও, তোমার প্রাণপ্রতিম পুত্রকে "হাওজে কাওসারের" পানি পান করাইয়া আনিয়াছি। অনাহার ও পিপাসাতুর শাহারবানু আর সহিতে পারিলেন না, পুত্রশোকে ভূতলে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন।

এইবার ইমাম তাঁহার শেষ বিদায়ক্ষণে কন্যা ভগিনী ও পরিজনবর্গকে সান্তনা দিয়া তাঁহাদিগকে আল্লা'র হিফাযতে সোপর্দ করিয়া দিলেন। আত্মীয়-বান্ধব সকলেই ছাড়িয়া গিয়াছে। একা তিনি ছিন্ন-শাখা মহীরুহের ন্যায় দাঁড়াইয়া আছেন। শিবিরের বাহিরে অশ্ব আর মানুষের মৃত দেহ ছাড়া আর কিছুই চক্ষুতে পড়ে না। আল্লা'কে স্মরণ করিয়া তিনি দুলদুলে

সওয়ার হইলেন এবং শত্রু সৈন্যের দিকে অগ্রসর হইলেন। পিপাসা প্রযুক্ত তিনি প্রথমে নদীর দিকে অশ্ব চালনা করিলেন এবং যাহাকে সম্মুখে পাইলেন তাহাকেই দ্বিখণ্ডিত করিয়া মুহূর্তে ফোরাতের কিনারায় উপনীত হইলেন। ইহা দেখিয়া নরাধম শিমার কহিলেন, ওমর, কি দেখিতেছ? হুসায়েন পিপাসা কাতর, এখনই তাহাকে কাবু করা যাইতেছে না; এর পানি পান করিয়া সে জানে প্রাণে তাজা হইয়া উঠিলে তখন কি আর রক্ষা আছে? শীঘ্র তীরন্দাযদের হুকুম দাও, ত্বরায় শরসন্ধান করুক।

ততক্ষণে তৃষ্ণার্ত হুসায়েন পানিতে নামিয়া অঞ্জলী পুরিয়া পানি উঠাইয়াছেন। আহা! কি ঠাণ্ডা সে পানি! স্পর্শেই যেন প্রাণ শীতল হইতে চায়। অঞ্জলী মুখে তুলিলেন। কিন্তু পান করিতে ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। হায়! এই পানির জন্য প্রাণাধিক পুত্রগণ, প্রাণপ্রিয় ভাতিজাগণ ও অন্যান্য কত আত্মীয় বান্ধব মৃত্যুর ক্রোড়ে ঢলিয়া পড়িয়াছে। আর তিনি সেই পানি পান করিবেন! ইতোমধ্যে অলক্ষ্যে কাহার তীর আসিয়া তাঁহার ওষ্ঠ বিদ্ধ করিলেন। তীরের তীক্ষ্ণ অগ্র মুখ বিবরে প্রবেশ করিল। রক্তের ধারা নামিয়া আসিল। পাক ওষ্ঠাধর রক্তাক্ত হইল। অঞ্জলীর পানি লালে লাল হইয়া গেল। হুসায়েন মর্মান্তিক কষ্টে পানি ফেলিয়া দিয়া তীরে উঠিলেন। মুখের তীর বহু কষ্টে নির্গত করিলেন এবং আল্লা'র নিকট হাত তুলিয়া ফরিয়াদ করিলেন, ইয়া মা'বুদ, তুই ইহার ইন্‌সাফ করিস।

ইহা বলিয়া ইমাম সেই যে দু'হাতে তলোয়ার চালাইতে লাগিলেন, তার আর বিরাম নাই। মনে হইল, তিনি যেন দিগ্‌বিদিগ জ্ঞানশূণ্য হইয়াছেন। ক্ষিপ্ত সিংহের ন্যায় যাহাকে সন্মুখে পান তাহাকেই সংহার করিয়া চলিয়াছেন। ঝড়ের বেগে তিনি সমস্ত দলিত মথিত করিয়া আগাইয়া চলিয়াছেন। শত্রুদল সম্মুখে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যাইতেছে, কিন্তু স্রোতের পানির ন্যায় আবার তাহারা পশ্চাতে জমায়েত হইতেছে।

শাহাদৎ

সেনাপতি ওমর প্রাণভয়ে সম্মুখ হইতে সরিয়া পড়িয়াছেন। শিমার বেগতিক দেখিয়া সৈন্য দলকে হুকুম দিলেন, ঘিরিয়া ফেল। ওমর কহিলেন, শিমার, জীবনে অনেক যুদ্ধ করিয়াছ কিন্তু পৃথিবীতে এরূপ বীরত্ব কখনও দেখিয়াছ কি? ক্ষুধা ও পিপাসায় কাতর , শোকে মুহ্যমান, তীরে জর্জরিত, তথাপি অনুপম বীর শত্রুকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিতেছে না। অগণিত আঘাত হইতে রক্তধারা ঝরিতেছে, তবু শেরে-ইলাহীর শের-পুত্র অবিরাম তলোয়ার চালাইয়া যাইতেছে।

রক্তপাতে ইমামের শরীর ক্রমে দুর্বল হইয়া পড়িতেছিল। তখন শিমার বাছাই করা কয়েকজন যোদ্ধাকে সঙ্গে লইয়া ইমামকে ঘিরিয়া ফেলিল। তাহারা সকলে মিলিয়া ইমামরে উপর দূর হইতে তীক্ষ্ণ-ফলক বর্শা নিক্ষেপ করিতে লাগিল।

চতুর্দিক হইতে শত্রুবেষ্টিত অবস্থায় ইমাম ক্ষীপ্রহস্তে ঢাল ও তলোয়ার ঘুরাইয়া আত্মরক্ষার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অকস্মাৎ একব্যক্তি পশ্চাৎ হইতে আঘাত করিয়া তাঁহার বামহস্ত কাটিয়া ফেলিল। ইমাম বিদ্যুৎবেগে পার্শ্ব ফিরিয়া দক্ষিণ হস্তের তলোয়ার দ্বারা তাহার শিরচ্ছেদ করিলেন। কিন্তু রক্তপাত এত বৃদ্ধি পাইল এবং পিপসা এত প্রবল হইল যে, ইমাম ক্লান্ত ও অবসন্ন হইয়া অশ্ব হইতে ভূতলে পড়িলেন। এই সময় এক পাপিষ্ঠ ইমামের বক্ষঃস্থলে বর্শা দ্বারা আঘাত করিল। বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া বর্শা পৃষ্ঠদেশ পার হইল। অতঃপর নিষ্ঠুর শিমার ভূপতিত ইমামের বক্ষের উপর চড়িয়া বসিল এবং পুনঃ পুনঃ খঞ্জর আঘাতে তাঁহার মস্তক কাটিয়া জগতের নিষ্ঠুরতম হত্যাভিনয় সম্পন্ন করিল। কিন্তু নরপিশাচদের নিষ্ঠুরতার এইখানেই সমাপ্তি হইল না। তাহারা ইমামের কর্তিত শির বর্শাগ্রে গাঁথিয়া উঠাইয়া লইল এবং তাঁহার মৃত দেহের উপর অমানুষিক

অত্যাচার শুরু করিল। আব্দুল্লাহ যিয়াদের নির্দেশ ছিল, হুসায়েনকে কোতল করিয়া তাহার ছিন্ন মস্তক কুফায় পাঠাইবে এবং মৃত দেহ অশ্বখুরে দলিত করিয়া ময়দানের খাকে মিলাইয়া দিবে। দুর্বৃত্তেররা তাহাই করিল। তাহারা ইমামের দেহের বস্ত্র উম্মোচন করিয়া ফেলিল এবং তারপর কুড়িজন অশ্বারোহী সেই মৃতদেহের উপর দিয়া নির্মমভাবে পুনঃ পুনঃ অশ্চচালনা করিতে লাগিল। খুরের আঘাতে সোনার অঙ্গ ক্ষত বিক্ষত হইল এবং অস্থি মাংস খণ্ড বিখণ্ড হইয়া মরুভূমির ধুলায় মিশিয়া গেল। যে সুকুমার দেহ ইমামের শৈশবকালে স্বয়ং রসুল্লাহ্ অঙ্গে ধারণ করিয়া আনন্দ পাইতেন এবং পবিত্র ওষ্ঠের স্পর্শ দ্বারা যে মুখ চুম্বিত করিতেন, নির্মম কাফিরগণ নবীর সেই পরম আদরের ধনকে এই ভাবে লাঞ্ছিত করিয়া তাঁহার অস্থি–মাংস শত খণ্ডে কারবালার উত্তপ্ত বালুকায় ছড়াইয়া দিল। তখন আসরের সময় উত্তীর্ণ প্রায়। ইমাম শিবিরে রমণিগণের হাহাকার ও আকুল আর্তনাদ ধ্বনিয়া উঠিল। সূর্যরশ্মি বিবর্ণ হইয়া আসিল। মাতাল লু'হাওয়া দিকহারা হইয়া ধুলায় দিঙ্মণ্ডল আচ্ছন্ন করিল। দিবসের শেষ আলো ম্লান হইয়া, লজ্জায় মুখ লুকাইতে রজনীর দ্বারে অন্ধকারের অবগুণ্ঠন যাচনা করিল।

ইমামের বয়স এই সময় মাত্র ৫৪ বৎসর হইয়াছিল। পরিণত বয়সের অভিজ্ঞতা এবং ষোলকলায় উচ্ছ্বসিত তেজবীর্য যালিমের অত্যাচারের এইভাবে চরম ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইল। পূণ্যের ক্ষীরধারা গতিহারা হইয়া অসময়ে মরু বালুকায় মিলাইয়া গেল। (১০ই মহররম, ৬১ হিঃ– ইংরেজী অক্টোবর, ৬৮০ খৃঃ)।

এই মর্মান্তিক ঘটনা সম্পর্কে আল্‌ফাখরী নামক জনৈক আরব ঐতিহাসিক লিখিয়াছেন–

This is Catastrophe whereof I care not to speak at length as it is too grievous and horrible. For, verily it was a catastrophe than which naught more shameful hath happened in Islam. Verily the murder of Ali was the supreme calamity as from this event there happened there, as foul

slaughters ....and shameful usage as cause men's flesh creep with horrow. May God curse every one of them who had hand there-in, who ordered it and who took part in any part there of-At Fakri.

অনুবাদঃ ইহা এমন একটি শোচনীয় ঘটনা যার সম্বন্ধে বেশী কিছু বলিতে আমার মন সরে না, কেননা ইহা একটি চরম দুঃখদায়ক এবং লোমহর্ষক ব্যাপার। নিশ্চয়ই ইহা এমন একটি বেদনাকর ঘটনা যার চাইতে অধিক লজ্জাজনক আর কিছু ঘটে নাই ইসলামে। অবশ্য আলীর হত্যা ছিল ইসলামের পক্ষে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিপদ। কেননা, এই ঘটনা পর হইতেই এমন সব নৃশংস হত্যাকাণ্ড এবং লজ্জাকর রীতি অনুসৃত হইতে থাকে যার ভয়াবহতা স্মরণ করিলে সর্ব শরীর রোমাঞ্চিত হয়। আল্লা'র অভিসম্পাত পড়ুক সেই সব লোকের প্রত্যেকের উপর যাহাদের হাত ছিল সেই ঘটনায় অর্থাৎ যাহারা হুকুম চালাইয়াছে, এবং যাহারা ইহার সম্পাদনায় কোনও না কোন অংশ গ্রহণ করিয়াছে।

ইমাম পরিবারের কারবালা ত্যাগ

যুদ্ধাবসানে শিমার ও ওমর কতিপয় অনুচর সহ ইমাম শিবিরে প্রবেশ করিল। শিবিরে শোকসন্তপ্তা রমণিগণ অধীরভাবে বিলাপ করিতেছিলেন। স্বামী পুত্রের সদ্য বিয়োগ, আসন্ন লাঞ্ছনা ও ভবিষ্যৎ দুরবস্থা, সব কিছুর চিন্তায় তাঁহাদের উদ্বেল চিত্ত কোনও কূল কিনারা দেখিতে ছিল না। কিন্তু কোনও কিছু গ্রাহ্য না করিয়া দুর্বৃত্তেরা খীমা লুন্ঠন করিল। স্ত্রীলোকদিগের গায়ের মুল্যবান চাদর ও অলঙ্কারাদি কাড়িয়া লইল। তৎপর খীমায় অগ্নিসংযোগ করা হইল এবং খীমার স্ত্রীলোকগণকে বাহিরে আনিয়া যুদ্ধবন্দিনীরূপে দামেস্কে প্রেরণের ব্যবস্থা করা হইল। পীড়িত যয়নুলকেও শীমার বধ করিতে চাহিল। বলিল, হুসায়েন বংশের পুরুষ কাহাকেও জীবিত রাখার হুকুম নাই। কিন্তু ওমর বাধা দিলেন এবং কঠোর আদেশ জারী করিলেন যে, কোন পীড়িত ব্যক্তিকে অস্ত্রাঘাত বা কোন বন্দিনী স্ত্রীলোকের ইজ্জতের উপর হস্তক্ষেপ কিছুতেই বরদাশ্‌ত করা হইবে না।

যুদ্ধ বন্দিনীগণকে লইয়া শিমার কুফা রওয়ানা হইল। তাহার বিশ্বস্ত অনুচর খুলী বিন ইয়াযিদ ইমামের ছিন্নশির বর্শাগ্রে বহিয়া তাহার অগ্রে অগ্রে চলিল। তাহাদের পশ্চাতে 'হাওদা'-শূন্যে উষ্ট্রের নগ্নপৃষ্ঠে চড়ান হইল ইমাম পরিবারের নর-নারিগণকে ও রুগ্ন যয়নুল আবদীনকে। দারুণ গ্রীষ্মের পাথর-ফাটা রৌদ্র তাঁহাদের মাথায় পড়িতে লাগিল। কাফেলা যখন কুফার বাজার অতিক্রম করিতেছিল তখন সহস্র সহস্র লোক তামাশা দেখিবার জন্য রাস্তর দুই ধারে দাঁড়াইয়া গেল। বন্দীনীদের অবস্থা দেখিয়া দর্শকগণের অনেকের হৃদয় গলিয়া গেল। নবী দৌহিত্রের নরনারীদের এই অবস্থা। অনেকে মাথা হেট করিয়া সরিয়া গেল। কিন্তু বনি-উমাইয়াদের

অত্যাচারের ভয়ে কেহই কোনও সহানুভতি প্রকাশের চেষ্টা করিল না।

কাফেলা কুফায় পৌছিলে আব্দুল্লাহ যিয়াদের সম্মুখে একটি রৌপ্যে তশ্‌তুরীনে হুসায়েন-শির স্থাপিত করা হইল। তখন দরবারের সময়। সেই প্রকাশ্য দরবারে বর্বর আবদুল্লাহ্ একটি ছরি দিয়া হুসাইনের দন্তের উপর আঘাত করিতে লাগিল। নবীভক্তদের অন্তর ফাটিয়া যাইতে লাগিল। যায়েদ নামক এক সাহাবী আর সহ্য করিতে পারিলেন না। ধমক দিয়া কহিলেন, খবরদার, ঐ দন্তে আঘাত করিও না; এমন বেয়াদবী আমরা সহিতে পারিব না। আমি ঐ দন্তের উপর হযরত রসূলকে চুমা দিতে দেখিয়াছি। আব্দুল্লাহ যিয়াদ ক্রুদ্ধ হইয়া যায়েদকে হত্যা করিতে উদ্যত হইল, কিন্তু শেষে সভাস্থ লোকদের অনুরোধে তাহাকে প্রাণে না মারিয়া দরবার হইতে বাহির করিয়া দিল।

কুফা হইতে কাফেলা দামেষ্কে রওনা হইল। প্রায় সপ্তাহ কাল দারুণ পথক্লেশ সহ্য করিয়া মৃতপ্রায় বন্দিনিগণ রাজধানীতে উপনীতা হইলেন। শিমার সগর্বে হুসায়েন-মির ইয়াযদের সন্মুখে স্থাপিত করিল এবং পুরষ্কার ও প্রশংসার আশায় উদগ্রীব হইয়া রহিল। বিদ্রোহী হুসায়েন নিহত হইয়াছেন ইয়াযিদের পক্ষে ইহা সুসংবাদ বটে। কিন্তু বিরাট মহিমান্বিত হুসায়েন-শির যখন তাঁহার সন্মুখে আনা হইল তখন ইয়াযিদ চমকিত হইলেন। চীৎকার বরিয়া বলিলেন, খোদা বান্দীবাচ্চাকে জাহান্নামে দিক। হুয়ায়েনকে এরা এভাবে বধ করিবে আমিতো ইহা আশা করি নাই। শিমারের মুখে যুদ্ধের সকল বৃত্তান্ত অবগত হইয়া ইয়াযিদ শিমারকে প্রশংসার পরিবর্তে ভৎর্সনা করিলেন এবং কহিলেন আমি কি হুসায়েনের মৃতদেহ অশ্বপদে দলিত করিতে হুকুম দিয়াছিলাম, না তাহাকে স্ত্রী-পরিজন সহ পিপাসায় শুকাইয়া হত্যা করিতে বলিয়াছিলাম? আমি কি তোমাদিগকে এইরূপ নির্দেশ দিয়াছিলাম? ইমাম যখন আমার নিকট আসিতে চাহিয়াছিল তখন তাহাকে আমার নিকট উপস্থিত করাই বা হয় নাই কেন?

ইয়াযিদের নিকট মোটা পুরষ্কার লোভে শিমার এত কাণ্ড করিয়াছিল। আর তার পরিবর্তে এই ভৎর্সনা! সে ভয়ে ও ক্ষোভে সঙ্কুচিত হইয়া বলিল

হুজুর, এ সমস্তই আবদুল্লাহ্ যিয়াদের আদেশে সম্পাদিত হইয়াছে। আমরা ছিলাম তাঁহার হুকুমের তাবেদার মাত্র। ইয়াযিদ বিমর্ষ হইলেন এবং আবদুল্লাহ যিয়াদের লোকজনকে সংক্ষেপে বিদায় দিয়া হুসায়েন পরিবারকে সম্মুখে আনিতে বলিলেন। তাহাদের দুরবস্থা দর্শনে উদ্ধত ইয়াযিদেরও মমতা, হইল। তিনি তাহাদিগকে বিশ্রামের জন্য তাড়াতাড়ি বন্দিশালায় পাঠাইয়া দিলেন এবং তাহাদের শান্ত ও পানাহারের যাহাতে কোন প্রাকর অব্যবস্থা না হয় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখিবার জন্য রক্ষীদিগের উপর কড়া হুকুম জারী করিলেন। তিনি বন্দিনীগণকে জানাইয়া দিলেন যে হুসায়েনের সহিত তাঁহার বিরোধ ছিল, কারণ তিনি বিদ্রোহ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার নরনারী অথবা সন্তান-সন্ততির প্রতি তাঁহার কিছুমাত্র আক্রোশ নাই (১)।

এদিকে কারবালার পৈশাচিক হত্যাকান্ডের কথা দামেস্কে প্রচারিত হইবার পর নগরবাসীদের মধ্যে গভীর চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছিল। পুরাতনপন্থী লোকেরা সকলেই মর্মাহত হইয়াছিলেন। এক্ষণে ইমামের ছিন্

---

(১) "Yazid, born of a Beduin mother, bred in the free air of the desert, an eager and skiful huntsman, a greceful poet, a gallant lover, fond of wine, music and sport and little concerned with religons, having a handsome face and kingly qualities, might temper our judment (held against him) had it not been for the balck stain which the tragedy of Karbala left on his memory. His reign lasted for three years and six months. In the first year he slew Hussain, in the second year he sacked Madina, and in the third he attacked Kaaba.

The first outrage was not only a crime but also a gigantic blunder which alienated from Yazid and his followers not only the loyalty (it being little then) but also the tacit toletration of the followers of Mahomet. The Shia faction who had hitherto been lacking in enthusiasm and self devotion were all changed henceforth"

—Muir?

মস্তক ও তাঁহার পরিজন বর্গের দুরবস্থা দর্শনে নগরে তাঁহাদের জন্য সমবেদনার স্রোত প্রবল হইয়া উঠিল। সকলের মুখেই কেবল তাঁহাদেরই কথা। রাজধানী এই প্রকার আন্দোলনে তোলপাড় হইয়া উঠিল। পাছে জনমত বিপ্লবীরূপ গ্রহণ করিয়া বিদ্রোহের সূচনা করে এই আশঙ্কায় ইয়াযিদ ইমাম পরিবারকে সত্বর মদীনায় প্রেরণের ব্যবস্থা করিলেন। রাত্রির অন্ধকারে ইমাম-শির গোপনে দামেস্ক হইতে বাহিরে প্রেরণ করা হইল এবং দূরে কোনও এক নিভৃত স্থানে উহা কবর দেওয়া হইল (১)। কুফার ভূতপুর্ব গভর্ণর নবীভক্ত বৃদ্ধ নে'মান্ বিন বশীরকে মদীনাযাত্রী কাফেলার সঙ্গে রক্ষক স্বরূপ প্রেরণ করা হইল। পথে যাহাতে বন্দিনীদের খাদ্য ও পানীয়ের অভাব না হয় সে জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইল।

---

(১) কোনও এক বিবরণে দেখা যায়, সিরিয়ার উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে আস্‌কালান নামক স্থানে ইমাম শিরকে গোর দেওয়া হইয়াছিল। প্রায় শতবর্ষ পরে মিশরে ফাতেমীয় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবার পর তথাকার কোনও এক উযীর ঐ মস্তক আসকালান হইতে মিশরে লইয়া যান এবং নীল নদের পশ্চিম তীরে, আসোয়ান উপত্যকায় উহা পুনরায় কবরস্থ করেন। প্রতি বৎসর মহররমের সময় এই মাযারে লক্ষ লক্ষ লোক সমাগত হয় এবং বিপুল আয়োজনের সহিত শোকানুষ্ঠান পালন করা হয়।

(সম্প্রতি মহামান্য আগা খানের মৃতদেহও আসোয়ানে সমাহিত করা হইয়াছে। ইনিকে ইমাম বংশের ৪৯তম বংশধর বলা হয়।)

কাফেলার মদীনা যাত্রা

কারবালার লোমহর্ষক হত্যাকাণ্ডের সমাপ্ত হইয়াছে। পূণ্যাত্মা শহীদান মরু প্রান্তরে বালুকার সমাধিতে অনন্ত নিদ্রার নিদ্রিত হইয়াছেন। ইসলামের একনিষ্ঠ রক্ষী হুসায়েনকে ধ্বংস করিয়া দাম্ভিক ইয়াযিদ তাঁহার দানবীর অলঙ্কার সার্থক করিয়াছেন। এখন তিনি নিরুদ্বেগে পরম স্বস্তির সহিত সুরার সাধনায় নিমগ্ন হইয়াছেন। সুরার অপরিহার্য উপচার নারী ও নৃত্যগীত তাঁহার বিলাস কক্ষ আমোদিত করিতেছে। অন্যদিকে বিষাদ ক্লিষ্ট হুসায়েন-পরিবার পাষাণদ্রাবী শোকানল হৃদয়ে চাপিয়া দামেস্ক হইতে মদীনার পথে যাত্রা করিয়াছেন।

আটশত মাইল দীর্ঘ মরুপথ। কৃচিৎ কোথাও খর্জুর তরু ও পানির প্রস্রবণ। এই সব দৃশ্য যাত্রীদের মনে হয়ত কারবালার মর্মন্তুদ স্মৃতি জাগাইয়া তুলিতেছিল। আহা! একবিন্দু পানির অভাবে সেখানে স্তন্যপায়ী শিশু মাতৃক্রোড়ে জীবন লীলা সংবরণ করিয়াছে। সিংহ-বিক্রম কাসিম, অমিততেজা আলী আকবর এবং আরও কত না বীর শুষ্ক কণ্ঠে শত্রুহস্তে প্রাণদান করিয়াছে। সর্বোপরি, মহামতি হুসায়েন, ইসলামের জীবন্ত প্রতীক ও ইমাম, তৃষ্ণাকাতর অবস্থায় নির্মম ভাবে নিহত হইয়াছেন। সত্তর জন ভক্ত বীর প্রভুভক্তির চরম নিদর্শন রক্তের আখরে কারবালার বুকে লিখিয়া প্রাণ দান করিয়াছে। কি ভয়াবহ সে ঘটনা! কি ভয়ঙ্কর সেই স্থান। কি দুঃসহ সেই স্মৃতি! দুরন্ত গ্রীষ্ম মরু-বুকে কি দাবদাহেরই না সৃষ্টি করিয়াছিল। আর সেই অবস্থায় মুষ্টিমেয় কতকগুলি মরণোন্মুখে বীর কি অলৌকিক সমরাভিনয়ই না প্রদর্শন করিয়াছে। জগতের ইতিহাসে এমন মর্মান্তিক দৃশ্যের তুলনা নাই। এমন আত্মত্যাগেরও নযীর নাই। সমস্ত

ছবি একে একে যাত্রিগণের নয়নের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিতেছে। তাহাদের কলিজা ফাটিয়া যাইতেছে। কিন্তু যে গিয়াছে সে তো আর ফিরিবে না। শুধু তার স্মৃতিটুকু অক্ষয় হইয়া প্রত্যেকের মনে চিরদিনের তরে জাগিয়া রহিবে। যাত্রীদের প্রাণের হাহাকার শুধু ঐ ক্ষুদ্র কাফেলাতেই নিবদ্ধ থাকে নাই। কারবালার লোমহর্ষক হত্যাকাণ্ডের মর্মান্তিক খবর ইতোমধ্যেই চতুর্দিক ছড়াইয়া পড়িয়াছে এবং সর্বত্র অশ্রুবন্যা প্রবাহিত করিয়াছে।

— — — —

কারবালা হত্যার প্রতিক্রিয়া

মদীনা, মক্কা ও কুফায় বিক্ষোভ

সপ্তম অধ্যায়

মদীনায় বিক্ষোভ

দীর্ঘ মরুপথ অতিক্রম করিয়া ইমাম-পরিবার যখন মদিনায় আসিয়া পৌঁছল, তখন নগরে আবার নূতন করিয়া শোকের মাতম গুমরিয়া উঠিল। ক্ষুব্ধ নাগরিকেরা একবাক্যে দাবী করিতে লাগিল এই অন্যায় হত্যার আশু প্রতিকার। তাঁহারা চাহিল কারবালা যুদ্ধের নায়ক আব্দুল্লাহ যিয়াদ, ওমর, শিমার প্রভৃতি দুর্বৃত্তগণের সমুচিত দণ্ড। সমগ্র মদীনা শহর বিক্ষোভে ফাটিয়া পড়িতে লাগিল। ওসমান বিন আবু সুফ্ইয়ান তখন মদীনার শাসনকর্তা। শান্ত প্রকৃতি ও সদ্ব্যবহারের জন্য তাঁহার সুনাম ছিল। তিনি মদীনার উত্তেজনা ও ইয়াযিদ-বিদ্বেষ প্রশমিত করার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনি নাগরিকদের প্রতি সহানুভূতি জানাইলেন। তাঁহারই পরামর্শে দশজন নেতৃস্থানীয় লোকের এক প্রতিনিধিদল দামেস্কে রওয়ানা হইয়া গেল ইয়াযিদের নিকট প্রতিকার চাহিতে। ইহাদের মধ্যে মন্‌যর বিন যুবায়ের এবং আব্দুল্লাহ্ বিন হান্‌যালা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। গভর্ণর ওসমান পত্র যোগে তাহাদের গমন সংবাদ ও উদ্দেশ্য ইয়াযিদকে পূর্বাহ্ণে জানাইয়া দিলেন। ইহারা দামেস্কে উপনীত হইলে ইয়াযিদ ইহাদিগকে সম্মানের সহিত গ্রহণ করিলেন এবং অর্থাদি উপঢৌকন দিলেন। কিন্তু ইহারা কেহই অর্থের লালসায় সেখানে যান নাই। কাজেই তাঁহারা ইহাতে নরম হইলেন না। তাঁহারা অপরাধীদের বিচার চাহিলেন। কিন্তু ইয়াযিদ সে দিকে মোটেই মনোযোগ দিলেন না; বরং এই প্রকার ধৃষ্টতার জন্য প্রতিনিধিদলকে ধমকাইয়া বিদায় করিয়া দিলেন।

তাঁহারা এই অপমানে এবং ইয়াযিদের প্রকাশ্যে সুরাপান, নৃত্যগীতাসক্তি ও ইসলামের প্রতি উপেক্ষা দর্শনে মর্মাহত হইয়াছিলেন। স্বয়ং খলিফার এই প্রকার চরিত্রদোষ বশতঃ সমগ্র দামেস্ক শহরেও পাপ পাপ ও বিলাসের স্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল। প্রতিনিধিগণ দামেস্ক হইতে ফিরিয়া আসিয়া এই সমস্ত কথা সবিস্তারে প্রচার করিল। তখন মদীনার আবালবৃদ্ধ বনিতা ইয়াযিদের প্রতি ঘৃণা ও ক্রোধে বিরূপ হইয়া উঠিল। তাহারা সমবেত হইয়া একবাক্যে ইয়াযিদের আনুগত্য অস্বীকার করিল এবং আব্দুল্লাহ্ বিন হান্যালাকে তাহাদের নেতৃত্বের পদে বরণ করিয়া সকলে সংঘবদ্ধ হইল। তাহারা প্রথমেই গভর্ণরের প্রসাদ ঘেরাও করিয়া ওসমানকে বন্দী করিল।

কিন্তু আব্দুল্লাহ্ বিন হান্যালা ছিলেন আনসার। কাজেই আবার আনসার–মহাজিরের প্রশ্ন মাথা চাড়া দিল। কুরায়েশ বংশীয় নেতা মন্যর বিন্ যুবায়ের আব্দুল্লা'র নেতৃত্ব সমর্থন করিলেন না, বরং তাঁহাকে ইহার জন্য প্রকাশ্য সভায় ভর্ৎসনা করিলেন। বলিলেন, ইহা তো পূর্বেই স্থির হইয়া আছে যে, ইমামের আসনের জন্য কুরায়েশ বংশই একমাত্র অধিকারী। আব্দুল্লাহহ্ নিজও নেতৃত্ব গ্রহণের জন্য লালায়িত ছিলেন না। তিনি নেতৃত্ব পরিত্যাগ করিলেন এবং কুরায়েশ কাহাকেও এই দায়িত্ব অর্পণের জন্য সভ্যগণকে অনুরোধ করিলেন।

ইমাম যয়নুল আবেদীন

তখন সকলে মিলিয়া শাহযাদা দ্বিতীয় আলী ওরফে যয়নুল আবেদীনের অন্বেষণে বাহির হইলেন। শাহযাদা যয়নুল আবেদীন ছিলেন পিতার দিক দিয়া মদীনার চতুর্থ খলিফা হযরত আলীর পৌত্র আর মাতার দিক দিয়া পারস্যের শেষ সম্রাট ইয়াযদিগার্দের দৌহিত্র। সেদিক দিয়া তিনি ইরান সিংহাসনেরও উত্তরাধিকারী ছিলেন। কাজেই তাঁহার ওয়ারিশী যোগ্যতার অভাব ছিল না। একমাত্র তাঁহারই মাধ্যমে নবীর নির্দেশিত ইমামতের ধারা দুনিয়ায় বিদ্যমান ছিল। শাহযাদা তখন মসজিদের এক নির্জন হুযরায় নিবিষ্টভাবে ওযীফায় রত ছিলেন। বহু লোকের সমাগম শব্দে তাঁহার মনোযোগ আকৃষ্ট হইল। তিনি সমবেত জনসংঘকে দর্শন দিয়া তাহাদের অভিপ্রায় জিজ্ঞাসা করিলেন। মনুযর তাহাদের মুখপাত্র হইয়া আদবের সহিত নিবেদন করিলেন- মাননীয় সৈয়দ, মদীনার অধিনায়কত্বের একমাত্র আপনিই অধিকারী, তাই সমবেত জনসংঘে আপনার অনুগত্য স্বীকার করিয়া আজ আপনাকে মদীনার সিংহাসনে উপবিষ্ট করাইয়া স্বীয় কর্তব্য পালন করিবে, এই সঙ্কল্প লইয়া এখানে উপস্থিত হইয়াছে। আপনি শোকাকুল, আপনাকে বেশী কথা বলিয়া বিরক্ত করিতে আমাদের সাহস হইতেছে না। আমি শুধু এইমাত্র বলিতে চাই যে, যাহারা আপনার এখানে আজ সমবেত হইয়াছে ইহারা সকলেই আপনার আপনার বংশের দাসানুদাস। আপনার সামান্য আঙ্গুলি হেলনে এই সহস্র সহস্র মদীনাবাসী হাসিমুখে আপনার জন্য প্রাণ বিসর্জন করিবে, আপনি তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ করিবেন না। আপনি অনুগ্রহ পূর্বক আমাদের খলিফা হইয়া আমাদিগকে বাধিত করুন।

মনুযরের বক্তৃতার ভিতর আন্তরিকতার আবেগ পরিস্ফুট ছিল। যয়নুল আবেদীন এই জনসংঘের আকুল আহ্বানে মমতায় দ্রব হইয়া গেলেন। তিনি

ধীরে ধীরে উত্তর করিলেন, ভাইসব, বন্ধুরা, আপনাদের শ্রদ্ধা ও সহানুভূতিতে আমি মুগ্ধ হইয়াছি কিন্তু আমার অন্তরের ভিতর যে দাবানল জ্বলিতেছে, পিতৃশোক, ভ্রাতৃশোক, বন্ধুশোক, সকল শোকের দাবদাহে যে ভাবে আমার মর্মস্থল নিপীড়িত হইতেছে, তাহাতে আমি সংসারের কথা, ধনৈশ্বর্য বা সিংহাসনের কথা, কিছুই এখন ভাবিতে পারিতেছি না। আমার আপনজন সমস্তই এখন পরপারে, একা আমি এপারে তাঁহাদের জন্য ব্যথার প্রদীপ জ্বালাইয়া বসিয়া আছি। আমাকে আর আপনারা দুনিয়ার মায়াজালে আবদ্ধ করিবেন না। আমি মুক্তি চাই। মসজিদের নিভৃত কোণে আমি মুক্তির আস্বাদ পাইয়াছি। আমি সেই নিত্য পরমার্থের সন্ধানে রত যার নিকট মণি মাণিক্য ও সিংহাসন কোন্ ছার। আপনারা যদি আমার প্রকৃত হিতৈষী হন তবে আমাকে আশীর্বাদ করুন আমি যেন আমার সেই আকাঙ্ক্ষিত ধন লাভ করিয়া নবীবংশের গৌরব বৃদ্ধি করিতে পারি।

সমবেত জনসংঘ এই কিশোর তাপসের উক্তি শুনিয়া মুগ্ধ হইল। তাহাদের হৃদয় এক অলৌকিক ভাবাবেশে নিষিক্ত হইয়া গেল। কেহ আর কোনও বাক্যস্ফূরণ করিতে পারিল না। সকলেই চিন্তামগ্ন ও মৌন অবস্থায় স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাবর্তন করিল। যে জীঘাংসার ঢেউ সকলের চিত্তে দোলা দিতেছিল তাহাও কিছুটা প্রশমিত হইল। গভর্ণর ওসমানকে তাহারা মুক্তি দিল। পরদিন যয়নুল আবেদীন নগরের কোলাহল এড়াইবার জন্য মদীনা হইতে চার দিনের পথ নেবু নামক স্থানে চলিয়া গেলেন। নেবু তাঁহার পিতার আমলের এক ক্ষুদ্র জায়গীর। এখানে পৌঁছিয়া তিনি নিরুপদ্রবে এক পর্বত গুহায় আরাধনায় লিপ্ত হইলেন। মদীনার রাষ্ট্রীয় বিক্ষোভ আর তাঁহাকে বিভ্রান্ত করিবার আশঙ্কা রহিল না।

মদীনার বিক্ষোভের কথা এবং জয়নুল আবেদীনের বুদ্ধিমত্তা ও আত্মসংযমের কথা শাসনকর্তা ওসমান যথা সময়ে দূত মারফৎ ইয়াযিদের গোচরে আনেন। ইহাতে ইয়াযিদ যয়নুল আবেদীনের উপর সন্তুষ্ট হন এবং প্রকাশ করেন যে আজ হইতে হুসায়েনবংশ আমার আশ্রিত, কেহ আর ইহাদের কেশাগ্রও স্পর্শ করিতে পারিবে না। কিন্তু মদীনাবাসিগণকে আমি

অকৃতজ্ঞতার সমুচিত শাস্তি বিধান করিব। তিনি মদীনাবাসিগণকে আপনার ক্রোধ জ্ঞাপনার্থ নে'মান বিন বশীর নামক এক প্রতিপত্তিশালী আনসারকে তথায় প্রেরণ করিলেন। নে'মান মদীনায় আসিয়া খলিফা ইয়াযিদের ক্রোধ ও আস্ফালনের কথা বিবৃত করিলেন। কিন্তু মদীনাবাসিগণ তাহাতে কিছুমাত্র ভীত বা বিচলিত হইল না। তাহারা বলিল, আমরা ইয়াযিদকে খলিফার অযোগ্য বিবেচনা করিয়াছি, তাই তাঁহার বশ্যতা অস্বীকার করিয়াছি। ইহাতে আমাদের যাহা অদৃষ্টে থাকে তজ্জন্য আমরা প্রস্তুত আছি। পার্থিব মঙ্গলের জন্য আমরা ইসলামের পবিত্র খিলাফৎ কলুষিত হইতে দিতে পারিব না। নে'মান দামেস্কে প্রত্যাবৃত হইয়া ইয়াযিদের নিকট সকল কথা বিবৃত করিলেন। তাঁহার ক্রোধের আর সীমা রহিল না।

ইয়াযিদ সৈন্যের মদিনা আক্রমণ।

ক্রুদ্ধ ইয়াযিদ এই বিদ্রোহ দমনের জন্য মুসলিম বিন ওকবা নামক এক জন দুর্ধর্ষ সেনাপতিকে এক বৃহৎ সৈন্যদল সহ মদীনায় প্রেরণ করিলেন। মুসলিম তাঁহার দুর্বার বাহিনী লইয়া ঝটিকার বেগে মদীনার পথে ধাবিত হইলেন।

মদীনাবাসিগণ এই সংবাদ অবগত হইয়া যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হইতে লাগিল। যুদ্ধারম্ভের পূর্বে তাহারা মদীনায় অবস্থিত উমাইয়াগণের সহিত একটা সন্ধি করিয়া লইল যাহাতে তাহারা যুদ্ধের সময় পশ্চাৎ দিক হইতে মদীনা বাহিনীকে বিপন্ন না করে। স্থির হইল যে, উমাইয়াগণ তাহাদের সক্রিয় সাহায্য না করিলেও অন্ততঃ নিরপেক্ষ থাকিবে এবং যুদ্ধের সময় কোনও প্রকার শত্রুতা করিয়া বা গুপ্ততথ্য পাচার করিয়া শত্রু দলের সাহায্য করিবে না। উমাইয়াগণের পক্ষে তখন উপস্থিত নিরাপত্তার জন্য এইরূপ শর্তে রাজী না হইয়া উপায় ছিল না।

একচক্ষু মুসলিম ছিলেন আফ্রিকা বিজয়ী বিখ্যাত সেনাপতি ওক্‌বার পুত্র। কোনও এক যুদ্ধে তাঁহার একটি চক্ষু বিনষ্ট হইয়াছিল। তাঁহার পিতা ওক্‌বা ইসলাম গ্রহণের পূর্বে এক সময়ে রসূলের মুখে নিষ্ঠীবন নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। বদরের যুদ্ধে ধৃত হইলে হযরত হযরত তাহার প্রাণ বধের হুকুম দিয়াছিলেন। তখন ওক্‌বা বলিয়াছিলেন, আমার মৃত্যু হইলে আমার সন্তানেরা কি খাইবে? হযরত বলিয়াছিলেন, "দুযখের আগুন"। পরে অবশ্য হযরত তাঁহাকে মুক্তি দিয়াছিলেন। মারোয়ানের প্রভাবে খলিফা ওসমান তাঁহাকে উচ্চ পদে নিয়োজিত করেন। তাঁহারই যোগ্য পুত্র মুসলিম ব্যতীত কে আর মদীনা ধ্বংসের ভার প্রাপ্ত হইতে পারিত! ইতিহাসে এই মুসলিমকে "অভিশপ্ত খুনী" (accursed murder) বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে।

মুসলিম বিন ওক্বা যখন মদীনায় পৌছিলেন তখন গভর্ণর ওসমান তাঁহাকে সম্বর্ধনা করিলেন। অন্যান্য উমাইয়াগণও তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিলেন। মুসলিম ইহাদের নিকট মদীনার পথ ঘাট ও যুদ্ধের অনুকুল স্থান সমূহের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। উমাইয়াগণ কহিলেন, আমরা সকলেই কুরায়েশ ও অন্যান্য মদীনাবাসিদের নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ আছি যে, আপনাকে তাহাদের প্রতিকুলে কোনও তথ্য সরবরাহ করিব না। মুসলিম তখন চিন্তিত হইলেন এবং কহিলেন, আপনারা যদি সাহায্য না করেন তবে এই নূতন যায়গায় আমি কিরূপে যুদ্ধে জয়লাভ করিব? যে প্রকারে হউক আপনাদিগকে আমার সাহায্য করিতেই হইবে। তখন গভর্ণর ওসমান কহিলেন, এখানে এক ব্যক্তি আছেন যিনি কাহারও সহিত প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন নাই; সম্ভবতঃ তিনি অপনাকে অনেক তথ্য প্রদান করিতে পারিবেন। তখন ফকীরবেশী এক যুবককে তথায় হাজির করা হইল। ইনি মারোয়ান-পুত্র আব্দুল মালিক। দিবারাত্রি ইনি মসজিদে বসিয়া উপাসনা ও কুরআন তেলাওয়াত করিতেন। ইনি মুসলিমকে এখন সকল তথ্য কৌশল জ্ঞাপন করিলেন যে মুসলিম বিস্মিত হইলেন। একজন উদাসীন ফকীর যে ভিতরে ভিতরে এমন পাকা রাজনীতিক হইয়া বসিয়া আছে পূর্বে তাহা কেহই ভাবিতে পারে নাই(১)।

মদিনাবাসিগণ মুসলিমের আগমনের পূর্বেই শহরের চতুস্পার্শে গড়খাই খনন করিয়া শহরকে সুরক্ষিত করিয়াছিল। কিন্তু আবদুল মালিক মুসলিমকে এমন একটি গোপন পথের সন্ধান বলিয়া দিলেন যে মদীনাবাসীদের খোদিত গড়খাই কোনও কাজে আসিল না। অগত্যা, নগরের ভিতর বন্দীভাবে নিস্পেষিত হইবার আশঙ্কায় মদীনার যুদ্ধার্থিগণ বাহিরে আসিয়া উন্মুক্ত ময়দানে ইয়াযীদ বাহিনীর সম্মুখীন হইল। তাহারা ফাযিল বিন

---

(১) ইয়াযিদ ও মারোয়ানের মৃত্যুর পর এই আব্দুল মালেকই দামেস্কের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার মত শক্তিশালী ও বিচক্ষণ সম্রাট উমাইয়াকূলে আর জন্মে নাই। তাঁহার মত ইসলামের দুশমনও দুনিয়ায় কমই জন্মিয়াছে।

আব্বাসকে সেনাপতিত্বে বরণ করিয়া একটি চক্রাকার ব্যূহ রচনা করিল। উহার দক্ষিণ ও বাম পক্ষ বিশেষ ভাবে দৃঢ়ীকৃত করিয়া ফাযিল নিজে মধ্যভাগ পরিচালনা করিতে লাগিলেন। মুসলিম বিন ওক্‌বা তখন পীড়িত। তিনি সেই অবস্থায়ই তাঁহার বিরাট বাহিনী সুবিন্যস্ত করিয়া নিজে মধ্যস্থলে শিবিরাভ্যন্তরে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ফাযিলের রণকৌশলে মদীনা বাহিনী এতই অনুপ্রাণিত হইয়াছিল যে; তাহাদের প্রথম আক্রমণেই দামেস্ক সৈন্যদল ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল। মহাবীর ফাযিল দ্রুত অশ্ব পরিচালনা করিয়া একেবারে সেনাপতি মুসলিমের শিবির সম্মুখীন হইলেন এবং তাঁহাকে দ্বৈরথ যুদ্ধে আহ্বান করিলেন। তিনি জানিতেন না যে মুসলিম পীড়িত। মুসলিমের শিবির সম্মুখে তদীয় ক্রীতদাস তাঁহারই রণসাজ পরিয়া সৈন্যগণকে প্রত্যাবর্তন করিতে আহ্বান করিতেছিল। ফাযিল প্রবল বেগে তাঁহার উপর আপতিত হইলেন। হতভাগ্য দাস ফাযিলের প্রথম আঘাতেই দ্বিখণ্ডিত হইয়া ভূতল রঞ্জিত করিল। ফাযিল মহা উল্লাসে চীৎকার করিয়া কহিলেন– মুসলিমকে নিহত করিয়াছি; আজিকার যুদ্ধে আমাদের জয়। মদীনা সৈন্য এই জয়ধ্বনিতে উল্লসিত হইয়া বিজয় নিশান উড্ডীন করিয়া সিরিয়গণের পশ্চাদ ধাবন করিল। সিরিয়গণ ত্রাসে উর্ধ্বশ্বাসে রণক্ষেত্র ছাড়িয়া পলায়ন করিতে লাগিল। রুগ্ন শয্যা হইতে মুসলিম ইহা লক্ষ্য করিলেন। তিনি মৃত্যু অনিবার্য জানিয়া প্রাণের মমতা ত্যাগ করিয়া ক্ষিপ্ত গতিতে অস্ত্রগ্রহণ করিলেন এবং অশ্বে আরোহণ করিয়া ফাযিল বিন আব্বাসকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মূর্খ, কাহাকে বধ করিয়াছ? দেখ, এই মুসলিম তোমার সম্মুখে দণ্ডায়মান। ফাযিল বিনস্ময় চকিত নেত্রে তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিয়া বীর বিক্রমে তাঁহার দিকে ফিরিয়া দাড়াইলেন এবং নিষ্কোষিত তরবারি হস্তে তাহার দিকে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু অধিক দূর অগ্রসর হইতে হইল না। বিদ্যুৎবেগে মুসলিমের সুতীক্ষ্ণ তীর ফাযিলের বক্ষ বিদ্ধ করিয়া তাঁহাকে ভূতলশায়ী করিল। মদীনা সৈন্যের ভিতর তাহার ন্যায় যোদ্ধা আর কেহ ছিল না। তাঁহার পতনে মদীনা সৈন্য হতবুদ্ধি হইয়া পড়িল। যায়েদ

বিন আবদুর রহমান অবিলম্বে ফাযিলের পতাকা গ্রহণ করিয়া সৈন্য পরিচালনা করিতে লাগিলেন। এবং মুসলিমের দিকে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু মুসলিম ক্ষিপ্রগতিতে বর্শা দ্বারা তাহাকে নিপাতিত করিলেন। তখন আবদুল্লাহ ইবনে হানযালা মদীনা সৈন্যের নেতৃত্ব গহণ করিলেন, কিন্তু তাহাদের আর উৎসাহ রহিল না। ওদিকে সিরীয় সৈন্য মুসলিমের এই অসাধারণ বিক্রম দর্শনে ঘুরিয়া দাঁড়াল এবং মদীনা সৈন্যের উপর পুনরায় ভীমবেগে আপতিত হইল। সিরীয় বাহিনীর অন্যতম সেনাপতি হাসীন বিন নমীর তাহাদিগকে পরিচালনা করিতে লাগিলেন। মুসলিমের পরেই রণকৌশলে হাসীন অদ্বিতীয় ছিলেন। ইনি বীরবিক্রমে যুদ্ধ করিতেছিলেন। আব্দুল্লাহ ইবনে হানযালার তিন পুত্র তাঁহার চোখের সম্মুখে হাসীনের হস্তে শহীদ হইল। আব্দুল্লাহ ইবনে হানযালা তখন ক্ষিপ্তপ্রায় অবস্থায় অশ্বপৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিয়া বর্শাহস্তে পদব্রজে তাঁহার সম্মুখীন হইলেন। হাসীন ও তাঁহার সহকারী যোদ্ধাগণও তখন অশ্বপৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিয়া ধনুর্বাণ হস্তে আব্দুল্লাহ ইবনে হানযালার উপর আপতিত হইলেন। পুত্রশোকাতুর আব্দুল্লাহ ইবনে হানযালা জীবনের মায়া পরিত্যাগ করিয়া কালান্তক যমের ন্যায় হাসীনের উপর অস্ত্র প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। হাসীন তাঁহার প্রতাপ সহ্য করিতে না পারিয়া পশ্চাদবর্তী হইতে লাগিলেন। মুসলিম তখন শিবিরে বিশ্রাম গ্রহণ করিতেছিলেন। নিরুপায় হইয়া তিনি পুনরায় অস্ত্রধারণ করিলেন এবং হাসীনের সাহায্যে অগ্রসর হইলেন। তিনি অকস্মাৎ আব্দুল্লাহ ইবনে হানযালাকে পার্শ্বদেশ হইতে আক্রমণ করিলেন। আব্দুল্লাহ ইবনে হানযালা সদলবলে নিহত হইলেন। ইহার ফলে মদীনা সৈন্য ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। সিরিয়গণের আর কেহ গতিরোধ করিতে সমর্থ হইল না। তাহারা বিনা বাধায় একেবারে মদীনার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিল।

মদীনা লুণ্ঠন ও নাগরিকদের হত্যা

মুসলিম তাঁহার সৈন্যদলকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন- বীর সৈন্যগণ, যুদ্ধজয় শেষ হইয়াছে। তোমরা খলিফা ইয়াযিদের গৌরব রক্ষায় সমর্থ হইয়াছ। পুরস্কার স্বরূপ আমি তোমাদিগকে তিন দিনের জন্য মদীনার উপর যথেচ্ছাচারের অনুমতি দিতেছি। এই তিন দিন তোমরা মদীনাবাসীদের উপর যুলুম, লুটতরাজ বা ধ্বংসে যাহা কিছু কর তাহাতে কেহ তোমাদের কৈফিয়ৎ চাহিবে না।

এ কথার ফলাফল অনুমেয়। বন্য শার্দুলের ন্যায় তাহারা নগরবাসীদের উপর আপতিত হইল। তিন দিন ব্যাপীয়া তাহাদের উপর যে নিষ্ঠুর নির্যাতনের অভিনয় চলিল ইতিহাসে তাহার তুলনা নাই। বালক বৃদ্ধ যুবা কাহারও ভেদাভেদ রহিল না। রমণিগণও পরিত্রাণ পাইল না। প্রতিগৃহে লুণ্ঠন ও ধ্বংসের করুণ আর্তনাদ উত্থিত হইল। বিজয়ী সৈন্যরা যে যাহা পাইল লুটিয়া লইল; লুটের যোগ্য নয় এমন যাহা সম্মুখে পাইল ধ্বংস করিল। সোনার মদীনা ছারখার হইয়া গেল। নূর নবীর পবিত্র গৃহও অত্যাচারীর নির্মম আঘাতে হতশ্রী হইয়া গেল। পথে পথে গলিতে গলিতে রক্তের স্রোত প্রবাহিত হইল।

সংসার বিরাগী ফকীর ও আউলিয়াগণকে হুযরা হইতে টানিয়া বাহির করা হইল। প্রহারে জর্জরিত হইয়া তাঁহারা নগর ত্যাগ করিয়া পর্বত গুহা ও জঙ্গলে আশ্রয় লতে বাধ্য হইলেন। কথিত আছে, আশী জন সাহাবা ও সাত শত ক্বা'রী এই নির্বিচার হত্যাভিযানে নিহত হইল। ইয়াযিদ সৈন্যেরা শুধু দুই ব্যক্তিকে বিনা নির্যাতনে ছাড়িয়া দিয়াছিল। তন্মধ্যে একজন হুসায়েনের পুত্র যয়নুল আবেদীন ওরফে দ্বিতীয় আলী এবং দ্বিতীয় হযরত আব্বাসের পৌত্র প্রথম আলী।

তিন দিন পর পাষাণপ্রাণ তাঁহার সৈন্যদলকে আহ্বান করিয়া সরাইয়া লইলেন। সার্বজনীন হত্যার স্রোত বন্ধ হইয়া গেল। তখন শুধু যাহারা ইয়াযিদের নিকট বশ্যতা স্বীকার করিবে না তাহাদের মস্তকের জন্য মুসলিমের অসি কোষমুক্ত রহিল। এইভাবে মদীনার মেরুদণ্ড চূর্ণ হওয়ার পর ইয়াযিদের বশ্যতা সর্বত্র স্বীকৃত হইল (৬৮২ খৃঃ)।

অষ্টম অধ্যায়

মক্কায় বিদ্রোহ

মদীনার পৈশাচিক হত্যাকাণ্ড ও লুণ্ঠন সমাপ্ত হইলে ইয়াযিদ মক্কার জননায়ক আবদুল্লাহ ইব্‌নে যুবায়েরকে দণ্ড দিতে মনস্থ করিলেন এবং মুসলিমকে তাঁহার সমগ্র বাহিনী লইয়া অবিলম্বে মক্কা আক্রমণ করিতে আদেশ করিলেন। কারণ আব্দুল্লার নেতৃত্বে মক্কাবাসিগণও ইয়াযিদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছিল। মুসলিম সসৈন্যে মক্কা যাত্রা করিলেন। কিন্তু কা'বাঘরের শত্রুতা করিতে গিয়া কে কবে শান্তিতে ফিরিতে পারিয়াছে? সেনাপতি আব্‌রাহার দুর্ভাগ্য ইহার দৃষ্টান্ত স্থল। মক্কার পথে যাত্রা করিয়া মুসলিমও পথিমধ্যে মৃত্যুবরণ করিলেন। হাসীন ইব্‌নে নমীরের হস্তে সৈন্যদলের ভার অর্পণ করিয়া তিনি স্বীয় কৃতকর্মের জবাবদিহি করিতে জীবনের পরপারে চলিয়া গেলেন।

কারবালার লোমহর্ষক হত্যাকাণ্ডের কথা মক্কায় প্রচারিত হইবার মাত্র মদীনার মতই মক্কায়ও জনগণ শোকে ও ক্রোধে অধীর হইয়া পড়ে। তাহাদের নেতা, হযরত আবুবকরের দৌহিত্র, আব্দুল্লাহ ইব্‌নে যুবায়ের মক্কার মসজিদে. মিম্বরের উপর হইতে কারবালার মর্মভেদী অত্যাচারের কাহিনী বিবৃত করিয়া যে জ্বালাময়ী বক্তৃতা করেন তাহা পৃথিবীর যুদ্ধ-ইতিহাসে স্মরণীয় হইয়া আছে। তাঁহার বক্তৃতার পর সাব্যস্ত হয়, যাহারা নবীবংশের ধ্বংস সাধনের চেষ্টা করিয়াছে তাহাদের নিকট কেহ জীবন থাকিতে আনুগত্য স্বীকার করিবে না। পক্ষান্তরে, আব্দুল্লাহ ইব্‌নে যুবায়ের মক্কা, মদীনা ও ইয়ামেনের খলিফা হইবেন।

হিজায ও ইয়ামেন প্রদেশের অন্যান্য শহরে অনুরূপ আলোড়ন সৃষ্টি হয়। তথাকার লোকেরাও দামেস্কের কর্তৃত্ব অস্বীকার করে এবং ইব্‌নে

যুবায়েরকে তাহাদের নেতা নির্বাচিত করিয়া সহজেই তাঁহার নিকট বশ্যতার বায়াৎ স্বীকার করে।

মক্কার গভর্ণর ওলীদ এ সংবাদও যথা সময়ে ইয়াযিদের গোচরে আনেন। ইয়াযিদ তাঁহার পিতা মুয়াবিয়ার মুখে আব্দুল্লাহ্ ইব্‌নে যুবায়েরের সম্বন্ধে অনেক কথাই পূর্বে অবগত হইয়াছিলেন। তাঁহাকে বন্দী করিয়া শৃঙ্খলিত অবস্থায় দামেস্কে প্রেরণের জন্য ইয়াযিদের একগাছি রৌপ্যশৃঙ্খল প্রস্তুত করাইয়া দূত মারফত উহা ওলীদের নিকট প্রেরণ করেন। দামেস্কের দূত যখন উক্ত শৃঙ্খলসহ মক্কায় পৌছিল এবং ওলীদকে ইয়াযিদের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিল তখন ওলীদ বলিলেন, ইয়াযিদ ভুল বুঝিয়াছেন। ইব্‌নে যুবায়েরকে কব্‌জায় আনা অত সহজ কার্য নহে। তোমরা চেষ্টা করিয়া দেখিতে পার। আমি এ কার্যের মধ্যে নাই। দূতেরা হতাশ হইয়া ফিরিয়া গেল। ইয়াযিদ অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন এবং ওলীদকে সরাইয়া তাঁহার স্থলে ওসমান বিন্ আবু সুফ্‌ইয়ানকে মক্কা ও মদীনার গভর্ণর নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলেন। ওলীদ একজন প্রতাপশালী সেনানায়ক ও সুদক্ষ শাসক ছিলেন। এ হেন ব্যক্তির অপসারণে ইব্‌নে যুবায়েরের উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথ সহজ হইল। তিনি ইয়াযিদের সহিত শক্তি পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইলেন।

ইয়াযিদ বাহিনীর মক্কা অভিযান

ইতোমধ্যে ইয়াযিদের সেনাপতি মুসলিম মদীনা লুন্ঠনের পর মক্কা অভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন। পথে তাঁহার মৃত্যু ঘটিল, কিন্তু অভিযান বন্ধ রহিল না। তাঁহার স্থলবর্তী নূতন সেনাপতি হাসীন বিন নমীর অনতিবিলম্বে সসৈন্যে মক্কায় উপনীত হইলেন এবং নগর উপকণ্ঠে শিবির স্থাপন করিলেন।

আব্দুল্লাহ্ ইব্‌নে যুবায়ের শত্রু সৈন্যের আগমন সংবাদ অবগত হইয়া মক্কাবাসিদিগকে আহ্বান করিলেন এবং সকলকে অস্ত্র ধারণ পূর্বক যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হইতে নির্দেশ দিলেন। আব্দুল্লাহ্ একজন সাহসী যোদ্ধা ও বিচক্ষণ সেনানায়ক ছিলেন। শত্রুকে তিলমাত্র অবকাশ দিতে তিনি ইচ্ছুক ছিলেন না। দ্রুত অগ্রসর হইয়া তিনি মক্কার বাহিরে উন্মুক্ত ময়দানে শত্রুসৈন্যের গতিরোধ করিলেন। দক্ষিণে তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা খ্যাতনামা যোদ্ধা মন্‌যর ইব্‌নে যুবায়ের ও বামে মস্তুমা বিন মখরমা নামক আর এক সুদক্ষ সেনাপতি সৈন্য পরিচালনা করিতে লাগিলেন। আব্দুল্লাহ্ স্বয়ং মধ্যস্থল হইতে হুকুম জারী করিতে লাগিলেন। সিরীয় সৈন্যগণ মদিনা জয় করিয়া অত্যাধিক উৎসাহিত হইয়া উঠিয়াছিল। তাহারা কালান্তক যমের ন্যায় মক্কা বাহিনীর উপর আপতিত হইল। ভীষণ সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। মক্কা সৈন্যের দক্ষিণ ভাগ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। মন্‌যর স্বয়ং নিহত হইলেন। মক্কাবাসিগণ ভগ্নোৎসাহ হইয়া পড়িল। তখন আব্দুল্লাহ্ সৈন্যগণকে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া সুকৌশলে পশ্চাতে সরিলেন এবং নগরের ভিতর আশ্রয় লইলেন।

কা'বাঘরের অবমাননা।

ইহা দেখিয়া সিরীয় সৈন্যগণ মক্কা ঘিরিয়া ফেলিল। বাহিরের পর্বতমালা ও উচ্চভূমি হইতে তাহারা নগরের ভিতর প্রস্তর বর্ষর করিতে লাগিল। মক্কার গৃহরাজি, এমন কি হেরেম শরীফ পর্যন্ত তাহাতে ক্ষতিগ্রস্ত ও ভগ্নশ্রী হইয়া পড়িল। যখন তাহাতেও নগরী আত্ম-সমর্পণ করিল না। তখন তাহারা হাওয়াই বাজির সাহায্যে মক্কার বস্তিসমূহের ভিতর জলন্ত অগ্নি-বলয় নিক্ষেপ করিতে লাগিল। ইহাতে লোকের বাড়ী ঘর পুড়িতে লাগিল। পানি সে দেশে অপ্রতুল। তাহাতে আবার রৌদের তেজ অতি প্রখর। অগ্নি নির্বাণ একরূপ অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইল। নাগরিকদের দুঃখের আর সীমা রহিল না। বিলাসিতায় চির অভ্যস্ত মক্কাবাসীগণ অনন্যোপায় হইয়া একান্তমনে আল্লা'কে ডাকিতে লাগিল। যাঁহার ঘর তাঁহারই উপর উহার রক্ষার দায়িত্ব অর্পণ করিয়া তাহারা বিপদ-মুক্তির জন্য নামাজ ও আল্লা'র যিক্র ইত্যাদিতে মাতিয়া গেল। অবশেষে আল্লা'র দরবারে বোধ হয় তাহাদের আকুল প্রার্থনা মঞ্জুরী লাভ করিল। অকস্মাৎ একদিন সিরীয় শিবিরে অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল। অস্ত্রাগারে কোনও এক ব্যক্তির অসাবধানতার ফলে এই আগুন লাগিয়া যায়। অস্ত্রাগার ভস্মীভূত হইল এবং সেই সঙ্গে বহু মানুষও পুড়িয়া মরিল। সৈন্যরা ইহাতে ভয় পাইয়া গেল এবং সেনাপতি হাসীনকে বলিল, আর না, আল্লা'র ঘরের সহিত বেয়াদবী করিতে গিয়া আমাদের যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে। এখন চল সব দামেস্কে ফিরিয়া যাই। হাসীন কহিলেন, তোমরা দৈর্য ধারণ কর, আমি দামেস্কে পত্র লিখিয়া ইয়াযিদের নির্দেশ আনয়ন করি। ইয়াযিদের আদেশ না আসা পর্যন্ত তোমরা এখানে স্থিরভাবে অবস্থিতি কর। সৈন্যগণ উৎকণ্ঠিতভাবে দিন যাপন করিতে লাগিল। ইতোমধ্যে জনরব প্রচারিত হইল যে, ইয়াযিদ

আর ইহজগতে নাই। তখন সৈন্যগণের মধ্যে আরও চাঞ্চল্য ও নৈরাশ্যের সঞ্চার হইল। হাসীন সৈন্যগণকে শান্ত করিবার অভিপ্রায়ে কহিলেন, এ সংবাদ আদৌ সত্য নহে; কুচক্রী আব্দুল্লাহ্ ইবনে যুবায়েরের প্রচারিত মিথ্যা সংবাদ মাত্র। কিন্তু সত্য চাপা রহিল না। দুই তিনদিন পরেই দামেস্কের কাসেদ মক্কায় পৌছিল এবং তাহার মুখে নিশ্চিত সংবাদ জানা গেল যে, সত্যই ইয়াযিদ মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। হাসীন তখন চতুর্দিকে অমঙ্গলের সঙ্কেত লক্ষ্য করিয়া অগত্যা সৈন্যদল সহ ভগ্ন হৃদয়ে মক্কা ত্যাগ করিলেন (নভেম্বর, ৬৮৩ খৃঃ)।

আবদুল্লাহ্ ইবনে যুবায়েরের খিলাফৎ

অবরোধ হইতে মুক্ত হইয়া আবদুল্লাহ্ ইবনে যুবায়ের এই সুযোগে নিজেকে মুসলিম জাহানের খলিফা বলিয়া ঘোষণা করিলেন। অলৌকিক ঘটনা পরম্পরার ভিতর দিয়া জয়লাভ করায় লোকে তাঁহাকে আল্লা'র মনোনীত বান্দা বলিয়া বিশ্বাস করিল এবং তাঁহার উপর আস্থা স্থাপন করিল। হিজায ইয়ামেন ইরাক ও বসরা অঞ্চল সহজেই তাঁহার খিলাফতের দাবী মানিয়া লইল। অতঃপর এইসব স্থানে তাঁহার নিয়োজিত শাসকগণযথারীতি কার্য করিতে লাগিল।

ওদিকে দামেস্কে সিংহাসন লইয়া গণ্ডগোল উপস্থিত হইয়াছিল। ইয়াযিদ মাত্র তিন বৎসর তিন মাস রাজত্ব করার পর আকস্মিক দুর্ঘটনায় প্রাণ ত্যাগ করেন। মৃগয়া হইতে প্রত্যাবর্তন কালে তাঁহার অশ্বের পদস্খলন হওয়ায় তিনি ভূপতিত হন এবং গুরুতর রূপে আহত হইয়া পথিমধ্যে তাঁহার এক শিকারগৃহে প্রাণ ত্যাগ করেন। তখন তাঁহার বয়স মাত্র চল্লিশ বৎসর হইয়াছিল(১)।

---

(১) যয়নাল উদ্ধার ও ইয়াযিদ বদের উদ্দেশ্যে হানাফিয়ার দামেস্কে গমন, ইয়াযিদের পরাজয় ও পলায়ন এবং হানাফিয়া কর্তৃক পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া কোনও কূপ মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ, ইত্যাদি মুখরোচক গল্পসমূহ একান্ত অমূলক ও কাল্পনিক কিচ্ছা মাত্র। বস্তুতঃ যয়নুলকে উদ্ধারের জন্য কাহাকেও দামেস্কে যাইতে হয় নাই, মুহম্মদ হানাফিয়াকে ইয়াযিদের বিরুদ্ধে কখনও যুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে হয় নাই। যয়নুলকে মদীনার সিংহাসনে কখনও বসানও হয় নাই। ইয়াযিদ ছিলেন তৎকালীন সমগ্র মুসলিম জাহানের একচ্ছত্র সম্রাট। সিরিয়া, মক্কা, মদীনা, ইয়ামেন, ইরাক, পারস্য, মিশর ও প্যালেষ্টাইন ছিল তাঁহার শাসনাধীন। পক্ষান্তরে হানাফিয়া কোনও দেশের রাজা ছিলেন না। এহেন হানাফিয়ার পক্ষে ইয়াযিদকে আক্রমণ কল্পনারও অগোচর।

তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র দ্বিতীয় মু'আবিয়া দামেস্কের সিংহাসনে আরোহণ করেন। দ্বিতীয় মু'আবিয়া ছিলেন সাত্বিক ধরনের যুবক। উমাইয়া নেতাগণ তাঁহাকে সিংহাসনে বসায়। কিন্তু তিনি রাজপ্রাসাদের বিলাস ও ব্যাভিচার এবং রাজপুরুষদের অত্যাচার ও অবিচার দেখিয়া সিংহাসনের প্রতি বিতৃষ্ণ হইয়া উঠেন। মাত্র নয় মাস কাল রাজত্ব করিয়া তিনি সিংহাসন ত্যাগ করেন এবং মসজিদে গিয়া নির্জন উপাসনায় কালাতিপাত করিতে থাকেন। সেখানে চল্লিশ দিন এইভাবে কাটিবার পর কোনও অজ্ঞাত কারণে তাহার প্রাণ বিয়োগ হয়, বিষ প্রয়োগ ইহার কারণ বলিয়া অনেকের ধারনা। ইয়াযিদের দ্বিতীয় পুত্র খালেদ তখন নাবালক। তাই সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য আমীর মু'আবিয়ার জ্ঞাতি ভ্রাতা ও প্রাক্তন মন্ত্রী কূটনীতি বিশারদ মারোয়ান খালেদের যৌবন প্রাপ্তি সাপেক্ষে সিংহাসনে আরোহন করেন। মারোয়ান ছিলেন উমাইয়া বংশীয় হাকামের পুত্র। বৃদ্ধ হইলেও মারোয়ান তখনও কর্মদক্ষ ছিলেন। তিনি দূরবর্তী প্রদেশগুলিকে পুনরায় আয়ত্তে আনার চেষ্টা করেন। মিশর সহজেই দামেস্কের শাসনাধীনে ফিরিয়া আসিল। সিরিয়ার পূর্ব সীমান্তে শক্তিশালী মুজহারিট সম্প্রদায় বিদ্রোহী হইয়াছিল। তিনি স্বয়ং তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে নির্মূল করিলেন। ফলে মুসলিম জাহানের উত্তর ও পশ্চিম ভূ-ভাগ থাকিল দামেস্কের খলিফা মারোয়ানের অধীনে, আর দক্ষিণ-আরব (হিযাজ ও ইয়ামেন) এবং পূর্ব আরব (ইরাক ও ইরান) রহিল মক্কার খলিফা আব্দুল্লাহ্ ইব্‌নে যুবায়েরের শাসনাধীন। আব্দুল্লাহ এইসব এলাকা লইয়া প্রায় নয় বৎসরকাল মক্কায় স্বাধীনভাবে রাজত্ব করেন। মক্কার বিদ্রোহ এইভাবে দক্ষিণ ও পূর্ব আরবকে উমাইয়া শাসনের নাগপাশ হইতে মুক্ত করিয়া সাফল্য মণ্ডিত হইয়াছিল।

নবম অধ্যায়

কুফায় বিপ্লব

কারবালা-যুদ্ধের পর হইতেই ইরাকে ভিতরে ভিতরে বিদ্বেষের বহ্নি ধূমায়িত হইতেছিল। ইরাকের লোকেরা বিশেষ করিয়া কুফাবাসীরা অনেকে এই যুদ্ধে প্রধান অংশ গ্রহণ করিয়াছিল। ইমাম পরিবারের ভাগ্য বিপর্যয়ের পর এই অঞ্চলে লোকদের ভিতর অনুসূচনা হয়। কারন এই অঞ্চলে বেশীর ভাগ লোক ছিল শিয়া মতাবলম্বী। তাহারা ছিল আলী ভক্ত। তাহাদের ভাবাবেগ এই সময় প্রবল আকার ধারণ করে। কারবালার প্রান্তরে কুফাবাসীদের নিকট ইমাম হুসায়েনের জীবন ভিক্ষার আকুল আবেদন ব্যর্থ হইয়াছে। ইহা শ্রবণে কুফার শিয়াদের মর্মস্থল দগ্ধ হইতেছিল। তাহাদের মনস্তাপের সীমা ছিল না। সুন্নীদের ভিতরও নবীর দৌহিত্রকে কে না ভালবাসিত? তাহা ছাড়া ইয়াযিদ-সৈন্যের সহিত মদীনার যুদ্ধে আশি জন সাহাবী এবং সাত শত ক্বা'রী নিহত হইয়াছিল। এই সকল শহীদানের লহু এবং মক্কার কা'বা ঘরের অবমাননার প্রতিশোধ চাহিতেছিল দুষ্কৃতিকারীদের প্রতিকূলে। হিজরী ৬৫ সনে সমস্ত বিক্ষোভ ইরাকের রাজধানী কুফায় কেন্দ্রীভূত হয় এবং এক ভয়াবহ বিস্ফোরণের সূচনা করে। নিয়তির আশ্চর্য বিধান, এই কুফাতে বসিয়া একদা আবদুল্লাহ ইবনে যিয়াদ ও তাহার সহকর্মীরা তাহাদের পাপবুদ্ধি চালিত করিয়াছিল ইমামের বিরুদ্ধে। আজ সেই কুফাতেই তাহাদের বিরুদ্ধে মারণাস্ত্র শাণিত হইতে লাগিল ক্রুদ্ধ বিদ্রোহীদের হস্তে (৬৮৪ খৃঃ)।

আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়েরকে খলিফা মানিয়া কুফাবাসীরা বড় আশায় বুক বাঁধিয়াছিল। তাহারা ভাবিয়াছিল,আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের, যিনি কারবালা হত্যার দোহাই দিয়া জনগণের সমর্থন কুড়াইয়াছিলেন, তিনি

খলিফা হইয়া অবশ্যই ইমাম হুসায়েনের অন্যান্য শহীদের জন্য জিহাদ ঘোষণা করিলেন। কিন্তু আব্দুল্লাহ যখন সে সম্বন্ধে কোনই উচ্চবাক্য করিবেন না, শুধু রাজ্য বিস্তারেই ব্যস্ত রহিলেন তখন তাহারা নিজেরাই প্রতিকারের জন্য গোপন পরামর্শে লিপ্ত হইল। একদা দশ হাজার ইরাকী মুসলিম কুফায় জমায়েত হইয়া হুসায়েন-হত্যার প্রতিশোধ লইবার জন্য সোলায়মান বিন সুরদ নামক এক প্রবীণ ও শ্রদ্ধেয় সাহাবীর নেতৃত্বে আল্লা'র নামে শপথ গ্রহণ করিল। এক রাত্রিতে তাহারা সকলে কারবালা প্রন্তারে উপনীত হইল এবং সমস্ত রাত্রি শহীদ হুসায়েনের মাযারের পার্শে অশ্রুবর্ষণ ও প্রার্থনা করিয়া কাটাইল। পরদিন প্রভাতে তাহারা তপঃশুদ্ধ অন্তরে সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়া অস্ত্র ধারণ করিল এবং ঝটিকার ন্যায় দামেস্কের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। তাহারা নিজদিগকে "মালামাতীয়া" অর্থাৎ অনুতপ্ত বলিয়া আখ্যা দিয়াছিল। পথে যাহাকে সম্মুখে পাইল তাহাকেই তাহারা সংহার করিয়া চলিল। শত্রু পক্ষের সব কিছু তাহারা ধ্বংস করিয়া প্রাণের জ্বালা মিটাইতে লাগিল। সমগ্র সিরিয়া প্রদেশ কম্পিত হইল। অবস্থা দর্শনে দামেস্কের খলিফা মারোয়ান শঙ্কীত হাসীন বিন নমীরের অধীনে এক বৃহৎ সৈন্যদল তাহাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। সুলায়মান ও তাঁহার ঝটিকা বাহিনী হাসীন কর্তৃক আক্রান্ত হইল। দামেস্কের সুশিক্ষিত সৈন্যবাহিনীর সম্মুখে শৃঙ্খলাহীণ ইরাকিগণ যুদ্ধে টিকিতে পারিল না। তাহাদের নেতা সুলায়মান ও তাঁহার সঙ্গীয় বিশিষ্ট বীরগণ নিহত হইলেন। অবশিষ্ট বিদ্রোহীদল ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া কুফায় আত্মগোপন করিল। এইরূপে সাহাবী সুলায়মানের পরিচালিত প্রতিশোধ চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবষিত হইল।

কুফার বিদ্রোহ এইভাবে প্রশমিত করিয়া মরোয়ান গভীর আত্মপ্রসাদে তাঁহার পাপাচারের শেষ ধাপের দিকে নামিয়া যাইতেছিলেন। নেপথ্যে নিষ্ঠুর নিয়তি হয়ত হাস্য করিতেছিল। কারণ মালিক-উল-মউত যে পশ্চাৎ হইতে তাঁহার করাল হস্ত অলক্ষ্যে তাঁহার দিকে প্রসারিত করিতে ছিলেন, মারোয়ানের অতি সূক্ষ্ম বুদ্ধিও তাহা ঘূর্ণাক্ষরে উপলব্ধি করিতে পারে নাই।

সিংহাসনে বসিয়াই মারোয়ান ইয়াযিদের নাবালক পুত্র খালেদকে রাজ্য হইতে বঞ্চিত করার পথ খুঁজিতে থাকেন। তিনি খালেদকে রাজ্য হইতে বঞ্চিত করার পথ খুঁজিতে থাকেন। তিনি খালেদের বিধবা মাতাকে বিবাহ করিয়া তাঁহাকে বশে আনিতে চেষ্টা করেন। প্রধান প্রধান উমাইয়াগণকে তিনি উচ্চপদ অথবা উৎকোচ দ্বারা বশীভূত করেন। এইভাবে তিনি নিজের সিংহাসন পাকা করিয়া লন। শুধু তাহাই নয়, তাঁহার মৃত্যুর পর যাহাতে তাঁহার পুত্র আবদুল মালিক সিংহাসন লাভ করেন, মু'আবিয়ার মত তিনি সে ব্যবস্থাও সুসম্পন্ন করেন। এই সময় তদীয় প্রতিদ্বন্দ্বী মক্কার খলিফা আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়েরের রাজ্য বিস্তার দ্রুত আগাইয়া চলিতেছিল। সিরিয়ার দ্বার দেশ পর্যন্ত তাঁহার সমর্থকদের কোলাহল শ্রুত হইতে ছিল। উমাইয়া গোত্রের লোকেরা তখন কিসে নিজেদের রাষ্ট্রীয় প্রভাব ও প্রতিপত্তি অক্ষুন্ন রাখিবে, কিসে তাহারা পুর্বের ন্যায় সর্ব-সুবিধা লুটিবার পথ পরিষ্কার রাখিবে, সেই চিন্তায় বিবৃত। তাই দামেস্কের সিংহাসনে মারোয়ানের নিজ বংশকে প্রতিষ্ঠিত করার এই হীন কৌশল তাহারা দেখিয়াও দেখিল না। এই সঙ্কটকালে মারোয়ানের ন্যায় একজন বিচক্ষণ ও কর্মদক্ষ নেতার প্রয়োজন তাহারা বিশেষভাবে অনুভব করিতেছিল। কাজেই মারোয়ানের সকল দুষ্কৃতি তাহারা উপেক্ষার চক্ষে দেখিল এবং সকল আব্দার নিরাপত্তিতে মানিয়া লইল। ভবিষ্যতে খালেদের সিংহাসন লাভের আর কোনও আশাই রহিল না। মারোয়ান খালেদের প্রতি তাঁহার পূর্ব প্রতিশ্রুতি বেমালুম বিস্মৃত হইলেন। মারোয়ান তাঁহাকে শুধু রাজ্যচ্যুত করিয়াই ছাড়েন নাই, গৃহ হারাও করিয়েছিলেন। হতভাগ্য শাহযাদা রাজ্যহারা হইয়া বাকী জীবন জড় বিজ্ঞান ও রসায়ন শাস্ত্রের অনুশীলনে কাটাইয়া দেন। রসায়নে তাঁহার দান বিজ্ঞানের ইতিহাসে স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে।

রাজ্যের প্রধানগণ যখণ দামেস্কের সিংহাসনে আব্দুল মালিকের উত্তরাধিকার সম্বন্ধে মারোয়ানের মনোনয়ন মানিয়া লন, তখন হইতেই মারোয়াম নিঃশঙ্ক চিত্তে খালেদের প্রতি তাচ্ছিল্য দেখাইতে থাকেন। একদিন কিশোর খালেদের মারোয়ান সামান্য কারণে অতি রূঢ়ভাবে

অপমানিত করেন। পুত্রের এই অপমানমাতার প্রাণে গভীরভাবে আঘাত হানে। তেজস্বিনী রমণী ইহার প্রতিশোধ লইতে কৃতসংকল্প হন। গভীর রাত্রিতে মারোয়ান যখন তাঁহার শয়ন গৃহে প্রবেশ করিলেন, ক্রুদ্ধ নারী তাহার শাণিত ছুরিকা মারোয়ানের বুকে বসাইয়া দিলেন এবং এইভাবে তাঁহার বেঈমানী ও বিশ্বাসঘাতকতার দণ্ড বিধান করিলেন। মাত্র এক বৎসর কয়েক মাস (৬৮৩-৮৪) রাজত্ব করার পর মারোয়ানের পাপ জীবনের অবসান হয়। তাঁহার স্থলে তাঁহার পুত্র ও মনোনীত উত্তরাধিকারী আবদুল মালিক দামেস্কের সিংহাসনে আরোহন করেন (৬৮৪ খৃঃ)। আবদুল মালিক ও তাঁহার পরবর্তী যাবতীয় উমাইয়া খলিফাই ছিলেন এই মারোনের বংশধর।

রাজ্যের সর্বত্র যখন বিশৃঙ্খলা ও দলগত স্বার্থের দ্বন্দ্ব লইয়া মাতামাতি চলিতেছে সেই সময় দামেস্কের দুর্বল রাজ্য শক্তির কর্ণধার লইয়া বসিলেন যুবক আবদুল মালিক। কথিক আছে যে তিনি প্রথম জীবনে নামায ও কুরআন পাঠে অত্যাধিক আসক্ত ছিলেন। যে সময় পিতার মৃত্যু সংবাদ তাঁহার নিকট পৌঁছে তখনও তিনি মসজিদে কুরআন পাঠে রত ছিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ গ্রন্থখানি বন্ধ করিয়া বলিয়া উঠেন, আজ হইতে তোমাতে আমাতে সম্পর্ক শেষ।

খলিফা হইয়াই আবদুল মালিক মসজিদ ও জায়নামায ছাড়িয়া কর্মসাগরে ঝাপাইয়া পড়েন। এবং রাজ্যের শৃঙ্খলা স্থাপনে ও দ্বিধা বিভক্ত মুসলিম জাহানের পুনঃ একত্রীকরণের দিকে তাঁহার সর্ব শক্তি নিয়োজিত করেন।

বিপ্লবী নেতা মুখতারের অভ্যুত্থান

ইত্যবসরে কুফার বিদ্রোহীরা পুনরায় শক্তি সঞ্চয় করে এবং মুখতার নামক এক শক্তিশালী বিপ্লবী নেতার অধীনে কারবালা হত্যার প্রতিশোধ লইতে সঙ্কল্প গ্রহন করে। মুখতার ছিলেন সেতুর যুদ্ধে নিহত বিখ্যাত আবু ওবায়দার পুত্র। প্রথম জীবনে বিশেষ কোন আদর্শের মোহ তাঁহার ছিল না। নিজের সুবিধার জন্য তিনি যে কোন পক্ষ অবলম্বন করিতে পারিতেন। এক সময়ে তিনি ইমাম হাসানের বিরোধী ছিলেন এবং তাঁহার খিলাফৎ অমান্য করেন। কিন্তু পরে অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তিনি বুঝিতে পারেন, উমাইয়া শাসন তাঁহার দেশের পক্ষে অনুকূল নহে। তখন তিনি এই বংশের উচ্ছেদ সাধনে ব্রতী হন। পরিণত বয়সে তিনি হুসায়েনের পক্ষ সমর্থন করেন এবং মুসলিমের সহিত যোগদানের জন্য কুফায় গমন করে। কুফায় যে তিনি শুধু দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করেন নাই, তাহার প্রমাণ আব্দুল্লাহ যিয়াদের অস্ত্রাঘাতে তাঁহার একটি চক্ষু নষ্ট হইয়া যায়। তখনই তিনি প্রতিজ্ঞা করেন, আব্দুল্লাহ যিয়াদকে তিনি হত্যা না করিয়া ছাড়িবেন না। ইতিমধ্যে হুসায়েন অন্যায় যুদ্ধে কারবালায় শহীদ হইলেন। সারা মুসলিম জাহান তাহাতে ক্ষুব্ধ ও আলোড়িত হইয়া উঠিল। অত্যাচারী আব্দুল্লাহ যিয়াদ ও তাঁহার অনুগত দলের প্রতি মুখতারের আক্রোশ আরও বাড়িয়া গেল।

ধর্মাত্মা সুলায়মানের প্রচেষ্টা যখন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইল এবং বিক্ষুব্ধ বিদ্রোহীগণ যখন নেতৃত্বহীন অবস্থায় এখানে সেখানে জটলা করিতেছিল সেই সময় মুখতার সুযোগ বুঝিয়া তাহাদিগকে ইমাম হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের নামে সংঘবদ্ধ করেন। এই সময় কুফা আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়েরের শাসনাধীন ছিল। তাহাদের সাহায্যে মুখতার অনায়াসেই কুফা হইতে আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়েরের নিয়োজিত প্রতিনিধিকে বিতাড়িত

করিয়া তথায় নিজেদের সর্বময় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করেন। কিন্তু একটা কারণে তাঁহার অসুবিধা হইতেছিল। নিজের অসাধারণ সামরিক প্রতিভা ও সংগঠন ক্ষমতা থাকা সত্বেও সাহাবী সুলায়মানের যে চারিত্রিক প্রভাব জনসমাজে বর্তমান ছিল, মুখতারের তাহা ছিল না। তিনি কোনও রাজবংশেরও সন্তান ছিলেন না। সাধারণতঃ দেখা যায় যেখানে মানুষের অর্থলাভের আশা কম সেখানে বস্তুতঃ তাহাদের ভিতর কোনরূপ ধর্মীয় উন্মাদনার সৃষ্টি করিতে না পারলে সেকালে তাহাদের অকুণ্ঠ সহায়তা লাভ করা চলিত না। হয়ত একালেও চলে না। তাই তিনি মদিনায় একদল প্রতিনিধি পাঠাইয়া মুহম্মদ হানাফিয়াকে এই বিপ্লবের নেতৃত্ব গ্রহণ করিতে এবং কারবালা হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ উদ্দেশ্য যুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে অনুরোধ করিলেন।

কিন্তু কুফাবাসীদের দল গঠন ও দলত্যাগ করা ছিল একটা নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার। মদীনার লোকেরা ভালরূপেই তাহা জানিত। তাই বুদ্ধিমান হানাফিয়া তাহাদের এই সামরিক উত্তেজনার উপর আস্থা স্থাপন করিতে পারিলেন না। হযরত আলী রাঃ ও তাঁহার বংশধরদের প্রতি কুফাবাসীদের বিশ্বাসঘাতকতা সম্পর্কে অতীতের অনেক স্মৃতি তাঁহার মনে জাগিয়া তাঁহাকে শোকাভিভূত করিয়া ফেলেণ। তথাপি তিনি অসীম ধৈর্য্যের সহিত আত্মসম্বরণ করিয়া প্রতিনিধি দলকে সাদর অভ্যর্থনা জানাইলেন এবং তাহাদের কার্যক্রম সম্বন্ধে অবহিত হইলেন। তিনি বুঝিলেন, কুফীদের সঙ্কল্প যতই জোরদার হউক, মদীনা হইতে নিজেস্ব সৈন্যবাহিনী সঙ্গে লইতে না পারিলে শুধু তাহাদের উপর নির্ভর করিয়া এত বড় একটা ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা চলে না। অথচ মদীনা ও মক্কা তখন মুখতারের বিরুদ্ধ পক্ষ অর্থাৎ আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়েরের করতলগত। নানাদিকে চিন্তা করিয়া হানাফিয়া কুফা বিপ্লবের পুরোভাগে দাঁড়াইয়া উহাতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতে অক্ষমতা প্রকাশ করিলেন। তবে তিনি মুখতার প্রমুখ নেতৃগণের উদ্দেশ্যের ভূয়সী প্রসংশা করিলেন এবং তাহাদিগকে অজস্র আশীর্বাদ জানাইলেন। তিনি বলিয়া দিলেন, তাঁহার দেহ মদীনায় থাকিলেও তাহার অন্তর রহিবে সতত এই বিপ্লবীদের সহিত।

প্রতিনিধি দল কুফায় ফিরিয়া গিয়া মুখতারকে আদ্যন্ত সকল কথা বিবৃত করিল। মুখতারের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল। তিনি নবী বংশের তদানিন্তন মুখপাত্র মুহম্মদ আল্ হানাফিয়ার আন্তরিক সমর্থনের কথা বিপ্লবী শিবিরে জানাইয়া দিলেন। ইহাতে তাঁহার মর্যাদা ও ব্যক্তিত্বের প্রভাব শতগুণ বাড়িয়া গেল। তিনি প্রকাশ্য সভায় ঘোষণা করিলেন, এই আন্দোলনে তাঁহার ব্যক্তিগত স্বার্থ কিছুই নাই। নবীবংশের প্রনষ্ট গৌরব পুনরুদ্ধার ব্যতীত তাঁহার অপর কোন উদ্দেশ্য নাই এবং এই কাজে তিনি নিজ জীবন কোরবান করিয়াছেন। তাঁহার সহকর্মীরা ইহাতে একান্ত উৎসাহিত হইল এবং মুখতারকে তাহারা নবী বংশের মনোনীত প্রতিনিধি ও তাহাদের যোগ্য নেতা বলিয়া বিশ্বাস করিল। অজ্ঞ লোকেরা ভাবিল, তাহাদের প্রভু ইমাম হুসায়েনের ক্রুদ্ধ আত্মা নিশ্চয়ই মুখতারের উপর 'আশ্রয়' করিয়াছে, তাঁহার নিজ অবমাননার প্রতিশোধ লইতে।

মুখতারের পরিচালিত গণ-আন্দোলন ছিল মূলতঃ শিয়া-আন্দোলন। শিয়াদের মতে আল্লহ তা'লা স্বয়ং তাঁহার পয়গম্বর নিযুক্ত করেন এবং শুধু আল্লাহ ও তাঁহার নবীই পারে নবীর উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করতে। নবীর জীবদ্দশায় হযরত আলী (ক) কয়েকবার নবী করীম কর্তৃক তাঁহার উত্তরাধিকারী বলিয়া উল্লেখিত হইয়াছিলেন। অতএব তিনিই নবী করীমের খিলাফতের ও ইমামতীর যথার্থ উত্তরাধিকারী। শিয়ারা আরও বলে, যেহেতু নবী করীম উত্তরাধিকার সম্বন্ধে কোন বিধান রাখিয়া যান নাই এবং মানুষকে কোনও ক্ষমতাও দিয়া যান নাই তাঁহার উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করিতে, কাজেই পরবর্তী কালে অনুষ্ঠিত তথাকথিত নির্বাচন সমূহ ন্যায়সঙ্গত হয় নাই। শিয়ারা মনে করিত, যেহেতু নবীত্বের দরজা দুনিয়ায় বন্ধ হইয়া গিয়াছে, ইসলামের খিলাফত ও রহাণী জগতের নেতৃত্বের ভার স্বাভাবিকভাবেই হযরত আলী (কঃ)-তে বর্তিয়াছে। নবী করীমের পরেই হযরত আলী (কঃ) সর্বাপেক্ষা যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। তিনি হাশিমী বংশের লোক এবং নবীর সাক্ষাৎ চাচাত ভাই ও জামাতা এবং সর্বকার্যে নবীর দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ ছিলেন। তিনিই সর্বাগ্রে ইসলাম কবুল করেন। তিনি ছিলেন নিষ্পাপ; অভ্রান্ত, সর্বশ্রেষ্ঠ বিদ্বান, সর্বশ্রেষ্ঠ যোদ্ধা এবং বিক্রমে আল্লা'র সিংহ। ইসলামের সকল বড় বড় যুদ্ধে তিনি অংশ গ্রহণ

করিয়াছিলেন এবং জীবনে কখনও প্রতিমা পূজা করেন নাই। তদীয় সন্তানগণের উপর সেই সব কারণে তাহারা প্রগাঢ় ভক্তি ন্যস্ত করিয়াছিল। উমাইয়াদের কর্তৃক আলীবংশে বিরোধিতা এবং সিরিয়াবাসীদের সেই উমাইয়া-শাসনের সমর্থন, শিয়ারা বিদ্বেষের দৃষ্টিতে দেখিত। তাই দামেস্ক হইতে চারি শতাধিক মাইল দূরে বসিয়া কুফায় শিয়ারা উমাইয়া শাসনের উৎখাতে স্বপ্ন দেখিত। তাহারা ভাবাবেগে চালিত হইয়া শুধু দলই পাকাইত না, সময় সময় আকস্মিকভাবে অস্ত্র ধারণ করিতেও প্রস্তুত হইত। হযরত আলী (কঃ)-এর সময় তাহারা এইরূপ করিয়াছিল; ইমাম হাসানের বেলায় এইরূপ করিয়া ছিল; তাহার চৌদ্দ বৎসর পরে সাহাবী সুররাদের নেতৃত্বে শহীদ ইমাম হুসায়েনের জন্য এইরূপ করিয়াছিল; এবার তাহাদের স্থানীয় সহকর্মী এবং হানাফিয়ার আশীর্বাদ-প্রাপ্ত নেতা মুখতারের বেলায়ও তাহারা সেইরূপ করিল। কিন্তু তাহাদের এই সাময়িক ভাবাবেগ কোনদিনই দীর্ঘস্থায়ী হয় নাই এবং তাহার ফলে বার বার ইতিহাসের অধ্যায় পরিবর্তিত হইয়াছিল।

দামেস্কের সহিত সংঘর্ষ

এদিকে দামেস্কের নূতন খলিফা আবদুল মালিক রাজ্যের আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থা সুদৃঢ় করার পর মুখতারের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। মুখতারকে দমনের জন্য ছয় হাজার সৈন্যের এক সুশিক্ষিত বাহিনী আবদুল্লাহ জিয়াদের নেতৃত্বে তিনি কুফাভিমুখে রওয়ানা করিলেন। মুখতার কুফার শাসন ব্যাপারে দ্রুত শৃঙ্খলা স্থাপন করিয়া তিন হাজার সৈন্যের এক মুজাহিদ বাহিনী আবদুল্লাহ যিয়াদের গতিরোধ করার জন্য প্রেরণ করিলেন। ইরাক সীমান্তে আবদুল্লাহ যিয়াদের সহিত ইহাদের সংঘর্ষ হইল। ইহারা জয়লাভ করিল এবং আবদুল্লাহ যিয়াদের বহু সৈন্যকে হত্যা ও বন্দী করিল। মুখতার এই প্রাথমিক জয়ে উৎসাহিত হইলেন এবং আল্লা'র শোকর গোযারী করিলেন। পরে আরও সাত হাজার সৈন্য সংগ্রহ করিয়া তিনি পূর্ব দলের সাহায্যে প্রেরণ করিলেন।

ইতোমধ্যে কুফাবাসীদের মতের পরিবর্তন ঘটিল। তাহারা দেখিল একদিকে দামেস্কে উমাইয়া শক্তি তাহাদের বিরুদ্ধে গর্জিয়া উঠিয়াছে, অপর দিকে মক্কায় আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের তাহাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র শাণিত করিতেছেন। সে ক্ষেত্রে ক্ষুদ্রশক্তি মুখতারকে আশ্রয় করিয়া থাকা সমীচীন হইবে না। কুফার চতুর ব্যক্তিরা মনে করিল, এইরূপ উভয় সঙ্কট উত্তীর্ণ হইবার প্রকৃষ্ট উপায় হইতেছে মুখতারকে বাদ দিয়া একজন যোগ্যতর লোককে খলিফা বলিয়া মানিয়া লওয়া। তাহারা মুখতারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিল।

তখন মুখতার বিপদ গণিয়া তাঁহার শেষোক্ত বাহিনীকে প্রত্যাবর্তনের আদেশ দিলেন এবং নগরবাসীগণকে কহিলেন– তোমাদের সকলের যেরূপ অভিপ্রায়, তাহাতেই আমি বাধ্য আছি। তোমরা একজন যোগ্য লোক নির্বাচন কর আমি নিরাপত্তিতে তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিতেছি।

কুফার লোকেরা ইহাতে খুশী হইল এবং মনে করিল, মুখতার তো আমাদের মুঠোর ভিতরেই, তাঁহাকে যখন ইচ্ছা পদচ্যুত করা যাইবে। এই ভাবিয়া তাহারা শান্তমূর্তি ধারণ করিল এবং আবদুল মালিক অথবা ইবনে যুবায়ের, ইঁহাদের কোন পক্ষকে ডাকিবে তাহাই লইয়া জল্পনা করিতে লাগিল। ইতোমধ্যে মুখতারের শেষোক্ত সৈন্যদল কুফায় প্রত্যাবর্তন করিল। মুখতার তখন প্রথমে বিশ্বাসঘাতক নাগরিকগণের উপর প্রতিশোধ লইতে সংকল্প করিলেন। তাঁহার আদেশে সৈন্যদল নাগরিকগণকে পাইকারীভাবে হত্যা করিতে লাগিল। ঘরের দুশমন নির্মূল না হইলে উমাইয়াদের বিরুদ্ধে তাঁহার জিহাদ যে বিপজ্জনক ইহা তিনি হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করিয়াছিলেন।

ওমর ও শিমার বধ

কারবালায় ইমামকে বধ করিয়া আসিয়া যাহারা নগরে মহাস্ফূর্তিতে কাল যাপন করিতেছিল এবং নিজদিগকে খুববুদ্ধিমান মনে করিতেছিল মুখতারের হস্তে তাহাদেরও প্রায়শ্চিত্ত শুরু হইল। তাহাদের বুঝা উচিত ছিল, সেনাপতি মুখতার আর নিরীহ ধর্মপ্রাণ-হুসায়েন এক নহেন। মুখতার দীর্ঘকাল ধরিয়া ইরাকে বসবাস করিতেছেন এবং কুট বুদ্ধিতেও তিনি তাহাদের সমজাতীয়। তাহাদের ভিতর এমন তিন চার হাজার লোক ছিল যাহারা কারবালার যুদ্ধে স্বহস্তে তলোয়ার চালাইয়া ইমাম হুসায়েনের মৃত্যুর কারণ হইয়াছিল। হুসায়েন-হন্তা শিমার, ওমর বিন সা'দ খোলি বিন ইয়াযিদ প্রমুখ ধুরন্ধরগণ কিছুকাল আত্মগোপন করিয়া থাকিল। কিন্তু একে একে ইহাদিগকে খুঁজিয়া বাহির করা হইল এবং মুখতারের সম্মুখে হাযির করা হইল। মুখতার কহিলেন, হে ওমর তোমরাই না অর্থের লোভে, উচ্চ চাকরীর আশায়, নিঃসহায় ইমামকে কারবালায় হত্যা করিয়াছ? তখন কি একবারও আল্লার বিচারের কথা স্মরণ হয় নাই? এইক্ষণে শেষ একবার তাঁহার নাম স্মরণ কর। হে শিমার, তুমিই না ভূলুণ্ঠিত ইমামের বক্ষে চড়িয়া নির্মম হস্তে তাঁহাকে জবেহ করিয়াছ? যাঁহার কলমা পড় তাঁহারই নাতিকে বধ করিতে তোমার কি একটুও শরম বিবেচনা হয় নাই? অতঃপর মুখতার জল্লাদকে হুকুম দিলেন, এই দুই শয়তান মালাউনকে প্রকাশ্যে সভার সম্মুখে হত্যা কর। শিমার ও ওমর ভয়ে কাঁপিতে লাগিল, মুখতারের প্রশ্নে কোনও উত্তর করিতে পারিল না। প্রাণের মায়ায় তাহারা শুধু মিনতি করিতে লাগিল এবং বলিল, আমাদের দোষ কি? আমরা ইবনে যিয়াদের আজ্ঞায় এ কাজ করেছি। মুখতার কহিলেন, ইবনে যিয়াদকেও শীঘ্রই তোমাদের পশ্চাতে প্রেরণ করিতেছি; জাহান্নামে গিয়া তাহার নিকট প্রতিকার ভিক্ষা করিও। জল্লাদের প্রতি

ইশারা করা হইল, আর বিলম্ব না করিতে। চক্ষুর নিমিষে শিমার ও ওমরের কর্তিত মস্তক ভূতলে লুটাইল। তাহাদের পাপ শোণিতে মৃত্তিকা কলঙ্কিত হইল।

ইহার পর মুখতার আদেশ করিলেন, নগরে অবশিষ্ট যে সকল পাপিষ্ঠ আছে তাহাদিগকে ধরিয়া আন। যে ব্যক্তি ইমামকে বর্শাবিদ্ধ করিয়াছে, যে তাঁহার কুর্তা খুলিয়াছে, যে তাঁহার শরীরের অবমাননা করিয়াছে, যাহারা তাঁহার পাকদেহ অশ্বপদদলিত করিয়াছে, যে যে ইমামের পুত্রগণকে ও সহচরগণকে হত্যা করিয়াছে, যাহারা তাহাদের খীমা লুণ্ঠন করিয়াছে, রমণীদের বস্ত্রালঙ্কার কাড়িয়া লইয়াছে সেই সব দুর্বৃত্তের নাম লিখ এবং একে একে প্রত্যেককে আমার সম্মুখে লইয়া আইস। তাহাই করা হইল। একে একে সকল পাপিষ্ঠ আনীত হইল ও জল্লাদের তলোয়ারে দ্বিখণ্ডিত হইল। খোলি বিন্ ইয়াজিদ যখন মুখতারের সম্মুখে আনীত হইল, মুখতার অগ্নিবৎ প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিলেন। এই ব্যক্তিই ইমামের ছিন্ন মস্তক বর্শা বিদ্ধ করিয়া পুরস্কারের আশায় আব্দুল্লাহ ইবনে যিয়াদের নিকট লইয়া গিয়াছিল। মুখতার কহিলেন, এই দুরাচারের হস্তপদ কর্তন করিয়া ইহাকে কুফায় প্রকাশ্য রাজপথে কোন সরাইখানার সম্মুখে ফেলিয়া রাখ, সেখানে সে তিলে তিলে মরিতে থাকুক। তাহাই করা হইল। হস্তপদ ইত্যাদি সমস্ত অঙ্গ একে একে কর্তিত হইল এবং রক্তপাতের ফলে ধীরে ধীরে সে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। কতিপয় লোক প্রাণভয়ে পলায়ন করিয়া বসরায় আশ্রয় লইয়াছিল। তদ্ব্যতীত কারবালা যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী অন্যান্য লোক অধিকাংশ মুখতারের আদেশে তলোয়ারের আঘাতে বিধ্বস্ত হইল। বিষধর সর্পের ডেরা খুঁজিয়া লোকে যেমন উহার সন্ধান লয় এবং মস্তক চূর্ণ করে, মুখতার তেমনি কুফার ঘরে ঘরে তল্লাসী চালাইয়া ইমাম হত্যার উদ্যোক্তা ও অংশীদার দিগকে টানিয়া বাহির করিলেন এবং সবাইকে তরবারির মুখে নিক্ষেপ করিলেন।

আব্দুল্লাহ যিয়াদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত

অতঃপর মুখতার আবদুলাহ যিয়াদের দিকে মনোনিবেশ করিলেন। প্রখ্যাত সেনাপতি মালিক ওশতুরের দুই পুত্র ইব্রাহীম এবং যাফর ছিলেন উমাইয়া বংশের উচ্ছেদের জন্য বদ্ধপরিকর। কারণ তাঁহাদের পিতা মালিক ওশতুরকে মু'আবিয়া গোপনে হত্যা করাইয়াছিলেন, এই বিশ্বাস তাহাদের অন্তরের ভিতর সতত বৃশ্চিকের ন্যায় দংশন করিত। যাফর এই সময় মুখতারের সেনাপতিরূপে আব্দুল্লাহ রিয়াদের সৈন্যবাহিনীকে ইরাক সীমান্তে আগলাইয়া রাখিয়া ছিলেন। এক্ষণে ইব্রাহীমকে মুখতার সাত হাজার সৈন্যসহ যাফরের সাহায্যে প্রেরণ করিলেনঃ বলিয়া দিলেন তোমার ভাই মুষ্টিমেয় সৈন্য লইয়া আব্দুল্লাহ যিয়াদের বিশাল বাহিনীর সহিত শক্তি পরীক্ষায় নিয়োজিত আছে। বিশ্বাসীগণকে আল্লাহ জয়যুক্ত করেন, ইসলামের অতীত ইতিহাসে ইহা দেখা গিয়াছে। আমরাও প্রথম সংঘর্ষে জয়লাভ করিয়াছি। কিন্তু তথাপি সিরিয়ার বিশাল বাহিনীর সম্মুখে যাফরের সৈন্যরা বেশীদিন টিকতে পারিবে না। তুমি তড়িৎ গতিতে রণক্ষেত্রে গমণ করিবে। কুফার বিদ্রোহ দমনে আমাদের যে কয়দিন সময় নষ্ট হইল, তোমার গতির ক্ষীপ্রতা দ্বারা তাহা পূরণ করিয়া লইবে।

কুফায় হযরত আলী যে আসনে উপবেসন করিয়া রাজকার্য করিতেন, শিয়ারা উহাকে দৈবগুণ সম্পন্ন বলিয়া মনে করিত। উহার নাম ছিল 'শরতুল্লাহ'। তাঁহার ওফাতের পর উহা তৎপুত্র মুহম্মদ তোফায়েলের দখলে ছিল। সুচতুর মুখতার হযরত তোফায়েলকে বহু উপঢৌকন দ্বারা খুশী করিয়া উক্ত আসন খানি দানস্বরূপ গ্রহণ করেন। শিয়াদের ধর্ম-বিশ্বাসের সুযোগ যতভাবে গ্রহণ করা সম্ভবপর ছিল মুখতার তার কোনটি বাদ দেন নাই। এবারের ইরাক-সিরীয় যুদ্ধ ভয়াবহ রূপ ধারণ করিবে, বুঝিতে পারিয়া মুখতার উক্ত শরতুল্লাহ আসন খানি দরবারে উপস্থিত করিলেন

এবং ইব্রাহীমকে উহা সঙ্গে লইতে বলিলেন। তাঁহাকে বলিয়া দিলেন, পবিত্র শরতুল্লাহ সঙ্গে থাকিলে তোমার জয়লাভ সুনিশ্চিত। ইহা শিয়াদের বিজয় পতাকা স্বরূপ। ইব্রাহীম ইহা পাইয়া নিজকে ধন্য মনে করিলেন এবং অতিশয় যত্ন ও সম্মানের সহিত উহা উঠাইয়া লইলেন। ত্রিশ বৎসর আগে এই পবিত্র আসনে তাহাদের প্রভু বসিতেন, এই স্মৃতি শিয়াদিগকে উদ্বেলিত করিল। হাজার হাজার লোক ভক্তি গদগদ চিত্তে কালেমা শাহাদৎ পড়িতে পড়িতে উহার অনুগমন করিল। সৈন্যগণের মনে তখন এমনই হিম্মৎ ও বীর্যের সঞ্চার হইল যে তাহাদের মনে হইতে লাগিল তাহারা যেন সাত হাজার নয় সাত লক্ষ, এবং সারা পৃথিবী জয়ে সমর্থ।

সেনাপতি ইব্রাহীম ইবনে মালিক ওশতুর তাঁহার সৈন্যদলসহ এই যে ছুটিলেন, একেবারে ইরাকের পশ্চিম অঞ্চল মসৌলের সীমানার ভিতর প্রবেশ করিয়া তবে অশ্ব থামাইলেন। এইখানে তাঁহাকে থামিতে হইল আব্দুল্লাহ যিয়াদের সৈন্যের ছাউনী অদুরে বলিয়া সংবাদ জানা গেল। ইব্রাহীম সেইখানে ইতিহাস প্রসিদ্ধ জ্বাব নদীর তীরে শিবির স্থাপন করিলেন। জ্বাবের বিশাল উপত্যাকায় দুই পক্ষের সৈন্যবাহিনী যুদ্ধার্থে পরস্পরের মোকাবেলা করিল।

আব্দুল্লাহ যিয়াদের সহকারী সেনাপতি অন্য এক ওমর ছিল ইব্রাহীমের বাল্যবন্ধু। সে রাত্রিযোগে গোপনে ইব্রাহীমের সহিত সাক্ষাৎ করিল এবং বলিল, ভাই তুমি চিন্তা করিও না, আগামী প্রভাতে যখন যুদ্ধ আরম্ভ হইবে তখন আমি আপন সৈন্যদল সহ তোমার পক্ষে যোগদান করিব। ওমর তাহার নানা দুর্দশার কাহিনী ইব্রাহীমকে বলিয়া তাঁহাকে বিশ্বাস করাইল যে, সত্যই সে আব্দুল্লাহ যিয়াদের পক্ষ ত্যাগ করিবে। ইব্রাহীম খুব আশান্বিত হইলেন। কিন্তু উমাইয়ারা কোনও দিন বিপক্ষের সহিত কোনও অঙ্গীকার পুরণ করে নাই। এ ব্যক্তিও করিল না। পর দিন যখন যুদ্ধ শুরু হইল, ইব্রাহীম বন্ধু ওমরের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। কিন্তু তাহার কোনও সাড়াশব্দ মিলিল না। ওদিকে সিরীয় সৈন্য ভীমবেগে ইব্রাহীমের সৈন্যদলের উপর

আপতিত হইল। পথশ্রান্ত ইরাকি সৈন্যগণ টিকিতে পারিতেছিল না। ইব্রাহীম দেখিলেন আর নিস্তার নাই। তখন তিনি আল্লাহ'র নামে হুঙ্কার দিয়া মহাশান্য শরতুল্লা'কে সন্মুখে পাঠাইয়া দিলেন এবং সৈন্যগণকে বলিয়া দিলেন, তোমরা নিশ্চয় জানিও আল্লা'র রহমত ও গায়েবী শক্তিতে ভরপুর এই সিংহাসন কিছুতেই শত্রুর হাতে যাইতে পারে না। আল্লাহ নিশ্চয়ই প্রভু আলীর আসনের মর্যাদা রক্ষা করিবেন। তোমরা নির্ভয়ে তলোয়ার চালাও। সৈন্যগণ ইহাতে এমনই উৎসাহিত হইল যে, তাহাদের প্রাণ-পণ পরাক্রমে সিরীয় সৈন্যদল ছিন্নভিন্ন হইতে লাগিল। আব্দুল্লাহ যিয়াদ বেগতিক দেখিয়া স্বয়ং অস্ত্র ধারণ করিয়া ময়দানে অবতীর্ণ হইলেন এবং পলায়মান সেন্যগণকে আহ্বান করিয়া ভীম গর্জনে বলিলেন, কেহ পালাইতে পারিবে না।' এই আমি আব্দুল্লাহ যিয়াদ তোমাদের পার্শ্বে আছি। তোমরা আমার অনুসরণ কর, নির্মিষের ভিতর কুফার পাপিষ্ঠগণকে ধ্বংস করিয়া তাহাদের যুদ্ধের সাধ মিটাইয়া দিতেছি। বহু যুদ্ধের খ্যাতনামা যোদ্ধা আব্দুল্লাহ যিয়াদের এই আশ্বাসবাণীতে সৈন্যেরা আবার ফিরিয়া দাঁড়াইল এবং পুনরায় তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ করিল। কিন্তু ইব্রাহীমের সৈন্যদল সংখ্যায় অল্প হইলেও শরতুল্লা'র মোহে আজ তাহারা উম্মাদের ন্যায় লড়িতেছিল। পৃষ্ঠ প্রদর্শন ও শরতুল্লাহ ছাড়িয়া পলায়ন মহাপাপ জানিয়া তাহারা মরিয়া হইয়া শত্রু সংহার করিতেছিল। একটি লোকও রণক্ষেত্র ত্যাগ করিল না।

এদিকে আব্দুল্লা'হ যিয়াদের পাপের ভরা পূর্ণ হইয়া আসিয়াছিল। মৃত্যু অলক্ষ্যে পশ্চাৎ হইতে তাঁহাকে অনুসরণ করিতেছিল। তাঁহার পূর্বের কোনও রণকৌশলই আজ খাটিল না। অকশ্মাৎ সাধারণ সৈনিকের নিক্ষিপ্ত বর্শা তাঁহার সন্মুখ হইতে পৃষ্ঠ পর্যন্ত বিদ্ধ করিল। আব্দুল্লাহ যিয়াদ অশ্ব হইতে ভুমিতলে গড়াইয়া পড়িলেন। তাঁহার দেহরক্ষীরা তাঁহাকে কুফীদের হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য দ্রুত ছুটিয়া আসিল। কিন্তু কুফিগণ তখন জীবন মরণের প্রশ্ন ভুলিয়া গিয়াছিল। শত্রুদের প্রতি কিছু মাত্র ভ্রুক্ষেপ না করিয়া তাহারা ক্ষীপ্রহস্তে তরবারির আঘাতে আব্দুল্লাহ যিয়াদের পাপ-মস্তক দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিল এবং কর্তিত মস্তক বর্শাবিদ্ধ করিয়া মহা উল্লাসে জয়ধ্বনি

করিতে করিতে কুফার পানে ধাবিত হইল। তাহাদের নিজদেহে যে কত আঘাত পড়িয়াছিল তাহা তাহারা জানিতেই পারল না। সিরীয় সৈন্যদের মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া গেল। তাহারা পরাজিত হইয়া কতক বিধ্বস্ত হইল, কতক উর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল।

মুখতারের উপস্থিত বুদ্ধি ও সংবাদ সরবরাহের ব্যবস্থা ছিল চমৎকার। যুদ্ধক্ষেত্র হইতে আব্দুল্লাহ যিয়াদের মস্তক কুফায় পৌছিবার তিন দিন পুর্বে তিনি ঘোষণা করিয়া দিলেন, আমরা জয়ী হইয়াছি এবং আব্দুল্লা'র মস্তক উপহার স্বরূপ আমার নিকট আসিতেছে। কুফার লোকেরা প্রথমে ইহাকে বাতুলতা বলিয়া মনে করিল, কারণ মহাকৌশলী আব্দুল্লাহ যিয়াদের মাথা কাটিয়া আনিবে, এরূপ বীর ইরাকে আছে বলিয়া তাহারা বিশ্বাস করিতে পারে নাই। কিন্তু সত্য সত্যই যখন সে মস্তক কুফায় আসিল এবং রাজ প্রাসাদে প্রকাশ্য দরবারে মুখতারের সন্মুখে স্থাপিত হইল তখন লোকদের আর বিস্ময়ের সীমা রহিল না। তাহারা মুখতারকে দিব্যজ্ঞান সম্পন্ন মহাপুরুষ বলিয়া মনে করিতে লাগিল।

মুখতার তখন কুফায় আব্দুল্লাহ যিয়াদেরই পরিত্যক্ত প্রাসাদে বাস করিতেছিলেন। যে সিংহাসনে বসিয়া আব্দুল্লাহ যিয়াদ দরবার করিতেন সেই আসনেই মুখতার বসিয়াছিলেন; যে টেবিলে একদা ইমামের ছিন্ন শির আব্দুল্লাহ যিয়াদের সন্মুখে স্থাপিত হইয়াছিল, সেই টেবিলেই আজ আব্দুল্লাহ্ যিয়াদের কর্তিত মস্তক মুখতারের সন্মুখে স্থাপিত হইল। ইমামভক্তদের আনন্দের সীমা রহিল না। তাঁহারা পরম কৃতজ্ঞতার সহিত মহাবিচারক আল্লা'র শোকর গোযারী করিতে লাগিল। মুখতার সকলকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভাই-সব, আল্লা'র মহিমা দেখ। দুনিয়ার সব কিছুই আল্লাহ তা'লার এখতিয়ার। এই আব্দুল্লাহ যিয়াদ এক সময়ে দুনিয়ায় কাহাকেও পরওয়া করিত না। তাহার বিরাট বাহিনী আজ আমাদের মত নগন্য ব্যক্তিগণের হস্তে বিধ্বস্ত। যে আব্দুল্লাহ যিয়াদ জীবিত থাকিতে আমার ন্যায় ক্ষুদ্র ব্যক্তিকে গ্রাহ্য করা দূরের কথা, ক্ষমতার গর্বে কারবালায় স্বয়ং ইমাম হুসায়েনের কাতর অনুরোধও উপেক্ষা করিয়াছিল, আজ তাহারই সিংহাসনে

বসিয়া আমি তাহার ছিন্ন মস্তক নিরীক্ষণ করিতেছি। শত সহস্র বার সেই আল্লা'র শোকর! তাঁহারই অনুগ্রহে তোমরা বিজয়ী হইয়াছ। তোমাদের গৌরবে আজ আমিও গৌরবান্বিত।

কারবালা হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণকারী, শক্তিশালী বিপ্লবী নেতা মুখতারের খ্যাতি অচিরে চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িল। সমস্ত ইরাকে তো বটেই, ইরান দেশেও তাঁহার জয় জয়কার পড়িয়া গেল। এই সব অঞ্চলে শিয়া খুব বেশী। তাহারা ইমাম বধের চরম প্রতিশোধ মনে মনে কামনা করিত। মুখতার তাহাদের সেই দীর্ঘদিনের মনোবাসনা পূর্ণ করিয়াছেন। বিশেষ করিয়া, প্রবল উমাইয়া শক্তির আশ্রিত আব্দুল্লাহ যিয়াদ, ওমর ও শিমারের তিনি সমুচিত দণ্ড বিধান করিয়াছেন, ইহার চাইতে বড় কৃতিত্ব আর কি হইতে পারে। মুখতার জনগণের শ্রদ্ধাভাজন হইয়া স্বাধীন নৃপতির ন্যায় কুফায় শাসন কার্য চাইলাতে লাগিলেন।

দশম অধ্যায়

ত্রিশক্তির সংঘর্ষ

মুখতার ও আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের

মুখতার যে মুহম্মদ হানাফিয়ার আর্শীবাদ শিরে ধরিয়া জনগণকে স্বপক্ষে আনিয়াছিলেন এবং আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়েরের নিয়োজিত শাসনকর্তাকে কুফা হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছিলেন, মক্কার খলিফা আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের ইহা সহ্য করিবেন কেন? অধিকন্তু, ইহা ছিল মুলতঃ একটি শিয়া আন্দোলন। আবুদল্লাহ ইবনে যুবায়ের ছিলেন সুন্নী। মুখতার যদি হানিফিয়াকে বাদ দিয়া আবদুল্লাহ যুবায়েরের আনুগত্য স্বীকার করিতেন তাহা হইলে অবস্থা হয়ত অন্যরূপ দাঁড়াইত। কিন্তু যে পানি ঘাট হইতে একবার গড়াইয়া গিয়াছে উহা আর পূর্ব ঘাটে ফিরিয়া আসে না। ঘটনার স্রোত আপন গতিতে ধাবিত হইল।

ক্রুদ্ধ আব্দুল্লাহ বসরায় তাঁহার ভাই মসআবকে পত্র লিখিলেন সসৈন্যে কুফায় গমন করিতে এবং অবিলম্বে কুফা আক্রমণ করিতে। মসআব তখন বসরার গভর্ণর। আবদুল্লাহ ইরানেও তাঁহার নিয়োজিত সেনাপতি মহলকে অনুরূপ পত্র লিখিলেন। উভয়ে এই পত্রানুযায়ী এক যোগে কুফার উপর আপতিত হইলেন। মুখতার তখন বিশ হাজার সৈন্যের অধিনায়ক। তিনিও তাঁহার সৈন্যদল লইয়া নির্ভিক চিত্তে মসআব ও মহলবের সন্মুখীন হইলেন। তুমুল সংগ্রামের সুচনা হইল। তখন মহলব এক সামরিক কুট কৌশলের অবতারণা করিলেন। তিনি যুদ্ধ ক্ষেত্রে আসিয়া উচ্চৈঃস্বরে কুফীদিগকে আহবান করিয়া কহিলেন, ভাইসব, তোমরা কেন অকারণ মরণকে আলিঙ্গন

করিতে আসিয়াছ? তোমাদের তো ইমাম নাই। তোমাদের নেতা মুখতার তো ইমাম নহে। তোমাদের বর্তমান ইমাম হইতেছেন আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের। একমাত্র তিনিই নেতৃত্বের অধিকারী। তোমরা আইস, তাঁহার স্মরণাপন্ন হও। তোমাদিগকে মার্জনা করা যাইবে।

মুখতারের পতন

চির চঞ্চল কুফাবাসীদের চিত্ত ইহাতে বিচলিত হইল। চৌদ্দ হাজার সৈন্য মুখতারের পক্ষ পরিত্যাগ করিয়া শত্রুপক্ষে যোগদান করিল। অবশিষ্ট ছয় হাজার সৈন্য ইরান ও বসরার মিলিত বাহিনীর সন্মুখে টিকিতে পারিল না। তাহারা মুখতারকে লইয়া আত্মরক্ষার জন্য নগরে প্রত্যাবর্তন করিল এবং দুর্গের ভিতর হইতে প্রতিরোধের ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে লাগিল। তখন মসআব সেই দুর্গ অবরোধ করিয়া দুর্গবাসিগণকে কহিতে লাগিলেন, নির্বোধ কুফাবাসিগণ, তোমরা কেন আর মুখতারের সঙ্গে রহিয়াছ? তাহার সঙ্গে থাকিলে তোমাদের মরণ অনিবার্য। তোমরা আমার শরণাপন্ন হও, আমি তোমাদিগকে মুক্তি প্রদান করিব। তখন ছয় হাজার সৈন্যই শত্রুহস্তে আত্মসমর্পণ করিতে প্রস্তুত হইল। মুখতার কহিলেন, বন্ধুগণ কখনই তোমরা মনে করিওনা যে, মসআবের হস্তে তোমরা নিস্তার লাভ করিবে। তাহার প্রতারণায় বিশ্বাস করিও না। আইস আমরা তরবারি হস্তে তাহাদের সন্মুখীন হই এবং বীরের ন্যায় শহীদ হই। সৈন্যগণ সম্মত হইল না। তখন মুখতার ওজু গোসল করিয়া আতর, গোলাপ ও সুরভিদ্রব্যে দেহ চর্চিত করিলেন এবং আল্লাহ তা'লাকে স্মরণ করিয়া তরবারি কোষমুক্ত করতঃ দুর্গ হইতে নিক্রান্ত হইলেন। ইহা দর্শন মাত্র নব্বই জন সৈন্য তাঁহার অনুগামী হইল। ইহারা অপর সকলকেও মরণের ক্রোড়ে ঝাপাইয়া পড়িবার জন্য আহ্বান জানাইল এবং বলিল, তোমরাও নিশ্চয় মরিবে কিন্তু সে মরণ হইবে কুকুর বিড়ালের মৃত্যুর মত, বন্দী দশায়। তাহার চাইতে আইস, বীরের ন্যায় যুদ্ধ করিয়া প্রাণত্যাগ করি, তাহাতে পরলোকে জান্নাত-বাসি হইব। অপর সৈন্যেরা তাহাতে সম্মত হইল না। তাহারা বিজ্ঞের মত বলিল, আমরা এইখানেই থাকিব। যুদ্ধ না

করিলে শত্রুগণ আমাদিগকে মারিবে কেন?

নব্বই জন ভক্তবীর তাহাদের প্রিয় নেতা মুখতারের সহিত হাসিতে হাসিতে শত্রুহস্তে প্রাণদান করিল। মসআব দুর্গ জয় সমাপ্ত করিয়া কুফার সিংহাসনে বসিলেন। নিয়তির লীলা কি বিচিত্র! যে টেবিলে এক সময় ইমামের ছিন্ন মস্তক রক্ষিত হইয়াছিল, যেখানে পরে যিয়াদের পাপ-মস্তক স্থাপিত হইয়াছিল, সেইখানেই আজ মুখতারের ছিন্ন মস্তকও মসআবের সন্মুখে প্রদর্শিত হইল। কুফার রঙ্গমঞ্চের অভিনয় ছিল সত্যই অদ্ভুত এবং মানুষের কল্পনাতীত। এই কুফায় মুখতার তিন চার বৎসর কাল প্রবল দামেস্ক-শক্তির সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া স্বাধীন ভাবে রাজকীয় ক্ষমতা পরিচালনা করিয়াছিলেন। বিশ্বাস-ঘাতকদের ষড়যন্ত্রে আজ তাহার সমাপ্তি ঘটিল।

মুখতারের আসনে বসিয়া বিজয়ী মুসআব অবরুদ্ধ বন্দীগণকে বাহিরে আনিতে হুকুম দিলেন। তাহাদের অস্ত্রশস্ত্র কাড়িয়া লওয়া হইল এবং সমগ্র দলকে প্রকাশ্যভাবে হত্যা করা হইল।

আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়েরের অধিকার এইবার ইরাকের দক্ষিণ সীমা বসরা হইতে উত্তর সীমা মসৌল পর্যন্ত বিস্তৃত হইল এবং সিরিয়ার পূর্ব প্রান্ত স্পর্শ করিল। বিজয় শেষে কুফা-শাসনের সুবন্দোবস্ত করিয়া মসআব ও মহলব স্ব স্ব স্থানে প্রত্যাবর্তন করিলেন (৬৮৭ খৃঃ)।

আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের ও আব্দুল মালিক

কুফার ঐতিহাসিক বিপ্লবের অধিনায়ক মুখতার মাঝখানে থাকায় মক্কার খলিফা আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের ও দামেস্কের খলিফা আব্দুল মালিক, এই উভয়ের এলাকার মধ্যে যে দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান সৃষ্ট হইয়াছিল মুখতার অপসারিত হওয়ায় উহা দূর হইল এবং আব্দুল্লাহ ও আব্দুল মালিক সরাসরি পরস্পরের মুখামুখী হইয়া পড়িলেন। খিলাফতের দ্বন্দ্ব এই সময় এমনই বিশ্রী আকার ধারণ করিয়াছিল যে, ৬৮৮ খৃষ্টাব্দে হজের মৌসুমে আরাফাতের ময়দানে পরস্পর বিরোধী চারিজন খলিফার চারিটি পৃথক নিশান উড্ডীন হইয়াছিল। ইঁহারা হইলেন আব্দুল মালিক, আবুদল্লাহ ইবনে যুবায়ের, মুহম্মদ ইবনে হানিফিয়া এবং খারেজীদলের নেতা নাযদা। সেবার ইঁহারা প্রত্যেকে সেখানে খলিফা রূপে নিজ নিজ দলের ইমামতী করেন।

আরবে যাহারা ধর্ম ও চরিত্রবলে মুসলিম সমাজের শ্রদ্ধা ভাজন ছিলেন তাঁহাদের অনেকেই মুখতারের অন্যায় ভাবে নিধনে আব্দুল্লাহ ও তাঁহার ভ্রাতাগণের উপর বিরক্ত হইয়াছিলেন। কথিত আছে, আবদুল্লা'র ভ্রাত্য মুসআব যখন কুফা বিজয়ের পর আবদুল্লা'র সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য মক্কায় যাইতেছিলেন, সেই সময় তিনি পথে ধর্মাত্ম আবদুল্লাহ ইবনে ওমরের আস্তানায় উপনীত হইয়াছিলেন। আবদুল্লাহ বাহিরে আসিলে মসআব তাঁহাকে সালাম জানইয়া অভিবাদন করেন। কিন্তু আবদুল্লাহ তাঁহার সালাম গ্রহণ করেন নাই। ইহাতে মসআব মনঃক্ষুন্ন হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হযরত, বান্দা কি অপরাধ করিয়াছে? উত্তরে আবদুল্লাহ কহিলেন, অপরাধ আর এর চাইতে বড় কি হইতে পারে? তুমি ছয় হাজার মুসলমানকে ক্ষমা করার ওয়াদা দিয়া তাহাদিগকে কতল করিয়াছ। মসআব কহিলেন, তাহারা তো মুসলমান

নহে, বিশ্বাসঘাতক কাফির। আবদুল্লাহ কহিলেন, তাহারা কাফির হউক আর মেষপাল হউক, আল্লা'র সৃষ্ট জীবকে বিনা অপরাধে বিনাশ করিবার তোমার কোনও অধিকার নাই। প্রতারণা পুর্বক বিনাশ আরও মারাত্মক অপরাধ। ইসলাম কখনও ইহার অনুমোদন করে না।

কুফাতেও ইহার প্রতিক্রিয়া বিষময় হইয়াছিল। কুফাবাসীরা মর্মাহত হইয়া এবার খলিফা আবদুল মালিককে কুফার শাসনভার গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিয়া পত্র লিখিল। মসআব ইহা জানিতে পারিয়া এই সকল কুমন্ত্রণাকারীদিগকে হত্যা করাইলেন। কিন্তু উমাইয়া বংশের যাহারা হিতাকাঙ্খী ছিল তাহারা ইহাতে ভীত না হইয়া আবদুল মালিককে সসৈন্যে কুফায় আসিতে অনুরোধ জানাইল। কুফায় শিয়াগণই আরও বেশী অসন্তুষ্ট হইয়াছিল মসআবের প্রতি। তাহারা প্রকাশ্যে তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিতে লাগিল। আবদুল মালিক তাঁহার সেনাপতি খালেদ বিন আবদুল্লা'কে বসরায় প্রেরণ করিলেন এবং বলিয়া দিলেন, তুমি তথায় সকলকে আমার নামে বায়াৎ করাইবে এবং মসআবের বিরুদ্ধে তাহাদিগকে সঙ্ঘবদ্ধ করিবে। এদিকে আমি স্বয়ং কুফায় গিয়া আক্রমণ চালাইব। খালেদ তদনুসারে বসরায় গিয়া মসআবের বিরুদ্ধে প্রচার কার্য চালাইতে লাগিলেন। বহুলোক তাঁহার নিকট খলিফা আবদুল মালিকের প্রতি বশ্যতা স্বীকার করিল এবং ইবনে যুবায়েরের সহিত তাহাদের সম্পর্ক ছিন্ন করিল। ইত্যবসরে আবদুল মালিক সসৈন্যে কুফায় উপনীত হইলেন। মসআবের সহিত তাঁহার তুমুল যুদ্ধ হইল। মসআব পরাজিত ও নিহত হইলেন। সমগ্র ইরাক হইতে আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়েরের অধিকার তিরোহিত হইল।

--

আব্দুল মালিকের মক্কাজয় এবং আব্দুল্লা'র পতন

মসআবের পতনের পর আবদুল মালিক ইরাক সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইলেন। অতঃপর তিনি আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়েরের রাজধানী মক্কার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন এবং হাজ্জাজ বিন ইউসুফ নামক এক দুর্ধর্ষ সেনাপতিকে বৃহৎ একদল সৈন্যসহ মক্কায় প্রেরণ করিলেন। তাহাদের প্রথম আক্রমণ ব্যর্থ হইল। ইবনে যুবায়েরের সহিত যুদ্ধে তাহারা পরাস্ত হইয়া গেল। তখন দামেস্ক হইতে তাহাদের সাহায্যে আর একদল সৈন্য প্রেরিত হইল। তাহারা হজ্জের সময় আসিয়াছিল। তাহারা কহিল, হজ শেষ হইয়া যাউক, তখন আক্রমণ করিব। হাজ্জাজ তাহাতে সম্মত হইলেন না, বলিলেন এখনই আক্রমন করিতে হইবে। হাজীগনের কষ্টের সীমা রহিল না। দুইমাস কাল মক্কা নগরী অবরুদ্ধ থাকে। বহু নিরপরাধ হজ-যাত্রী অবরুদ্ধ অবস্থায় নিহত হইল। আবদুল্লাহ আত্মরক্ষার্থে কা'বা ঘরে আশ্রয় লইলেন। তখন কা'বা ঘরের উপরও প্রস্তর ও অগ্নি সংযুক্ত তৃণ-বলয় নিক্ষেপ করা হইতে লাগিল। সৈন্যরা প্রথমে কা'বা ঘরে অগ্নিপ্রয়োগ কতিে সাহসী হয় নাই। তখন হাজ্জাজ নিজে অগ্রবর্তী হইয়া অগ্নিবর্ষণ করাইতে লাগিলেন। মক্কার সৈন্যগণ ইহাতে অনেকে ভয়ে মদীনাভিমুখে পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করিল। প্রতিরক্ষা অভাবে পবিত্র কা'বা ঘরে আগুন লাগিলা যায়। লোকে বলে, আবদুল্লাহ ইচ্ছা করিয়াই উহা নির্বাপিত করার চেষ্টা করেন নাই, এই উদ্দেশ্যে যে জনগণ ইহাতে ক্ষিপ্ত হইয়া আক্রমণকারীদিগকে বিতাড়িত করিবার জন্য আগাইয়া আসিবে। ইমাম হুসায়েন এই কা'বাঘরের বিপদ এড়াইবার জন্য মক্কার আশ্রয় করিয়াছিলেন, আর আবদুল্লাহ নিজ স্বার্থে খোদার ঘরের মর্যাদাকে যুদ্ধের পণ্যরূপে ব্যবহার করিলেন। কিন্তু খোদা তাঁহার অভিপ্রায় মনযুর করিলেন না। ধ্বংসের অভিশাপ তাঁহার উপর অবিলম্বে নামিয়া আসিল।

এই আবদুল্লাহ ছিলেন হযরত আবু বকরের দৌহিত্র। তাঁহাকে এজন্য লোকে নবী বংশের হিতৈষী বলিয়া বিশ্বাস করিত। হযরত রসূল (সঃ) মক্কা ছাড়িয়া মদীনায় হিযরত করিবার কালে আবুবকর তনয়া বিবি আসমা নিজের পরিধানের বস্ত্র ছিড়িয়া তাঁহার উটের গলায় খাদ্যের থলিয়া বাঁধিয়া দিয়াছিলেন। সেই আসমার গর্ভজাত সন্তান আবদুল্লাহ্ কারবালা-ঘটনার পর যখন মক্কার মসজিদের মিম্বরের উপর দাঁড়াইয়া ইমাম হত্যার প্রতিকারের জন্য জনগণকে সংঘবদ্ধ হইতে আহ্বান জানান, তখন সমগ্র হিজায ও ইয়ামেন অকুণ্ঠচিত্তে তাঁহার সমর্থন যোগাইয়া ছিল। ইরাক, বসরা ও ইরান পর্যন্ত লোকে তাঁহার আহ্বানে সাড়া দিয়াছিল। তিনি এরূপ বিনা যুদ্ধে, বিনা অর্থব্যয়ে এই বিস্তীর্ণ এলাকার খিলাফৎ লাভ করিয়াছিলেন, নির্যাতিত ইমামবংশের পৃষ্ঠপোষক হিসাবে। কিন্তু এইক্ষণ যখন ইমাম-হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণকারী মুখতারকে আবদুল্লাহ ধ্বংস করিলেন তখন আবদুল্লাহ্র মুখোস খসিয়া পড়িল। জনগণের সন্মুখে তাঁহার রাজ্যবিস্তার লালসা এবং ইমামদের প্রতি দরদের অভাব নগ্নরূপে প্রকটিত হইয়া পড়িল। যে ধর্মীয় আকর্ষণ জনগণকে আব্দুল্লা'র সহিত যুক্ত করিয়াছিল তাহা ছিন্ন হইয়া গেল। অধিকাংশ লোক আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়েরকে ত্যাগ করিল। তখন অল্প সংখ্যক অনুচর লইয়া আবদুল্লাহ বিষম বিব্রত হইয়া পড়িলেন। অসঙ্কোচে অর্থ ব্যয় করিলে সৈন্য হয়ত মিলিত, কিন্তু কৃপণ স্বভাব আবদুল্লাহ্ তাহাও করিলেন না। তখন বিবি আসমা জীবিতা। জীবন মরণের এই সন্ধিক্ষণে আবদুল্লাহ মাতার নিকট উপদেশ চাহিলেন। মাতা কহিলেন-পুত্র, তুমি বোধ হয় অন্যায় উদ্দেশ্য লইয়া যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছ, তাই তোমার পরাজয় হইতেছে। ন্যায় উদ্দেশ্যে যুদ্ধে লিপ্ত হইলে আব্দুল্লাহ অবশ্যই তোমার ইজ্জৎ রক্ষা করিতেন। তোমাকে অসত্যের নিকট হার মানিতে হইত না। যাও, বেটা, সত্যকার উদ্দেশ্য লইয়া যুদ্ধে অবতীর্ণ হও। যদি পরাস্ত হও, ইমাম হুসায়েনের ন্যায় সমরক্ষেত্রে দেহরক্ষা করিয়া যশস্বী হও। ইহাই বীর ধর্ম। বীর-জননীর উপদেশ শ্রবণ করিয়া আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের তৎক্ষণাৎ আপন কর্তব্য স্থির করিয়া লইলেন। মক্কার

কারবালা যুদ্ধের ঐতিহাসিক গুরুত্ব

পৃথিবীর যুদ্ধ-ইতিহাসের তুলনায় কারবালার যুদ্ধ একটি ক্ষুদ্র ঘটনা হইলেও উহার গুরুত্ব ছিল কিরূপ অপরীসীম ও প্রতিক্রিয়া ছিল কিরূপ সুদূর প্রসারী তাহা খ্যাতনামা ইংরেজ ঐতিহাসিক স্যার উইলিয়াম ম্যুয়র এর নিম্নের মন্তব্যটি হইতে অনেকটা উপলব্ধি হইবে-

The Tragedy of Karbala not only decided the fate of the caliphate but of Muhammadan Kingdoms long after the caliphate had virtually disappeared.

The rebellion of Abdullah Ibn Zubair who for 9 years (683-92 A. D.) maintained himself as indepednd dent caliph in the holy cities, like the more formidable resurrection of Al Mukhter (683-87 A. D.) owed its success to the general desire for vengeance on the murderers of Hussain and his kinsmen.

In the sack of Mediana Yazid's army (682 A. D) there perished 80 Sahabas and on fewer than 700 Karis (of the Kuran). The blood of these men too cried for vengeance as Bid the desecrated sanctuary of Macca.

Karbala at last was amply avenged by Mukhter (686 A. D.) who put to death many of the criminals of Karbala e. g., Ibn Ziad, Shimar, Amr bin Saad and hundreds of others.

A dissension followed after Mukhtar's death in (688 A. D.) from rival leaders Abdul Malik, 'Ali's son Hanafiya, Ibn Zubair and Najda the Kharijite who presided at the Haj each at the head of his own followers.

The movement of Mukhter was shiite and aimed at establishing the rights of Hanafiya. It differed from later Shia movements which recognise the importance of two great lines : (1) the direct line of the prophet namely Husain's family, and (2) the line of the Persian royal house of Sasan. The two branches met at Zainal Abedin whose mother was believed to be the daughter of Yazdigard the Persian king. Umar Khattab brought as captive two daughters of Yazdigard and gave one to Husain who named her Gazelle.

Umayyad rule reached its culmination in Abdul Malik's reign. In his time the feelings of Ansars and other adherents of the line of the prophate were ruthlessly outraged. Abdul Malik's capable but cruel general Hajjaj-bin Yusuf who first recommended himself to his master's notice by his readiness to beseize and bombard Mecca and to suppress the rebellion of Zubair, was for more than 22 years the blood thirsty and merciless scourge of the Muslim world. The number of persons he hut to death in cold blood, apart from those slain in battle, is estimated at 1,20,000.

He (A. Malik) was equally insensible to the sanctity of persons and places when political considerations bade him destroy. The Syrians under him never hesitated to obey his behests.

The whold Umayyad period is nothing but a reaction and triumph of the pagan principle.

অনুবাদ—

কারবালার শোচনীয় দুর্ঘটনা শুধু খিলাফতের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করে নাই, খিলাফতের অবসানের পরও বহুদিন পর্যন্ত উহা মুসলিম রাজ্যগুলির উত্থান পতনের মূলে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে।

মক্কায় আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়েরের বিদ্রোহ, যার ফলে তিনি নয় বৎসর কাল (৬৮৩—৯২ খৃঃ) মক্কায় স্বাধীন খলিফা রূপে রাজত্ব করেন, এবং কুফায়

আল মুখতারের পরিচালিত ততোধিক শক্তিশালী গণ-উত্থান (৬৮৩-৮৭ খৃঃ) যে সাফল্য মণ্ডিত হইয়াছিল তাহার কারণ ছিল কারবালায় হুসায়েন ও তাঁহার জ্ঞাতিবর্গের হত্যাকারীদের উপর প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য জনগণের ব্যাপক ইচ্ছা।

ইয়াযিদ সৈন্য কর্তৃক মদীনা লুণ্ঠনের সময় (৬৮২ খৃঃ), আশি জন সাহাবা এবং সাতশত কা'রী নিহত হয়। এই সকল পুণ্যাত্মার শোণিত চাহিয়াছিল উপযুক্ত প্রতিশোধ, যেমন চাহিয়াছিল মক্কায় লাঞ্ছনাপ্রাপ্ত পবিত্র কা'বা।

কারবালা হত্যার পূর্ণ প্রতিশোধ গ্রহণ করিয়াছিলেন মুখতার (৬৮৬ খ্রীঃ), যিনি কারবালা হত্যার অপরাধীদের অনেককেই মৃত্যুর মুখে নিক্ষেপ করেন। ইহাদের ভিতর আব্দুল্লাহ ইবনে যিয়াদ, শিমার, ওমর বিন সা'দ এবং আরও শত শত ব্যক্তি ছিলেন।

মুখতারের মৃত্যুর পর চারজন প্রতিদ্বন্দ্বী নেতার ভিতর বিরোধ চলিতে থাকে। ইঁহারা ছিলেন আবদুল মালিক, আলী পুত্র হানাফিয়া, আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের এবং খারিযী দলপতি নাজদা। ৬৮৮ খ্রীষ্টাব্দে আরাফাতের ময়দানে ইঁহারা প্রত্যেকে স্ব স্ব দলের প্রধান রূপে হজ্জের ভিতর ইমামতী করেন।

মুখতারের পরিচালিত আন্দোলন ছিল মূলতঃ শিয়া আন্দোলন। সেই সব শিয়া চাহিয়াছিল হানাফিয়ার অধিকার প্রতিষ্ঠিত করিতে। পরবর্তী শিয়া আন্দোলনের সহিত ইহার পার্থক্য ছিল এই হিসাবে যে, পরবর্তী আন্দোলনের মূলে ছিল দুইটি বিশিষ্ট বংশের অধিকারকে স্বীকৃত দান। (১) নবীর প্রত্যক্ষ ওয়ারিশ অর্থাৎ হুসায়েনের বংশধরদের, (২) পারস্যের শাসানীয় রাজবংশের উত্তরাধিকারীদের। এই উভয় ধারা মিলিত হইয়াছিল যয়নুল আবেদীনে, যার মাতাকে ইয়ানযদিগার্দের কন্যা বলিয়া ধরা হয়। ওমর ইবনে খাত্তাব পারস্য জয়ের পর ইয়াযদিগার্দের দুই কন্যাকে বন্দী করিয়া আনেন এবং তার একটিকে দান করেন হুসায়েনকে। হুসায়েন এই কুমারীর নাম দিয়াছিলেন গেজেল (হরিণ নয়না)।

উমাইয়া শাসন চরম উন্নতি লাভ করে খলিফা আবদুল মালিকের সময় তাঁহার আমলে আনসার ও নবীবংশের অনুগত অন্যান্য লোকদের মনে নির্মমভাবে আঘাত হানা হয়। তদীয় সেনাপতি হাজ্জাজ বিন ইউসুফ এই বলিয়া তদীয় মনিবের প্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন যে, তিনি মক্কা অবরোধ করিতে এবং উহার উপর অগ্নিবর্ষণ করিতে প্রস্তুত আছেন। ২২ বৎসরের অধিককাল তিনি মুসলিম জাহানের উপর এক নিষ্ঠুর রক্ত-পিপাসু দানব রূপে বিরাজ করিয়াছিলেন। যত লোককে তিনি যুদ্ধে নিহত করেন তাহা ছাড়াই, তিনি স্থির মস্তিষ্কে হত্যা করান এমন লোকের সংখ্যা একলক্ষ বিশ হাজার বলিয়া ধরা হয়।

আবদুল মালিকও তাঁহার মতই, ব্যক্তি ও স্থান মাহাত্ম্যের প্রতি শ্রদ্ধাশূন্য হইতেন, যখনই তাঁহার নিকট কোনও রাষ্ট্রীয় প্রয়োজন দেখা দিত তাহাদের ধ্বংসের জন্য। তাঁহার অধীনস্থ সিরিয়াবাসিগণও ছিল এমনই যে, তাহারা তাঁহার কোনও আজ্ঞা কার্যে পরিণত করিতে অনুমাত্র দ্বিধা করিত না।

বস্তুতঃ গোটা উমাইয়া রাজত্ব ছিল পৌত্তলিক যুগের ভোগসর্বস্ব সমাজনীতিরি একটি প্রতিক্রিয়া এবং উক্ত প্রতিক্রিয়ার জয়যাত্রা।

একাদশ অধ্যায়

কাহিনীর মৌলিকতা–

আনুষ্ঠানিক শোক প্রকাশ ও মহররম পর্বের উৎপত্তি

উমাইয়া রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা দূরদর্শী মু'য়াবিয়া মৃত্যুকালে পুত্র ইয়াযিদকে বলিয়াছিলেন,– "চার ব্যক্তি রহিল যাহারা তোমার খিলাফতের দাবী মানিয়া লয় নাই। তাহারা হইল আলীপুত্র হুসায়েন, আবুবকর-পুত্র আব্দুর রহমান, ওমর-পুত্র আব্দুল্লাহ এবং আবু বকরের দৌহিত্র আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের। ইহাদের ভিতর খুব সম্ভব হুসায়েনের সঙ্গে তোমার যুদ্ধ হইবে। যুদ্ধ হইলে তাহাকে প্রাণে মারিও না। কারণ সে হযরত রসূল (সঃ)-এর ঘনিষ্ঠতম আত্মীয় এবং রসূলুল্লা'র শোণিত ধারা তাহার দেহে প্রবাহিত। তাহাকে হত্যা করিলে সমস্ত মুসলিম জাহান আলোড়িত হইয়া উঠিবে।" লোকচরিত্রের নিপুণ পাঠক মু'য়াবিয়ার এই ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে সত্য প্রমাণিত হইয়াছিল।

বিসুবিয়াসের অগ্ন্যুদ্গারের কথা কে না শুনিয়াছে! খৃষ্টীয় ৭৯ সনে উহার প্রথম বিস্ফোরণে পম্পিয়াই, হারকিউলিনিয়াম ও ষ্টেবিয়াই শহর বিধ্বস্ত হইয়াছিল। তারপর পাঁচশত বৎসর পর্যন্ত মাঝে মাঝে উহার অগ্নিস্রাব ঘটিয়াছে। আজিও নাকি সেই অগ্নিগর্ভ পাষাণীর অন্তর্জ্বালা নিবৃত্ত হয় নাই। সময় সময় উহার প্রলয় শ্বাস সমগ্র দক্ষিণ ইটালীকে সন্ত্রস্ত করে। হুসায়েন-শোক মুসলিম জাহানে যে অন্তর্দাহের সৃষ্টি করে উহারও বিস্ফোরণ শুধু মদীনা, মক্কা ও কুফায় চরম বিপর্যয় আনে নাই, পরন্তু পরবর্তী দুইশত বৎসর ধরিয়া উহার অনির্বাণ ধূম্রশিখা ইতিহাসের পাতাকে বিবর্ণ করিয়াছে এবং বহু রাজ্যের উত্থান-পতনের মূলে ক্রিয়া করিয়াছে। এই প্রকার ঐতিহাসিক বিপর্যয়ের সমাপ্তি ঘটে খৃষ্টীয় দশম শতকে, হুসায়েন বংশীয় ইমাম ওবায়দুল্লাহ আল মেহদী কর্তৃক মিশরে ফাতেমীয় সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠায়।

এই তো গেল কারবালা–ঘটনার ঐতিহাসিক দিক। উহার সামাজিক তাৎপর্যও কম উল্লেখযোগ্য নয়। মুসলিম জাতির মানস ক্ষেত্রে উহার প্রতিক্রিয়া এমন ভাবে শিকড় প্রবিষ্ট করাইয়াছিল যে, সর্বদেশে, সর্বকালে সাহিত্যে, শিল্পে, সঙ্গীতে, গাথায় এবং বিবিধ পর্ব–অনুষ্ঠানে উহার করুণ অভিব্যক্তি আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

বিগত তেরশত বৎসরে আরব, আযম ও পাক–ভারতে কারবালার মর্মস্পর্শী ঘটনা লইয়া কত যে গ্রন্থ রচিত হইয়াছে তাহার সংখ্যা নির্ণয় করার উপায় নাই। বাংলা দেশের পুঁথিসাহিত্য, জারি গান, মর্সিয়া ও গজল গাঁথা ইত্যাদি কারবালার বিষাদময় কাহিনীতে ভরপুর। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া এইসকল শোকোচ্ছ্বাস বাংলার জন সমাজে করুণ রস পরিবেশন করিয়া আসিতেছে।

কালের দীর্ঘ প্রবাহে এই শোক–সাহিত্যের ভিতর বহু ক্ষেত্রেই, মূল কাহিনীর সহিত গুজব ও কল্পিত কাহিনীর সংযোগ ঘটিয়াছে ভক্ত–লেখকদের লেখনীর অনুকম্পায়। অতিরঞ্জন ও পক্ষপাতিত্বও যে কতকটা রং ফলাইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। ফলে আসলকে নকলের তন্তুজাল হইতে পৃথক করা এখন সুকঠিন হইয়াছে। এক্ষেত্রে একজন খ্যাতনামা মুসলিম ঐতিহাসিক কিরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছে তাহাই উল্লেখ করিতেছি। ভাবাবেগবর্জিত ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে মূল ঘটনা কিরূপ দাঁড়ায়, সৈয়দ, খুদাবখশ, বার–এট––ল সাহেবের লিখিত নিম্নের এই ইংরেজী প্রবন্ধে তাহা দেখা যাইবে। এই প্রবন্ধে তিনি ঘটনার মৌলিক বিবরণ দানের চেষ্টা করিয়াছেন। এবং উহা লইয়া বিভিন্ন যুগে মানুষের ভিতর কিরূপ মাতামাতি চলিয়াছে ও মহররম পর্বের কিভাবে উৎপত্তি হইয়াছে তাহাও বিশ্লেষণ করিয়াছেন।

ন্যায়শাস্ত্র বলে, জাগতিক প্রত্যেক ঘটনারই কার্য ও কারণ সমান থাকে। কিন্তু ঐতিহাসিক ঘটনায় এই নিয়মের ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয়। তার কারণ, ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর মুখ্য ও গৌণ দুই প্রকার কারণের ভিতর মুখ্য কারণের অনেকখানি প্রচ্ছন্ন থাকে মানুষের মনের অচেতন স্তরে, যেখানে হঠাৎ কোনও আলোড়ন দেখা দিলে সেই সুসুপ্ত কারণ–সূত্র গুলি নব শক্তিতে জাগিয়া উঠে

এবং দুর্দমনীয় বেগে পারিপার্শ্বিক ক্ষেত্রে বিস্ফোরণ ঘটায়। তাই পৃথিবীর বহু বিপ্লবের মূল নির্ণয় করিতে গিয়া ঐতিহাসিক সমসাময়িক মনস্তত্ত্বের গভীরে প্রবেশ করিতে হইয়াছে। সৈয়দ খুদাবখস সাহেব তাঁহার প্রবন্ধে ঐ ব্যাপারে কতটা কৃতকার্য হইয়াছেন, পাঠকগণই তাহা নির্ণয় করিবেন।

The Tragedy of Karbala-Fact and Legend

To-day the Muslim world mourns the death of Al-Husain, the second grandson of the Prophet, born at Medina in the 4th or 5th year of the Hijra. Averse from pleasure and levity,he was more discreet and dignified than his elder brother Hasan. In the stormy Caliphat of his illustrious father he had lived in retirement and even after his brother's death, though at the head of the Shiites, he had kept himself strenly aloof, during the Caliphate of Muawaya, from all political movements, despite the insisitent solicidtaions of his partisans in Iraq. On the accesion of Yazid, however, things canged. Yielding to the Pressure of his Iraqian followers Husain abandoned retire ment, but before taking the final step he resolved to makesure of his position. He, accoringly, sent his cousin Muslim b. Aqil to Iraq to report the situation to him. On arrival thousands of Shiahs greeted him and Muslim forth with advised Husain to lead the eager band. In the meantime Ubaidullah had taken up the Governorship of Iraq. He arrested and executed. Muslim. While matters stood thu in Iraq, Husain, refusing to take the oath of fenalty to Yazid left Mecca for Kufa in persuance of Muslim's advice. On his way he was informed of the execution of Muslim. Ubaidullah, watching Husain's movements, took necessary steps to check his

progress and posted cavalry to patrol the road from Hijaz to Iraq. Weak, ill-organized and defenless, the party of Husain came into collision with one of these detachments. On their refusal to half, Ubaidullah's horsemen accompanied them to Karbala, which, ten days later, became the scene of Husain's death. During these ten days Husain's attitude was marked by his characteiristic indecision and irresolution. Encircled by the soldiers of Ubaidullah he was cut off from the waters of the Euphrates -Ubaidullah banking his hopes of submission on this strategy. Husain persuaded, on the other hand, of the invioa-bility of his persons, ignored the whispers of prudence and resisted the powers of the Umayyad Government arrayed against him. He had recknoed on the Kufan soldiers but they wrecked his hopes. The execution of Muslim b. Aqil had terrorized and coerced them into submission. And thus the last chance of success passed away.

THE BATTLE

On the 10th of Mohurrum, 61 A. H. (10th October, 680), Omar b. Saad b. Abi Wakkas assumed command of the 4000 men assembled at Karbala, Husain was summoned to surrender at discretion, but he disregarded the ultimatum. Omar thereupon surrounded the camp. His partisans opposed, but Husain-did not stir. An engagement followed in which Husain fell wounded. He played none of the heroic parts so fondly credited by the Shiites to him. As a verbal report to Yazid says: "It did not last long; just time to slay a camel or to take a nap". We have it on reliable authority that Yazid, the caliph, deplored the whole affair, We are al so equally assured that he neither desired nor ordered

it. His instructions merely were to secure the persons of Husain to prevent him from becoming the centre of a dangerous agitation. The Caliph-so the authenitc account runs-treated the Alids who had survived the catastrophe with honour, provided generously for their needs and gave them an escort to Medina. These, indeed, are the facts which authentic history hands down. But upon this slender basis a magnificent fabric has been reared. Legend, fiction, imagination, malice, partisanship-they have all conspired together to draw a picture at once foolish, false and grotesque. The meticulous detais of horror and wickedness -pure creations of fancy imputed to he Umayyads, evoke year by year not merely ceaseless torrents of tears from the Shiite listeners but want only perpetuate a fiction destructive of the unity and solidarity of Islam. Let us, now, dispassionately look at this event in the light of contemporary politices. It will be readily conceded that it was the political aspect of Islam that appealed most to the Umayyads. Islam to them meant unity of the Arab's and conquest of the world. And to this twofold task the set themselves, strenuously, persistently. In defending, therefore, the politics of Islam they were logically and consistently defending the religion of the Prophet; for were they not towinborn? Taking their stand thus and, I confess, rightly so, they treated all who opposed and thwarthed this scheme of things as rebels against Islam, for were not the insurgents ruining Islam, and thereby imperilling the Islamic cause?

The Muslims did not-in fact as thing stood they could not-separate one from the other. Hence all those who in any way disturbed or endangered the unity of sthe tate were regarded as enemies of Islam. This obvious reading of the politics of the Umayyads explains and justifies many Government acts and measures which subsequent ages have censured or condemned without serious thought or conclusive

evidence. None but blind partisanship can condemn the action of the Umayyad Government in regard to Husain. Whatever may be the measure of the moral guilt of Umar b. Sad b. Abi Wakkas, Yazid, upon the evidence before us, is entitled to an honourable acquittal.

Building up the Legend

It is interesting to note that even before the tragedy of Kerbala, the Ashura Day, the 10th of Mohurrum, was associated with many events important a like to the Jews and the Arabs. The Prophet is reported to have said: "O ye men, hasten to do good work on this day, for it is a grand and blessed day on which God had mercy on Adam". Muslims celebrated this day as a day of rejoicing until the murder of Husain-since when they came to consider it as an unlucky day. Thus reports Beruni, but he does not throw any light as to when the systematic, methodical, organized mourning of the Shiites-such as we are familiar with-actually came into existence.

For this we must go to the history of Baghdad. The Hamadanids were followed by the Buwayyids- fierce Shiite fanatics. Till then the Sunnite banner had floated over Baghdad. Under Moiz-ud Dawlah,in 352 A. H, we hear, for the first time, of the introduction of solemn wailings and lamentations on the the 10th of Mohurrum. The baza's were closed; the butchers suspended their business; the cooks ceased; cooking; the listeners were emptied of their contents pitchers were placed with felt coverings on the streets; women walked about with fallen tresses, blackened faces, torn dresses, striking their faces and wailing for Husain.also pilgrimages were made to Kar. bala. On this

day, says Beruni, common people have an aversion to renewing the vessels and utensils of the household.

In the same year, on the 18th of julhijjah, the celebration of the day of the "Pond of Khumm" (the day on which the Prophet is said to have nominated 'Ali as his successor) was officially introduced at Baghbdad. On this day, on the other hand, Moiz-ud-Dawlah ordered the usual accompaniments of a festive celebration. Tents were pitched, carpets were laid. Valuable things were exhibited; with blowing of trumpets and beating of drums a huge bonifire was lighted in front of the office of the Chief of Police. On the following morning camels were slaughtered and pilgrimages were made to the graves of the Qurasihites.

The Sunnites returned the compliment by celebrating the day of the death of Husain as a day of rejoicing. They dressed themselves on the day in new garments with various kinds of ornaments and painted their eyes with stibium; they celebrated feast and gave banquets and parties.

After the fall of the Fatimids, the Sunnite Ayyubids convented, according to the Syrian custom, the 'Ashura', Day, hitherto regarded as an official day of mourning, into one rejoicing and festivity. The Sunnites even invented a direct counter celebration. Eight days after the Shiit morning for Husain, they mourned,, on their part, for Musab ibn Zubair and visited his grave at Maskin on the Dujail, just as the Shiites visited Karbala. And indeed, eight days after the 'Feast of the Pond' the Sunnites set up a counter-feast, the celebration of the day on which the prophet and Abu Bakr concealed themselves in a cave. They celebrated this feast in precisely the same way as did the Shiites their 'Feast of the Pord.

—

Fixing the Sanctuary

It is significant of the sudden and rapid rise of the Shiahs in the 4/10 century that then, for the first time, their two great sanctuaries were definitely located in Mesopotamia. Hitherto there was an uncertainty about g rave of 'Ali.' Even in 332 A. H. Masudi thus writes "Some look for the grave of 'Ali in the mosque at Kufa, others int he citadel there, and yet others by the side of Fatima's grave at Medina'. According to others the camel which carried the coffin went astray and 'Ali found his final resting-place somewhere in the territory of the tribe of Tai. The Shiite Hammadani, Abu Hiaja (d.317 A. H.) adorned the place at Meshed.' Ali-which to-day passes for the grave of Ali-with a huge domed mausoleum resting on anumber of quadrangular colu m ns, with a door on each side. The Wazir ibn Sahlan vowed during an illness, that should he recover he would encircle the mausoleum with a-wail, and this vow he fulfilled in the 401 A. H. The first great man to my knowledge, buried there at his request, was a high officer from Basra who died in 342 A. H. Of the rulers, Adad-ud-Dawlah was the first to be buried by the side of 'Ali's grave, he having been interred at first at the Dar-ul-Mulk at Baghdad. This very 'Adud-ud-Dawlah had the grave of Husain at Karbala, which had been destroyed, ploughed over and sown at the instance of the Caliph [illegible] adorned with a monument. In the 4th/10th century a [illegible]. Mery boasted of being the proud possessor of the head of the Prince of Martyrs, this head was said to have been taken in 548 A. H. from Ascalon to Cairo. Ibn Taimyya (d. 728 A.H.) declares it to be [illegible]. Already in 399/1009, a Wazir at Rai had given

directions for his dead body to be taken to Karbala for burial. His son inquired of the 'Alids wether he could purchase land for 500 dinars by the side of Husain's grave for his father's burial. The 'Alid replied that he would accept no money from those who take shelter in the neighbourhood of his ancestor. Ths the son secured a place without payment. The interior of the sanctuary at Karbala has been for the first time described by Ibn Batuta in the 8/14th centuray. Of the old times we only hear that the sarcophagus was coverd with a piece of cloth and that candles were kept burning around it. The piety of another Buwbayyid Prince Built a mosque over the grave of Rida at Tus, the most beautiful in Khorasan, Christian influences, apparent in Islamic theo logy are strikingly so in the Husain-legend. Many of the pathetic incidents of Passion Friday are introduced into the 'Ashura' feast. There were even shiites who taught that Husain was not really killed but, like Jesus, appreaed so to men.

Christian influences outside and Hindu influences within India are largely responsible for the Mohurrum celebration as it exists in the Muslim world of to-day. History has faded into legend; reason has been lost in fanaticism; a sense of the fitness of things has vanished in wild orgies. and a day of mourning-if you take it to be such-has been converted into one of tumultous reverly and unrestrained license. Not until the 4/10th century do we have this organized display of anguish and grief. The Mohurrum carnival always brings to may mind the sad but significant lines of Jalaluddin Rumi-

Alas! that a religion so sublime as ours.
Should, by the mob, be thus strangled

-S. Khuda Bukhsh. (1)

---

(1) Vide statesman, Calcutta, dated May 29, 1931.

অনুবাদ

কারবালার শোকাবহ ঘটনা—মূলবৃত্তান্ত ও উপাখ্যানাংশ

শহীদ ইমাম হুসায়েনের মৃত্যু তারিখে সমগ্র মুসলিম জাহান আজিও শোক প্রকাশ করে। হিজরী চতুর্থ অথবা পঞ্চম সনে (খৃষ্টীয় ৬২৬ সন) মদীনায় তাঁহার জন্ম হয়। আমোদ প্রমোদ ও হালকা রসিকতা ছিল তাঁহার প্রকৃতি বিরুদ্ধ। এদিক দিয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হাসান অপেক্ষা তাঁহার বিবেচনা ও আত্মমর্যাদা বোধ অধিক ছিল। তাঁহার ইতিহাস প্রসিদ্ধ পিতা আলীর ঝটিকা-বিক্ষুব্ধ শাসন আমলে তিনি রাজনীতি হইতে দূরে থাকিতেন। এমন কি ভ্রাতার মৃত্যুর পর মু'আবিয়ার খিলাফৎ আমলেও তিনি, শিয়াদের একচ্ছত্র নেতা থাকা সত্ত্বেও সর্ব প্রকার রাজনৈতিক আন্দোলন হইতে দূরে থাকিতেন— যদিও তাঁহার ইরাকী ভক্তেরা তাঁহাকে রাজনীতিতে সক্রিয় অংশ গ্রহণের জন্য পুনঃ পুনঃ পীড়াপীড়ি করিতেছিল।

কিন্তু ইয়াযিদের সিংহাসন আরোহনের পর অবস্থার আমুল পরিবর্তন ঘটে। তখন ইরাকী অনুগতদের চাপে তিনি তাঁহার নির্লিপ্ততা বর্জন করিতে বাধ্য হন। এই অবস্থায় ইয়াযিদের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত ব্যবস্থা গ্রহণের পূর্বে তিনি নিজের সাফল্য সম্বন্ধে নিশ্চিত হইতে মনস্থ করেন। তদনুসারে তিনি আপন চাচাতো ভাই মুসলিম বিন আকিলকে ইরাকের রাজধানী কুফায় প্রেরণ করেন, তথাকার অবস্থা তাঁহাকে অবহিত করানোর জন্য। মুসলিম কুফায় উপস্থিত হইলে হাজার হাজার লোক তাঁহাকে সংর্বধনা জানায়। মুসলিম তৎক্ষণাৎ হুসায়েনকে লিখিয়া পাঠার অবিলম্বে কুফায় গিয়া এই সকল অত্যুৎসাহী ভক্তদ্বিগের নেতৃত্ব গ্রহণ করিতে।

ইতোমধ্যে ওবায়দুল্লাহ ইবনে যিয়াদ কুফার শাসন ভার গ্রহণ করেন। তিনি মুসলিমকে বন্দী করিয়া তাঁহার শিরচ্ছেদ করেন। ইরাকে যখন এই

সকল ঘটনা ঘটিতেছিল, সেই সময় মুসলিমের উপদেশ অনুযায়ী হুসায়েন, ইয়াযিদের আনুগত্য স্বীকার না করিয়া, মক্কা হইতে তাহার বিরুদ্ধে কুফাযাত্রা করেন। পথে তিনি জানিতে পারিলেন যে, মুসলিম নিহত হইয়াছেন। ওবায়দুল্লাহ হুসায়েনের গতিবিধি লক্ষ্য করিতে ছিলেন। তিনি তাঁহার অগ্রগতি রোধ করার জন্য আবশ্যকীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করেন এবং হিজায হইতে কুফা পর্যন্ত সমস্ত রাস্তায় বিভিন্ন ঘাঁটিতে অশ্বারোহী প্রহরী মোতায়েন করেন। দুর্বল, শৃঙ্খলাহীন ও উপযুক্ত রক্ষীবিহীন ক্ষুদ্র হুসায়েনী কাফেলা ইহাদের একটি দলের সম্মুখে আসিয়া পড়ে। এই দলের নিষেধ অগ্রাহ্য করিয়া হুসায়েনী কাফেলা যখন অগ্রসর হইতেই থাকে তখন উক্ত অশ্বারোহী প্রহরীদল তাহাদের অনুসরণ করিতে থাকে এবং এই অবস্থায় তাহারা কারবালা প্রান্তরে উপনীত হয়। এই প্রান্তরই দশদিন পর হুসায়েনের শহীদী ময়দানে পরিণত হয়। এই দশদিন হুসায়েনের কার্যকলাপে কর্তব্য নির্ধারণ তাঁহার স্বভাবগত অনিশ্চয়তা ও সংকল্প গ্রহণে দৃঢ়তার অভাবই পরিস্ফুট হইয়াছে।

ওবায়দুল্লা'র সৈন্য বাহিনী দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া তিনি ফোরাতের পানি হইতে বঞ্চিত হইয়াছিলেন। ওবায়দুল্লাহ আশা করিয়াছিলেন তাঁহার সৃষ্ট এই সঙ্কট হুসায়েনকে নতিস্বীকারে বাধ্য করিবে। কিন্তু হুসায়েন তাহা না করিয় অন্য পন্থা অবলম্বন করিলেন পবিত্র জ্ঞানে তাঁহার দেহের উপর কোন মুসলিম আঘাত হানিতে রাযী হইবে না এই বিশ্বাসে তিনি বিচার-বুদ্ধির ইঙ্গিত উপেক্ষা করেন এবং সম্মুখে সজ্জিত বিপুল দামেস্কে শক্তির সহিত মোকাবেলা করিতে অগ্রসর হন। তিনি কুফার সৈন্যদের পুর্ব প্রতিশ্রুতির উপর আস্থা স্থাপন করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহারা তাঁহাকে নিরাশ করে মুসলিমের নিধন তাহাদিগকে আতঙ্কগ্রস্ত করিয়াছিল এবং ওবায়দুল্লার অনুগত্য স্বীকারে বাধ্য করিয়া ছিল। এইভাবে হুসায়েনের শেষ আশা নির্মূল হইয়া যায়।

যুদ্ধ

১০ই মহররম, ৬১ হিজরী, (খৃষ্টীয় ১০ই অক্টোবর, ৬৮০ সন) ওমর ইবনে সা'দ ইবনে আবি ওক্কাস কারবালা ময়দানে উপস্থিত চারি সহস্র সৈনের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া হুসায়েনকে আত্ম সমর্পণের জন্য আহ্বান জানান এবং তাঁহার ইচ্ছা কি জানিতে চাহেন। কিন্তু হুসায়েন। তাঁহার এই চরম প্রস্তাব অগ্রাহ্য করেন। অতঃপর ওমর হুসায়েন–শিবির ঘিরিয়া ফেলেন এবং আক্রমণ চালান! হুসায়েনের সঙ্গীরা তখন শত্রুদিগকে বাধা প্রদান করিল কিন্তু হুসায়েন নড়িলেন না। ইহার পর হুসায়েনের সহিত সংঘর্ষ বাধিল। হুসায়েন আহত হইয়া ভূপতিত হইলেন। শিয়াগণ অতিভক্তি বশতঃ তাঁহার উপর যে প্রকার বীরত্বের আরোপ করেন তাহার কিছুই তাঁহাতে প্রকাশ পাইল না। যুদ্ধক্ষেত্র হইতে ইয়াযিদের নিকট তদীয় লোক মারফৎ যে রির্পোট পৌছে তাহাতে বলা হইয়াছিল,– সংঘর্ষ বেশী ক্ষণ স্থায়ী হয় নাই। একটা উটজবাই করিতে যা সময় লাগে, অথবা মধ্যাহ্নিক নিদ্রায় যতটুকু সময় ব্যয় হয়, তার বেশী নয়।

নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা যায়, খলিফা ইয়াযিদ সমগ্র ব্যাপারটির জন্য দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইহাও আমরা বিশ্বস্তভাবে জানিয়াছি যে, ইয়াযিদ হুসায়েনের হত্যা ইচ্ছা করেন নাই, তজ্জন্য আদেশ প্রদানও করেন নাই। তাঁহার নির্দেশ ছিল শুধু হুসায়েনকে ধৃত ও বন্দী করা, ইহাতে তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া একটা বিপজ্জনক রাষ্ট্রবিরোধী আন্দোলন গড়িয়া না উঠে। প্রামাণ্য বিবরণীতে দেখা যায়, আলীবংশীয়দের ভিতর যে সমস্ত লোক এই দুর্ঘটনার পর বাঁচিয়া ছিলেন তাঁহাদিগকে খলিফা সম্মানের সহিত গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের প্রয়োজন মিটাইবার সকল রকম সুব্যবস্থা করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদিগকে উপযুক্ত রক্ষীসহ মদীনায় প্রেরণ করিয়াছিলেন। এই সমস্ত ঘটনা

নির্ভরযোগ্য ইতিহাসে বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু এই সামান্য ভিত্তি হইতে কি বিরাট জাঁকজমক পূর্ণ সৌধই না গড়িয়া উঠিয়াছে! কল্পিত কাহিনী, উপকথা, কবিকল্পনা, প্রতিহিংসা ও পক্ষপাতিত্ব, সবকিছু মিলিয়া এমন একটা চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে যাহা একাধারে নির্বুদ্ধিতা, মিথ্যাভাষণ ও অস্বাভাবিকতার নিদর্শন দাঁড়াইয়াছে। যে সকল লোমহর্ষক ঘটনা ও অন্যায় অত্যাচারের নিছক কল্পিত কাহিনী উমাইয়াদের বিরুদ্ধে ফেনাইয়া তোলা হইয়াছে এবং যাহা প্রতি বৎসর শুধু শিয়া শ্রোতাদের চোখে অবিশ্রান্ত অশ্রু ধারা বর্ষণ করায় না, পরন্তু ইচ্ছাকৃতভাবে একটা কল্পিত কাহিনীকে জিয়াইয়া রাখে-যাহা ইসলামের ভিতরকার ঐক্য ও সংহতির বিনাশক। ঘটনাটিকে ভাবালুতা বর্জিত অবস্থায় সমসাময়িক রাষ্ট্রনীতির পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করিয়া দেখিলে বুঝিতে বিলম্ব হইবে না যে, উমাইয়াদের নিকট তৎকালে ইসলামের রাজনৈতিক দিকটাই সর্বাধিক গুরুত্ব লাভ করিয়াছিল। তাঁহাদের নিকট ইসলামের অর্থ ছিল আরব জাতির অখণ্ড একতা রক্ষা ও বিশ্ব বিজয় এবং এই দ্বিবিধ কর্তব্যে তঁহারা কঠোর অধ্যাবসায় ও অটুট নিষ্ঠার সহিত আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। তাই তাঁহারা ইসলামী রাষ্ট্রনীতি অক্ষুন্নতা রক্ষার উদ্দেশ্যই, যুক্তিও উদ্দেশ্যের সহিত সঙ্গতি রাখিয়া নবী প্রচারিত ইসলামকেও রক্ষার প্রয়াস পাইয়াছে। কেননা, এই দুইটি সহজাত সৃষ্টি (যধভ ঠমরভ) নয় কি? এই দৃষ্টিভঙ্গি হইতে- এবং আমি মনে করি তাঁহাদের এই দৃষ্টিভঙ্গি অভ্রান্তই ছিল- তাঁহারা, যে সমস্ত লোক তাঁহাদের গৃহীত এই কর্মসূচীর বিরোধীতা করিত অথবা উহা ব্যর্থ করার চেষ্টা করিত, তাহাদিগকে ইসলাম-দ্রোহী বলিয়া গণ্য করিতেন। কেননা, এই বিদ্রোহকারীরা কি তাহাদের কার্য কলাপ দ্বারা ইসলামকে বিনষ্ট করে নাই এবং ইসলামের উদ্দেশ্যকে বিপন্ন করে নাই?

মুসলিমগণ ইসলামের রাষ্ট্রনীতি ও ধর্মীয় ইসলামকে পৃথক করিয়া দেখে নাই এবং বাস্তবিক তৎকালীন পরিস্থিতিতে তাহা সম্ভবপরও ছিল না।

তাই যাহাদের কার্য কোনও ভাবে রাষ্ট্রের সংহতি ক্ষুন্ন অথবা বিপন্ন করিত তাহার্গিগকে তৎকালে ইসলামের শত্রু বলিয়া বিবেচনা করা হইত। উমাইয়া খলিফাদের রাজনীতির এই প্রকার স্বাভাবিক অর্থ গ্রহণ করিলেই তাঁহাদের এমন অনেক কার্যের অর্থ ও সঙ্গতি ধরিতে পারা যাইবে যাহা পরবর্তী কালের লোকের গর্হিত মনে করিয়াছে ঘটনার গভীরে প্রবেশ না করিয়া অথবা অকাট্য প্রমাণের অপেক্ষা না করিয়া। হুসায়েন সম্পর্কে উমাইয়া গবর্ণমেন্টের ব্যবহারকে পক্ষপাতিত্বের দ্বারা অন্ধ না হইলে কেহ অপরাধজনক কার্য বলিয়া সাব্যস্ত করিতে পারিবে না। ওমর ইবনে সা'দ ইবনে আবি ওকাসের নৈতিক অপরাধের মাত্রা যাহা হউক আমাদের সম্মুখে যে প্রমাণাদি উপস্থিত তাহাকে ইয়াযিদ কারবালা হত্যার দায়িত্ব হইতে সম্পূর্ণভাবে নির্দোষ সাব্যস্ত হইবার অধিকারী।

উপখ্যানের উৎপত্তি ও পরিপুষ্টি

ইহা লক্ষ্যণীয় যে, দশই মহররম যাকে আশুরা বলা হয়, উহা কারবালার শোকাবহ ঘটনার বহু পূর্ব হইতে এমন কতকগুলি বিশেষ ঘটনার স্মৃতি বহন করিত যেগুলি আরব ও ইহুদী উভয় জাতির পক্ষেই স্মরণীয় ছিল। কথিত আছে, আমাদের নবী বলিয়াছেন, হে মনুষ্যগণ, এই দিনটিতে তোমরা পুন্যকার্য করিও, কেননা ইহা একটি মহান ও পবিত্র দিবস, এই দিনে আল্লাহ হযরত আদমের উপর করুণা প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

মুসলমানেরা ইমাম হুসায়েনের শহীদ হওযার পূর্ব পর্যন্ত এই দিনটিকে একটা আনন্দের দিবস রূপে উদ্‌যাপন করিত। কিন্তু উক্ত শোচনীয় ঘটনার পর হইতে তাহারা ইহাকে একটি দুর্ভাগ্যের দিবস রূপে গণ্য করিতে থাকে। আল বেরুণী এই পর্যন্ত উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু বর্তমানে শিয়াগণকে আমরা এই দিবসে যে প্রকারে আনুষ্ঠানিকভাবে এবং নির্ধারিত নিযমে শোক পালন করিতে দেখি, এই প্রথার উৎপত্তি কবে এবং কিভাবে হইল, সে সম্বন্ধে তিনি কোনও আলোকপাত করেন নাই।

এই প্রথার মূল অন্বেষণ করিতে আমাদিগকে বাগদাদের আব্বাসীয় খলিফাদের শাসন আমলে ফিরিয়া যাইতে হইবে। তথায় (খৃষ্টীয় দশম শতকে) হামাদানীদের প্রতিপত্তির বিলোপের পর বুয়াইদ বংশ প্রধান মন্ত্রিত্ব লাভ করিয়া খলিফায় সর্বপ্রকার ক্ষমতা হস্তগত করেন। ইঁহারা ছিলেন ধর্মোম্মাদ, গোঁড়া শিয়া। ইঁহাদের ক্ষমতাশীন হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত বাগদাদে বরাবর সুন্নী পতাকা উড্ডীন থাকিত। (আব্বাসীয় খলিফাগণ সুন্নী ছিলেন) শুনা যায় ৩৫২ হিজরীতে (৯৬৪ খৃঃ) বুয়াইদ বংশীয় প্রধান উযীর মুইজউদ্দৌলার আমলে সর্বপ্রথম ১০ই মহররমকে বিলাপ ও খেদ প্রকাশের দিবসরূপে নিষ্ঠার সহিত পালন করা হয়। ঐ দিবস বাগদাদের বাজারসমূহ বন্ধ রাখা হয়। কসাইগণ গরু জবেহ বন্ধ রাখে, পাচকগণ পাক কার্য হইতে বিরত থাকে, পানি সরবরাহের সরকারী আধারগুলি শূন্য রাখা হয়, পানি বহনের শূন্য কলসীগুলি মুখাবৃত অবস্থায় রাস্তায় বসান দেখা যায়। রমণীগণ তাহাদের কেশ পাশ খুলিয়া কালীমাখা মুখে ছিন্ন বস্ত্রে রাস্তায় বাহির হয় এবং মুখ চাপড়াইয়া হুসায়েনের জন্য ক্রন্দন ও বিলাপ করিতে থাকে। ইহা ছাড়া, অনেক লোক কারবালায় তীর্থযাত্রা করে। আল বেরুণী লিখিয়াছেন, ঐ দিন নগরে সাধারণ অধিবাসীরাও তাহাদের নিত্য ব্যবহার্য বাসন-পত্রগুলি মাজে নাই বা পরিবর্তন করে নাই।

ঐ সনেই ১৮ই জিলহজ্জ তারিখে "কুম" অনুষ্ঠান মেতচ মত দিলবব) নামে, উৎসব-দিবস রূপে পালনের নিয়ম বাগদাদে সরকারীভাবে প্রবর্তন করা হয়। কথিত আছে, ঐদিন নবীজী হযরত আলীকে তাঁহার ভাবী উত্তরাধীকারী রূপে মনোনয়ন দান করিয়াছিলেন। পক্ষন্তরে, ঐ দিবস প্রধান উযীর মুইজউদ্দৌলা উক্ত আনন্দ উৎসবের আনুসঙ্গিকরূপে কতিপয় আমোদ অনুষ্ঠানের জন্যও আদেশ যারী করেন। প্রকাশ্য স্থানে তাঁবু খাটাইয়া কার্পেট পাতিয়া তদুপরি বিবিধ মূন্যবান দ্রব্যাদি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়। রাজধানীর প্রধান কোতোয়ালের অফিসের সম্মুখে বৃহৎ অগ্নিকুণ্ড করিয়া ঢাক বাজাইয়া বহ্নি-উৎসব পালন করা হয়। পরদিবস সকালবেলা উষ্ট্র জবেহ করিয়া সাধারণ ভোজের ব্যবস্থা করা হয় এবং কুরাইশদের কবরস্থান যেয়ারত উদ্দেশ্যে দলে দলে লোক তীর্থ যাত্রা করে।

শিয়াদের এই উৎসব আয়োজনের পাল্টা হিসারে সুন্নিগণ হুসায়েনের শহীদ দিবসকে একটি আনন্দ উৎসবের দিনরূপে উদ্‌যাপন করে। ঐদিন তাহারা বিবিধ অলঙ্কার ও নূতন বস্ত্র পরিধান করে এবং চক্ষু সুরমা রঞ্জিত করে। অধিকন্তু, তাহারা বাড়ীতে বাড়ীতে ভোজনের আয়োজন করে এবং লোকদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়ায়।

সিরিয়া ও দেশ ফাতেমীয় সুলতানদের শাসনের অবসান ঘটিলে আইয়ুবীয় সুন্নী শাসকগণ স্থাণীয় রীতি অনুযায়ী আশুরার দিবসকে (যাহা ইতো-পূর্বে ফাতেমীয়দের আমলে শোকদিবসরূপে পালন হইত) উহাকে আনন্দ উৎসবের দিবসে পরিণত করেন। এমন কি সুন্নিগণ ঐ দিবস একটি পাল্টা উৎসবেরও প্রবর্তন করে। হুসায়েনের জন্য শিয়াদের শোক প্রকাশের আট দিন পর তাহারা মৃত মুসা'ব ইবনে জুবায়েরের জন্য শোক প্রকাশ করে এবং শিয়াগণ যেমন কারবালায় তীর্থ যাত্রা করিত সেইভাবে দুজাইল নদীর তীরে মাসকিন নামক স্থানে তাঁহার কবর যিয়ারত করার জন্য তীর্থযাত্রা করেন।

অতঃপর সুন্নীরা, ১৮ই জিলহজ্জ তারিখে উদযাপিত শিয়া উৎসবের ৮ দিন পরবর্তী একটি দিবসকে নিজেদের পাল্টা উৎসব পালনের দিবসরূপে আবিষ্কার করে। ঐদনি নাকি নবীজী ও হযরত আবুবকর পর্বত গুহায় আত্মগোপন করিয়াছিলেন। শিয়ারা যেমন জাকজমক সহকারে তাহাদের উ ৎসব পান করিত, সুন্নীরাও অনুরূপ ভাবে এই দিনে তাহাদের দলীয় উৎসবের আয়োজন করিত।

পবিত্র সমাধির অবস্থান নির্ণয়

হিজরী চতুর্থ (খৃষ্টীয় দশম) শতকের প্রারম্ভে শিয়াদের যে আকস্মিক ও দ্রুত উথান সূচিত হয় উহার সহিত সংশ্লিষ্ট আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা এই যে, ঐ সময়ে সর্বপ্রথম চূড়ান্তভাবে নির্ণীত হয় যে, তাহাদের দুইটি শ্রেষ্ঠ সমাধি-ক্ষেত্রেই মেসোপটেমিয়ায় অবস্থিত। ইতোপূর্বে হযরত আলী (কঃ) র

সমাধি-ক্ষেত্র সম্পর্কে অনিশ্চয়তা বিদ্যমান ছিল। এমন কি ৩৩২ হিজরীতে এতদসম্পর্কে ঐতিহাসিক মা'সুদী লিখিতেছেন, "কেহ কেহ কুফার মসজিদে, কেহ বা তথাকার শাহী দুর্গে হযরত আলী (কঃ) সমাধি অন্বেষণ করিত; আবার কতক লোকের ধারণা, মদীনায় বিবি ফাতিমার মাযারের পার্শ্বে উহা অবস্থিত। অন্য এক দলের মতে, যে উষ্ট্রটি হযরত আলীর শব বহন করিতেছিল উহা পথ ভুলিয়া অন্যত্র চলিয়া যায় এবং শেষ পর্যন্ত 'তায়' দেশের কোনও এক স্থানে হযরত আলী (কঃ) শেষ শয্যা রচিত হয়। আবুল হায়জা (মৃত্যু, ৩১৭ হিঃ) নামক হামাদানী বংশীয় এক শিয়া সুলতান মেশেদ শহরের আলী' নামক একটি স্থানকে, যাহা হযরত আলী (কঃ)র কবরস্থান বলিয়া লোকে মনে করিত, বৃহৎ গুম্বজ বিশিষ্ট এক সমাধি মন্দির নির্মাণ দ্বারা সুসজ্জিত করেন। উহা বহু সংখ্যক চতুষ্কোণ থাম্বার উপর স্থাপিত এবং উহার প্রত্যেক দিকেই দরজা। একদা ইবনে সাহলান নামক তথাকার এক উযীর পীড়িত হইয়া 'মানস' করিয়াছিলেন যে, তিনি যদি আরোগ্য লাভ করেন তাহা হইলে উক্ত কবর গাহ তিনি দেওয়ালে বেষ্টিত করিয়া দিবেন। এই 'মানস' তিনি পূরণ করেন ৪০১ হিজরীতে। আমি যতদূর জানি, সর্বপ্রথম যে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি নিজ প্রার্থনা সূত্রে উক্ত কবরস্থানে সমাহিত হইবার সৌভাগ্য লাভ করেন, তিনি ছিলেন বসরার এক উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী। ৩৪২ হিজরীতে তিনি প্রাণ ত্যাগ করেন। শাসকের ভিতর আদুদ-উদ-দৌলা সর্বপ্রথম আলীর কবরের পার্শ্বে স্থান লাভ করেন। প্রথমতঃ তিনি বাগদাদের 'দারুল মুলক' নামক কবর স্থানে সমাহিত হইয়াছিলেন। এই আদুদ-উদ্-দৌলাই কারবালায় হুসায়েনের কবরের উপর একটি মনুমেন্ট গড়িয়া দিয়াছিলেন। তৎপূর্বে উক্ত কবরটি বাগদাদের আব্বাসীয় খলিফা মুৎওয়াক্কিলের (রাজত্ব ৮৪৭-৬১ খৃঃ) আদেশে ধ্বংস করা হইয়াছিল এবং উক্ত স্থান কর্ষিত করিয়া তথায় বীজ বপন করা হইয়াছিল। হিজরী চতুর্থ (খৃষ্টীয় দশম) শতকে খোরাসানের রাজধানী মার্ভ শহরের নিকটবর্তী একটি গীর্জা শহীদান-সম্রাট হুসায়েনের মস্তক ধারা হিসাবে গৌরব লাভ করিয়াছিল। কথিত হইত যে, হিজরী ৫৪৮ সনে উক্ত মস্তক আসকালন হইতে কায়রোতে নীত হইয়াছিল। কিন্তু ইবনে তাইমিয়া নামক ঐতিহাসিক (মৃত্যু, ৬২৮ হিঃ)

এই কাহিনীকে নির্বোধদের গল্প বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন। কারণ ইতোপূর্বেই, ৩৯৯ হিজরীতে (১০০৯ খৃঃ) পারস্যের রায় নামক রাজ্যের এক উযীর নিজ মৃতদেহকে কারবালায় সমাহিত করার জন্য নির্দেশ দান করিয়াছিলেন। তদীয় পুত্র তদানুসারে আলী বংশের প্রধানদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইয়া ছিলেন, ৫ শত দিনার মূল্যে তিনি কারবালায় হুসায়েনের কবরের পাশে একটু জায়গা পাইতে পারেন কিনা তাঁহার পিতার কবরের জন্য। উত্তরে আলীবংশের নেতা বলিয়াছিলেন, তাঁহার পূর্ব পুরুষের (হুসায়েনের) পাশে যাঁহারা আশ্রয় স্থান চাহেন তাঁহাদিগের নিকট হইতে কোনও মূল্য গ্রহণ করা হইবে না। এইভাবে উক্ত উযীর তথায় বিনামূল্যে কারবালায় স্থানলাভ করিয়াছিলেন। ইবনে বতুতাই সর্বপ্রথম হিজরী অষ্টম (খৃষ্টীয় চতুর্দশ) শতকে কারবালায় অবস্থিত হুসায়েনের সমাধি-গৃহের অভ্যন্তর ভাগের বর্ণনা প্রদান করিয়াছেন। তৎপূর্ব সময়ের অবস্থা সম্বন্ধে এই মাত্র জানা যায় যে, পবিত্রস্থান রূপে সম্মানিত উক্ত কবর তখন একটি চাদর দ্বারা আবৃত থাকিত এবং উহার চতুষ্পার্শে মোমবাতি জ্বালাইয়া রাখা হইত। বুয়াইদ বংশীয় আর এক সুলতান ভক্তি বশতঃ পারস্যের তুশ নগরে অবস্থিত ইমাম রিযার সমাধিক্ষেত্রে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। সমগ্র খোরাসান প্রদেশের ভিতর উহা সৌন্দর্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিল। ইসলামীয় শাস্ত্রে যে খৃষ্টানী প্রভাব দৃষ্ট হয় তার একটি প্রকৃষ্ট নিদর্শন হইতেছে হুসায়েন সংক্রান্ত এই সকল কাহিনী। আশুরার অনুষ্ঠানের ভিতর খৃষ্টানদের "প্যাশন ক্রাইস্টে" সংশ্লিষ্ট বহু মর্মান্তিক ঘটনার অনুচ্ছায়া স্থান লাভ করিয়াছে। শিয়াদের ভিতর এমন সব ভক্তও আছে যাঁহারা মনে করিত, হুসায়েন সত্য সত্যই নিহত হন নাই, পরন্তু যিশুর মত, মানবের দৃষ্টিতে তিনি মরিয়াছেন বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছে।

বর্তমানে মুসলিম জাহানে যে ভাবে মহররম পর্ব উদযাপিত হয় তার জন্য ভারতের বাহিরে খৃষ্টিয়ান প্রভাব এবং ভারতবর্ষে হিন্দু প্রভাব অনেকখানি দায়ী। ইতিহাস ম্লান হইতে হইতে উপকথায় রূপান্তরিত হইয়াছে। ধর্মোন্মাদনার উচ্ছ্বাসের মুখে মানুষের বুদ্ধি বিবেচনা ভাসিয়া গিয়াছে। উচ্ছৃঙ্খল আমোদ-প্রমোদের হিড়িকে, কোন্ কথাটা খাটে ও কোন কথাটা খাটে না, সে বিচার ক্ষমতাও বিলুপ্ত হইয়াছে। যে দিনকে শোক দিবস বলা

হয়, এবং সত্যিই যদি উহাকে শোক দিবসই তোমরা বলিতে চাও, এমন একটি দিবসকেও নিরঙ্কুশ আমোদ-আহ্লাদ ও উচ্ছৃঙ্খলতার দিনে পরিণত করা হইয়াছে। হিজরী চতুর্থ (খৃষ্টীয় দশম) শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত এই প্রকার বাঁধাধরা নিয়মে ও আনুষ্ঠানিক ভাবে খেদ ও দুঃখ প্রকাশের ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায় না। মহররম কার্নিভ্যাল, সব সময় আমার মনে মৌলানা জালাল উদ্দীন রুমীর সেই সার্থক আক্ষেপ উক্তি স্মরণ করাইয়া দেয়- "আফসোস! আমাদের ধর্মের মত একটি মহান ধর্মকেও উচ্ছৃঙ্খল জনতা গলা টিপিয়া হত্যা করিয়াছে।"

– এস খুদা বখশ।

সৈয়দ খুদা বখশ সাহেবের উপরোক্ত প্রবন্ধ হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, খৃষ্টীয় দশম শতকের পূর্বে, অর্থাৎ বাগদাদে উগ্রপন্থী শিয়া উযীরদের ক্ষমতা হস্তগত করার পূর্ব পর্যন্ত, মহররম পূর্ব এখনকার মত আনুষ্ঠানিক ভাবে, জাঁকজমক সহকারে পালন করা হইত না। উমাইয়া খলিফাদের আমলে কারবালায় ইমাম হুসায়েনের কবরের উপর কোনও সমাধিগৃহ নির্মিত হয় নাই। তবে উহা পাকা করা হইয়াছিল এবং তৎকালে শিয়াগণ প্রতি বৎসর মহররম মাসে উক্ত মাযার যেয়ারত করিতে যাইত। পরবর্তীকালে সেখানে সুদৃশ্য সমাধিগৃহ রচিত হয় এবং শিয়াদের উহা একটি পবিত্র তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হয়। সৈয়দ খুদা বখশের উপরোক্ত প্রবন্ধ পাঠের সময় আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে যে, তিনি শুধু ইতিহাস প্রণেতা নহেন, তিনি একজন নামজাদা ব্যারিষ্টারও ছিলেন। তাঁহার প্রবন্ধের প্রথমাংশ পাঠে মনে হইবে, তিনি যেন একটি খুনের মামলায় বাদী পক্ষের অতিরঞ্জনে অতিষ্ঠ হইয়া আসামী পক্ষের দোষ স্খালনের জন্য আদালতের সপক্ষে "সওয়াল জবাব" (টরথলবণর্ভ) করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ইয়াযি-কে তিনি সম্পূর্ণ নির্দোষ প্রতিপন্ন করিয়াছেন। ওমর, শিমার, ওবায়দুল্লাহ্ যিয়াদ প্রমুখের আচরণ তিনি নিন্দনীয় বলিয়াছেন, কিন্তু দণ্ডনীয় বলেন নাই। তাঁহার মতে একটি সাধারণ হত্যাকাণ্ডকে পরবর্তীকালে স্বার্থান্বেষী ব্যক্তিরা একটি যুগান্তকারী ঘটনার রূপ দান করিয়াছেন। কিন্তু ঘটনাটি যে নিতান্ত সাধারণ নয়, এবং একটি নিছক হীনস্বার্থ প্রণোদিত দলীয় বিদ্রোহ নয়, পরন্তু উহা যে একটি যুগান্তকারী ব্যাপার, সন্ধানী পাঠক এই প্রবন্ধের ভিতরই তাহারও প্রচুর আভাস পাইবেন।

ইমাম বংশের পরবর্তী ইতিহাস

দ্বাদশ অধ্যায়

ইতিহাসের ধারা– উমাইয়া বংশের রাজত্ব

খলিফা আব্দুল মালিক

(৬৮৫–৭০৫ খৃঃ)

কারবালায় ইমাম হুসায়েনের হত্যাকে কেন্দ্র করিয়া আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের জনগণের সহানুভূতি অর্জন করিলেন এবং সেই বলে স্বয়ং মক্কার খলিফা হইলেন। মুসলিম জাহানের অর্ধেকের উপর তাহার আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইল। বিপ্লবী নেতা মুখতার ইমাম হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের দোহাই দিয়া ইরাকবাসীদের সহযোগিতা লাভ করিলেন এবং তাহাদের সাহায্যে আবদুল্লাহ যিয়াদ, শিমার, ওমর প্রমুখ দুষ্কৃতিকারীদের দণ্ডবিধান করিয়া নিজেকে কুফার অধিপতি রূপে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। কিন্তু এ সমস্তের ফলে ইমাম সন্তানদের কি লাভ হইল? মুখ্‌তার আবদুল্লাহ যিয়াদকে সংহার করিলেন। আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের মুখতারকে ধ্বংস করিলেন। আবদুল মালিক আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়েরকে বিনাশ করিলেন। কিন্তু যে ইমামবংশকে কেন্দ্র করিয়া এত সব ধ্বংস লীলা অনুষ্ঠিত হইল তাহাদের অবস্থার কিছুমাত্র উন্নতি কাহারও দ্বারা হইল না। এই ধ্বংসলীলার এইখানেই সমাপ্তি হয় নাই। ইহার পরেও দীর্ঘকাল ধরিয়া আরব ইতিহাসে উহার জের চলিয়াছে। কিন্তু মদীনার ছন্দহারা বুকে ইমাম সন্তানগণ পূর্বের ন্যায়ই অসহায় অবস্থায় দিনযাপন করিতে থাকেন।

আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়েরের পতনের পর খিলাফৎ লইয়া আবদুল মালিকের আর কোনও প্রতিদ্বন্দ্বী রহিল না। তিনি সমগ্র মুসলিম জাহানের একচ্ছত্র খলিফা হইলেন (৬৯২ খৃঃ)। ইহার পর পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া চলে

উমাইয়া বংশের নেতৃত্বে আরব জাতির জয়যাত্রা। কিন্তু সে কাহিনী বর্ণনা করা এ গ্রন্থের উদ্দেশ্য নয়। শুধু ইমামবংশের ভাগ্যসূত্র উক্ত উমাইয়াদের উথান-পতনের সহিত বিশেষভাবে জড়িত থাকায় তাহাদের রাজত্বের একটি সংক্ষিপ্ত ধারাবাহিক বিবরণ এখানে প্রদত্ত হইল।

আবদুল মালিকের পিতা মারোয়ান ছিলেন উমাইয়া বংশীয় হাকামের পুত্র। এই আবদুল মালিকই ছিলেন উমাইয়া বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্রাট এবং বিশাল উমাইয়া সাম্রাজ্যের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা। রাজত্বের প্রথম আট বৎসর গৃহযুদ্ধে ও রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা স্থাপনে ব্যয়িত হওয়ার পর আবদুল মালিক মুসলিম সাম্রাজ্যের প্রনষ্ট গৌরব পুনরুদ্ধারে এবং আরব জাতির ভবিষ্যৎ নিয়ন্ত্রণে আত্মনিয়োগ করেন। অতীতের তিক্ত অভিজ্ঞতা হইতে তাহার প্রতীতি হইয়াছিল, নবজাগ্রত আরব শক্তির উদগ্র প্রবাহ আরব উপদ্বীপের বাহিরে চালিত করিতে না পারিলে এ জাতির ভবিষ্যৎ অন্ধকার। ইহারা ঘরে বসিয়া ইহাদের স্বভাবসুলভ গোত্রীয় কলহে লিপ্ত হইয়া আত্মঘাতী হইবে। তাই তিনি যুদ্ধক্ষম আরববাসীদিগকে ক্রমশঃ সেনাবাহিনীতে ভর্তি করিয়া তাহাদিগকে বহির্বিশ্বে ছড়াইয়া দিতে লাগিলেন।

হযরত ওসমানের আমল হইতে আরব জাতি গৃহযুদ্ধে লিপ্ত থাকায় মুসলিম সাম্রাজ্যের প্রান্তিত অঞ্চলগুলি খলিফার হস্তচ্যুত হইয়াছিল। সিরিয়ার উত্তরস্থিত মুসলিম এলাকা বাইজেনটাইন খৃষ্টানগণ জবরদখল করিয়া বসে। পারস্যে খারিজীদল বিদ্রোহী হয়। আফ্রিকার পশ্চিম অঞ্চল স্বাধীনতা অবলম্বন করে। উত্তর আফ্রিকার কার্থেজ অঞ্চলের গ্রীকগণ শক্তি সঞ্চয় করিয়া মিশরের পশ্চিমাঞ্চল পুনঃদখল করে। আবদুল মালিক যুগপৎ সকলদিকে সৈন্য প্রেরণ করিতে লাগিলেন। সিরিয়ার উত্তরে যে এলাকা খৃষ্টানগণ বলপূর্বক দখল করিয়াছিল, তখন সেখান হইতে তাহাদিগকে বিতাড়িত করা হইল (৬৯৩ খৃঃ)। সেনাপতি মহাল্লিব পারস্যে গিয়া খারিজী দলকে করিলেন। কুতায়বা নামক আর এক সেনাপতি মধ্য এশিয়ায় প্রেরিত হইয়াছিলেন। তিনি ইরানের পূর্বসীমা অক্সাস নদী পার হইয়া তুর্কীস্থানে খলিফার আধিপত্য স্থাপন করেন এবং কাবুলের উত্তরে রথভিল নামক এক হিন্দু রাজাকে পরাস্ত করিয়া

আফগানিস্তানের উত্তরাংশ অধিকার করেন। এইরূপে হিন্দুকুশের উত্তরে ক্যাশগড় পর্যন্ত মুসলিম অধিকার বিস্তৃত হয়।

অপরদিকে সেনাপতি যোহাইর চল্লিশ হাজার আরব সৈন্যসহ উত্তর আফ্রিকায় অভিযান করেন এবং মিশরের হৃত অংশ পুনরুদ্ধার করেন (৬৯৩ খৃঃ)। আফ্রিকার উত্তর উপকূলে ভূমধ্যসাগরের তীর দিয়া এক বিপুল ভূভাগ বহুকাল ধরিয়া বাইজেনটাইন রোমক সাম্রাজ্যের শাসনাধীন ছিল। ইতিহাস-প্রসিদ্ধ কার্থেজ নগর এই এলাকারই অন্তর্ভুক্ত ছিল। কার্থেজ ছিল গ্রীকদের আফ্রিকান সাম্রাজ্যের সর্বপ্রধান সামুদ্রিক বন্দর ও রণপোতাশ্রয়। পশ্চিম মিশর পুনরুদ্ধারের পর কার্থেজ গ্রীকদের সহিত তুমুল যুদ্ধে সেনাপতি যোহাইর নিহত হইলেন। কিন্তু আবদুল মালিকের দৃঢ়তা ছিল অনমনীয়। তিনি আর একদল সৈন্যসহ প্রখ্যাত বীর হাসান বিন নোমানকে যোহাইরের স্থলে প্রেরণ করিলেন। আরব বাহিনী কার্থেজ অবরুদ্ধ করিল। সেই সুরক্ষিত নগরী দীর্ঘকাল মুসলিম আক্রমণ প্রতিহত করিয়া অবশেষে আত্মসমর্পন করিল। হানিবলের স্মৃতি বিজড়িত কার্থেজের দুর্গশিরে মুসলিম পতাকা উড্ডীন হইল (৬৯৮ খৃঃ)।

কার্থেজের পতনের পর সেনাপতি হাসান বিন নে'মান ক্রমশঃ পশ্চিম দিকে অগ্রসর হইতে থাকেন। কিন্তু মরু-পাহাড় ও অরন্যানী আবৃত বার্বারি দেশে তাঁহার জয়যাত্রা প্রতিহত হইল। কাহিনা নাম্নী এক কাল ভুজঙ্গিনী সেখানে রাজত্ব করিত। বার্বারির ম্যুর রাণী এই কাহিনা ছিলেন অসাধারণ বীর্যবতী। বার্বারগণ তাঁহাকে অলৌকিক শক্তির অধিকারিণী মনে করিয়া পূজা করিত। এই রমণীর নেতৃত্বে পঙ্গপালের ন্যায় বার্বার সৈন্য মুসলিম বাহিনীকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। সে আক্রমণ সহ্য করিতে না পারিয়া সেনাপতি হাসান সসৈন্যে পশ্চাদ্‌বর্তী হইতে বাধ্য হইলেন।

কিন্তু খলিফা আব্দুল মালিক বা সেনাপতি হাসান কেহই দমিবার পাত্র ছিলেন না। আবার নূতন সৈন্য আফ্রিকায় প্রেরিত হইল। দীর্ঘ পাঁচ বৎসর পর এক ভয়াবহ যুদ্ধে কাহিনা নিহত হন এবং বার্বারী দেশ মুসলিম অধিকারে চলিয়া আসে। বার্বারীর পশ্চিম অঞ্চলে ম্যুর জাতির বাস। ঐ অঞ্চলকে মরক্কো

বসে। বার্বার এবং মুরগণ পরে ইসলাম গ্রহণ করিয়া মুসলিম সাম্রাজ্যের এক বিরাট শক্তি-উৎসে পরিণত হয়। আব্দুল মালিকের মৃত্যুর এক বৎসর পূর্বে আটলান্টিকের উপকূল পর্যন্ত সমগ্র উত্তর আফ্রিকার বিজয় সমাপ্ত হয় (৭০৪ খৃঃ)।

খলিফা আব্দুল মালিক যেমন অসাধারণ কর্মঠ ও তীক্ষ্ণবুদ্ধি ছিলেন তেমনি তাঁহার ক্ষমতাপ্রিয়তা এবং নিষ্ঠুরতাও ছিল মাত্রাতিরিক্ত। তাঁহার প্রতিনিধি শাসকবর্গও মনিবের আদর্শ অনুসরণ করিতেন এবং উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য তাঁহার যদৃচ্ছা রক্তপাতে কুণ্ঠিত হইতেন না। কুখ্যাত সেনাপতি হাজ্জাজ ছিলেন তাঁহার দক্ষিণ হস্ত। (১)

শাসক হিসাবে আবদুল মালিকের দক্ষতা অস্বীকার করার উপায় নাই। তিনি মুসলিম সাম্রাজ্যের প্রথম টাকশাল স্থাপন করেন এবং জালমুদ্রার প্রচলন বন্ধ করেন। দামেস্ক সরকারের দলিল পত্র ও হিসাব নিকাশ পূর্বে গ্রীক ভাষায় লিখিত হইত। আবদুল মালিক এই পুরাতন প্রথা রহিত করিয়া সরকারী হিসাব ও কাগজ পত্রে আরবী ভাষার প্রবর্তন করেন। ইহা ব্যতীত তাঁহার

---

(১) এই হাজ্জাজ যখন মদীনার গভর্ণর ছিলেন তখন তিনি শুধু মদীনাবাসীদের উপর নিষ্ঠুরতা প্রদর্শন করেন নাই, সাহাবীগণের ভিতর তখন যাহারা জীবিত ছিলেন তাঁহাদের সহিতও দুর্ব্যবহার করিতে দ্বিধাবোধ করেন নাই। পরে তিনি পূর্বাঞ্চলের শাসক নিযুক্ত হন। বসরায় বসিয়া তিনি প্রায় পনেরো বৎসর ইরাক, পারস্য, কামরাণ (পারস্য উপসাগরের তীরবর্তী), খোরাসান ও মধ্য এশিয়ার উপর (কাবুল পর্যন্ত) হুকুমাত চালাইয়াছিলেন। এই সময়ের ভিতর এক লক্ষ বিশ হাজার লোককে তিনি বিচারের নামে হত্যা করান। ইহাদের অনেকের বেলায়ই মিথ্যা অভিযোগ বা শুধু সন্দেহ মাত্র তাহাদের মৃত্যুদণ্ডের কারণ হইয়াছিল। ইহাদের ভিতর এমন লোকও ছিলেন যাহারা আরবের শ্রেষ্ঠ সন্তান বলিয়া সম্মানিত ছিলেন। হাজ্জাজের মৃত্যুর পর দেখা যায়, প্রায় পঞ্চাশ হাজার নরনারী তাঁহার আদেশে কারাগারে পচিতেছে এবং তাঁহাকে অহর্নিশ অভিসম্পাত করিতেছে। খলিফা সুলাইমান সিংহাসনে আরোহণ করার পর তদীয় আদেশে এই কুখ্যাত কারাগারের দ্বার উন্মুক্ত করা হয় এবং যাবতীয় বন্দীকে মুক্তি দেওয়া হয়।

—Vide History of the Saracens by Ameer Ali, P. 101.

ব্যতীত তাঁহার প্রবর্তিত আরও অনেক সুষ্ঠু বিধান মুসলিম রাষ্ট্রের ভিত্তিমূল দৃঢ় করিয়াছিল। দামেস্কের শাসনযন্ত্রকে তিনিই গঠিত করিয়া যান। পরবর্তী উমাইয়া শাসকগণ তাঁহারই পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছেন মাত্র। কিন্তু অপ্রতিহত ক্ষমতা ও চমকপ্রদ দিগ্বিজয় সমূহ তাঁহাকে এমনই উদ্ধত করিয়াছিল যে, নবী প্রবর্তিত সাম্যনীতি, যাহা তাঁহার পূর্ববর্তী সকল খলিফাই অনুসরণ করিয়াছেন, তাহা পর্যন্ত তিনি বিসর্জন দিয়াছিলেন। আরবের জনসাধারণ আবহমান কাল হইতে বাক্ স্বাধীনতা ভোগ করিয়া আসিতেছিল। ইসলামী আমলেও তাহারা এযাবৎ খলিফার সামনে সরাসরি আপনাদের দাবী দাওয়া পেশ করার অধিকার ভোগ করিয়া আসিতেছিল। আব্দুল মালিকের সময় হইতে তাহা রহিত হইয়া যায়। ইউরোপের স্বেচ্ছাচারী সম্রাট শার্লিমেনের আদর্শে তিনি চলিতেন। আমীরুল মু'মেনীনের সামনের জনসাধারনের কথা বলা, অথবা বিচার প্রার্থনার অছিলায় দীর্ঘ বক্তৃতার অবতারণা করা তাঁহার সময় হইতে নিষিদ্ধ হইয়া যায়। অবশ্য বিচার আসনে বসিয়া তিনি নিজে সাধ্যমত ন্যায়বিচারই করিতেন, যতক্ষণ না রাষ্ট্রের অর্থাৎ তাঁহার নিজ বংশের স্বার্থ কোনও রূপে বিপন্ন হইত। তিনি বলিতেন, কেহ যেন আমাকে আল্লা'র নামে ভয় দেখাইতে অথবা ন্যায় বিচারের দোহাই দিয়া ফতোয়া শুনাইতে চেষ্টা না করে। সেরূপ করিলে আমি তাহার গর্দান লইব। খোলাফায়ে রাশেদীনের আমলে মদীনার যে সব বীর সেনাপতি ও রাষ্ট্র-শাসক মুসলিম সাম্রাজ্য গঠনের জন্য জীবনপাত করিয়াছিলেন আবদুল মালিক তাঁহাদের বংশধরদিগকে সম্পূর্ণ এড়াইয়া চলিতেন। (১)

---

(১) "Avarice and cruelty dominated his character and his lientenants." Says Masudi, "followed his footsteps in the shedding of blood." ... "He was the first, says an annalist, "Who acted treacherously in Islam, the first who forbade speaking in the presence of the Caliphs, and the first who prohibited exhortations to justice, saying, 'Let no one enjoin upon me the fear of God or love of equity. but I shall smite his neck.' In character he resembled Charlemagne. Just, when justice was not opposed to his dynastic interest; daring and energetic, resolute and ambitious he never faltered in the persuit of his designs," _ History of the Saracens by Ameer Ali. P. 101.

খলিফা ওলিদ

(৭০৫-৭১৫খৃঃ, হিঃ ৮৬-৯৬)

৭০৫ খৃষ্টাব্দে আবদুল মালিক পরলোক গমন করেন। তাঁহার বিশাল সাম্রাজ্যের সর্বত্র তখন শৃঙ্খলা বিরাজমান এবং সর্বাংশ দৃঢ়ভাবে সুরক্ষিত। এই দুর্দণ্ড প্রতাপ খলিফার নমনীয় ইচ্ছাশক্তি শুধু তাঁহার জীবদ্দশাতেই কার্যকরী ছিল না, তাঁহার মৃত্যুর পরও সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকার নিয়ন্ত্রণ ব্যাপারেও উহা দীর্ঘকাল ধরিয়া অলংঘ্য প্রতিপন্ন হইয়াছিল। তদীয় বিধান মতে তাঁহার চারি পুত্রের প্রত্যেকেই একে একে দামেস্কের সিংহাসনে আরোহণের সুযোগ লাভ করিয়াছিলেন। (অথচ তাঁহার আপন ভ্রাতা আবদুল আযীযকে তিনি সে সুযোগ দান করিতে রাজী হন নাই)।

আবদুল মালিকের জ্যেষ্ঠপুত্র ওলিদ ৭০৫ খৃঃ সিংহাসনে আরোহণ করেন। ওলিদ ছিলেন পিতার ভাগ্যবান পুত্র। তিনি বিনা ক্লেশে শুধু একটা সুগঠিত ও সুশৃঙ্খল রাজ্যের অধিপতি হন নাই, অথচ এমন কতকগুলি সুদক্ষ কর্মচারীর সহযোগিতা লাভের সুযোগ পাইয়াছিলেন। যাহারা পৃথিবীর যে কোনও জাতির ইতিহাস পুনর্গঠন করিতে সক্ষম ছিলেন। তাই ওলিদকে রাজ্য রক্ষার জন্য কিছুই করিতে হয় নাই। আর এই কারণে তিনি স্থাপত্য শিল্পের উৎকর্ষ এবং প্রজাবৃন্দের উন্নতির জন্য অনেক জনহিতকর প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। তাঁহার আমলে নব নব হর্ম্যরাজিতে রাজধানী সুশোভিত হয়। মদীনার নবী-মসজিদের তিনি আয়তন বৃদ্ধি করেন। মক্কায় কা'বা ঘরের চতুর্দিকের ময়দান ঘিরিয়া প্রশস্ত নমায গাহ প্রস্তুত করেন। দামেস্ক ও কায়রোর ঐতিহাসিক মসজিদ গুলিরও সংস্কার করিয়া বিবিধ প্রাসাদও উদ্যান মালায় উক্ত রাজধানীদ্বয়কে মনোরম করেন।

তিনি যখন রাজ্যের অভ্যন্তরে নানা জনহিতকর কার্যে ও সুশোভন হর্মমালা ও উদ্যান রাজি নির্মাণে ব্যাপৃত, তখন তাঁহার বীর সেনানীগণ পৃথিবীর বিভিন্ন রণাঙ্গণে মুসলিম শৌর্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া তাঁহার জন্য নিত্য নব নব জনপদ জয় করিতে ছিলেন। তাঁহার ভ্রাতা আস্‌লামা ও পুত্র আব্বাস উভয়ে মিলিয়া এশিয়া মাইনরে রোমকদিগকে পরাস্ত করিয়া উহার এক বিস্তীর্ণ এলাকা অধিকার করিয়া বসেন। আস্‌লামা ছিলেন খাস-রাজ পরিবারের যোদ্ধা। খলিফা ওলিদ যতদিন জীবিত ছিলেন, আস্‌লামা সমগ্র উত্তর-পশ্চিম এশিয়ার প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ ছিলেন।

খলিফা ওলিদের সময় সিন্ধুর রাজা ডাহির খলিফার সহিত বিরোধ করায় সপ্তদশ বর্ষীর সেনাপতি মুহাম্ম বিন কাসিম একদল অশ্বারোহী সৈন্যসহ স্থলপথে সিন্ধুদেশে অভিযান করেন। মুহাম্মদের পিতা কাসিম এক কালে বেলুচিস্তানের অন্তর্গত মাকরাণের গভর্ণর ছিলেন। সিন্ধুর দস্যুগণ মাকরাণের সীমান্ত পর্যন্ত লুটতরাজ করিত। অসম সাহসী মুহাম্মদ এই মাকরাণের পথে দুর্গম মরুভূমি ও পাহাড় শ্রেণী অতিক্রম করিয়া বহু কষ্টে সিন্ধু দেশে উপনীত হন। কথিত আছে, সিন্ধুর এলাকার তখন নারী, শিশু ও বালক-বালিকা সহ শত শত আরব সন্তান নির্বিচারে কারাগারে পচিতেছিল। স্বদেশের বীর মুজাহিদগণের অশ্বপদ ধ্বনি শুনার জন্য তাহারা কারা প্রাচীরের ভিতর সতত উৎকর্ণ হইয়া থাকিত। মহাবীর মুহাম্মদ লক্ষ সৈন্যের অধিনায়ক রাজা ডাহিরকে সম্মুখ যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া তাঁহার এই হতভাগ্য ভ্রাতাভগিনীদিগকে মুক্তিদান করেন। সিন্ধুর নির্যাতিত অনার্য, দ্রাবিড় ও বৌদ্ধ অধিবাসিগণ মুহাম্মদ বিন কাসিমের এই অপ্রত্যাশিত বিজয়কে বিধাতার আশির্বাদ রূপে গ্রহণ করে। কারণ তাঁহারা দীর্ঘদিন ধরিয়া আর্য, তথা বর্ণ-হিন্দুদের অত্যাচার ও শোষণে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু মুখে কিছুই বলিতে পারিত না। মুহাম্মদ সিন্ধুতে নিজকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার পর আরব সাগরের জলদস্যুগণের উপদ্রবও নির্মূল হয়। মুহাম্মদের সুশাসনে তাঁহার উপর স্থানীয় হিন্দুগণের আস্থা ফিরিয়া আসে এবং তাহারা ক্রমশঃ তাঁহার অধীনে চাকুরী গ্রহণ করিতে থাকে। রাজস্ব বিভাগ একরূপ ষোল আনাই তিনি অভিজ্ঞ হিন্দুকর্মচারীদের হস্তে

ছাড়িয়া দেন। সৈন্য বিভাগেও তিনি যোগ্যতা অনুসারে কিছু কিছু হিন্দু সেনাপতি নিয়োগ করিয়াছিলেন। দুই বৎসরের ভিতর রাজ্যের সর্বত্র শৃঙ্খলা ও শান্তি স্থাপন করিয়া তিনি উত্তর দিকে অভিযান চালনা করেন এবং পশ্চিম পাঞ্জাবের মুলতান পর্যন্ত অধিকার করেন।

অপর দিকে মিশরের পশ্চিম সীমা হইতে আটলান্টিকের উপকুল পর্যন্ত সমগ্র উত্তর আফ্রিকার মহাসেনাপতি মু'সার শাসনাধীন ছিল। তিনি ভূমধ্য সাগরে আরব রণতরীর সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া উক্ত সাগরের দক্ষিণাংশে অবস্থিত অনেকগুলি সমৃদ্ধ দ্বীপে মুসলিম আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করেন। ইতোমধ্যে স্পেনের অধিবাসিগণ তথাকার রাজা রডারিকের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হইয়া মুক্তির জন্য মু'সার শরণাপন্ন হয়। রডারিকের বিরুদ্ধে জনগণের চিত্ত আরও ক্ষিপ্ত হইয়া উঠে, যখন তাহারা শুনিতে পাইল, মদ্যপায়ী রডারিক বলপূর্বক তাঁহার আশ্রিতা কুমারী ফ্লোরিন্দার শ্লীলতা হানী করিয়াছেন। কিউটার গভর্ণর কাউন্ট জুলিয়ান তাঁহার কন্যা ফ্লোরিন্দকে রাজ প্রাসাদে রাখিয়াছিলেন প্রাসাদের আদব কায়দা শিক্ষার জন্য। বালিকার মর্মভেদী খেদোক্তি পিতাকে অধীর করিয়া তুলে। তিনি প্রতিজ্ঞা করেন, যে কোনও উপায়ে হউক অধর্মচারী রডারিককে তিনি সমুচিত শাস্তি দিবেন। তাই তিনিও মু'সার সহিত সংযোগ স্থাপন করিলেন এবং স্পেন অভিযানে তাঁহাকে যথাসাধ্য সাহায্য দানে প্রতিশ্রুত হইলেন।

মহাসেনাপতি মু'সা এই সকল বৃত্তান্ত খলিফার গোচরে আনিলেন এবং তাঁহার অনুমতি লইয়া তরুণ সেনাপতি তারিক বিন যায়েদকে তাঁহার অধীনস্থ সাত হাজার ম্যুর সৈন্যসহ স্পেনে অভিযান করিতে নির্দেশ দিলেন। মরক্কোর উত্তরেই বৃহৎ জিব্রালটার প্রণালী এবং তার পর স্পেন দেশ! উক্ত প্রণালীই আটলান্টিক ও ভূমধ্যসাগরের ভিতরকার যোগসূত্র। প্রণালী যেখানে সর্বাপেক্ষা অল্প পরিসর এবং উহার বিস্তার মাত্র ১৩ মাইল, সেই স্থান দিয়া তারিক সসৈন্যে প্রণালী পার হইলেন। উভয় তীর প্রস্তরময়, তদুপরি উন্নত পর্বত। এই পর্বতদ্বয়কে গ্রীকেরা "পিলারস অব হারকিউলিস" নাম দিয়াছিল। উত্তর

পারে যে পর্বতগাত্রে তারিক অবতরণ করেন উহা "জাবল তারিক" (জিব্রালটার নামে আজিও তারিকের স্মৃতি বহন করিতেছে। উক্ত প্রণালীও জিব্রালটার প্রণালী নামে অভিহিত হইয়াছে।

ম্যুর বাহিনীর এই অপ্রত্যাশিত অভিযানে রডারিক ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া উঠেন। শ্বেতজাতির আবাস ভূমি পবিত্র স্পেনে ম্লেচ্ছের পদক্ষেপ ঘটিয়াছে, ইহা চিন্তায় আনাও তাঁহার অসহ্য ছিল। তিনি তাঁহার পঁচিশ হাজার দুর্ধর্ষ গথসৈন্যসহ তারিকের গতিরোধ করিতে ধাবিত হইলেন এবং স্পেনের সকল সামন্ত রাজ্যকে নির্দেশ দিলেন সসৈন্যে তাঁহার সাহায্যে অগ্রসর হইতে। একলক্ষ সৈন্য তাঁহার পতাকা তলে সমবেত হইল। মু'সা তাঁহার এই রণসজ্জার সংবাদ পাইয়া ইতোমধ্যেই পাঁচ হাজার সৈন্য লইয়া তারিক গোয়াডিলিট নদীতীরে রডারিকের সম্মুখীন হইলেন। উভয় পক্ষের তুমুল যুদ্ধ হইল। মুসলিম সৈন্যদল তিনদিক হইতে বেষ্টিত হইবার উপক্রম দেখিয়া মহাবীর তারিক জীবন পণ করিয়া ভীমবেগে রডারিকের উপর আপতিত হইলেন। মুসলিম বাহিনীর তলোয়ারের সম্মুখে খৃষ্টান সৈন্যদল ছিন্নভিন্ন হইয়া যাইতে লাগিল। অবশেষে তাহারা ভীষণ ভাবে পর্যুদস্ত হইয়া দিগ্‌-বিদিক্ পলায়ন করিতে লাগিল। রডারিক স্বয়ং বন্দী হইবার আশঙ্কায় রণক্ষেত্র ত্যাগ করিয়া অশ্বসহ গোয়াডিলিটের তরঙ্গায়িত জলে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। তরঙ্গ প্রবল ছিল। ইহার পর রডারিকের আর সন্ধান পাওয়া গেল না। অতঃপর তারিক সসৈন্যে অগ্রসর হইয়া রাজধানী টলেডো অধিকার করিয়া লইলেন। স্পেনদেশে তাঁহার অগ্রগতি আর কেহ রুখিতে পারিল না। মহাসেনাপতি মু'সার অনুমতির জন্য বিলম্ব না করিয়া তিনি নগরীর পর নগরী অধিকার করিয়া চলিলেন। তাঁহার এই দুর্বার গতি পরিশেষে বিস্কে উপসাগরের সৈকত ভূমিতে গিয়া স্থগিত হইল (৭১২ খৃঃ)

ইহা লক্ষ্যণীয় যে, ঠিক এই সময় এশিয়ার রণাঙ্গণে আর এক তরুণ সেনাপতি তাঁহারই মত দেশজয়ে ব্যাপৃত ছিলেন। ইনি হইলেন মহাবীর মুহম্মদ বিন কাসিম।

এদিকে মহা সেনাপতি মু'সা তারিকের এই আশাতীত বিজয়ের সংবাদে একদিকে যেমন উল্লসিত হইলেন, সেই সঙ্গে ইর্ষান্বিতও হইয়া ছিলেন। যশঃ লালসায় অশীতিপর বৃদ্ধ-সেনাপতি আবার যৌবন উন্মাদনায় মাতিয়া উঠিলেন এবং আঠার হাজার আরব সৈন্যসহ স্পেনে উপনীত হইলেন। স্পেনের উত্তর ও পূর্বাঞ্চলে যে অংশ তখনও অবিজিত ছিল মু'সা সেগুলি জয় সমাপ্ত করিলেন। শস্যশ্যামল ও নয়নাভিরাম স্পেনদেশ সম্পূর্ণরূপে মুসলিম খলিফার পদানত হইল (৭১৩ খৃঃ)।

ইহার পর মু'সা তারিককে ডাকিয়া পাঠাইলেন এবং সামরিক শৃঙ্খলা ভঙ্গের জন্য কৈফিয়ৎ তলব করিলেন। টলেডোর উপকণ্ঠে সৈন্যশিবিরে উভয় সেনাপতির সাক্ষাৎ হইল। তথায় ঈর্ষাকাতর মু'সা বার্ধক্যসুলভ অধৈর্যের সহিত তারিককে প্রকাশ্য স্থানে, তাঁহার নিজ সৈন্যদলের সম্মুখে অপমানিত করিয়া নিজের সার্বভৌম ক্ষমতার নযীর স্থাপন করিলেন। তারিক অবনত মস্তকে সমস্ত সহ্য করিলেন।

অতঃপর তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া মহাসেনাপতি মু'সা ফরাসী দেশ জয়ের উদ্দেশ্যে সসৈন্য পিরেনিজ পর্বতের দিকে ধাবিত হইলেন। কিন্তু নিয়তি বোধ হয় মু'সার উপর অপ্রসন্ন ছিল। মু'সা যখন পিরেনীজের শৈল শিখরে দাঁড়াইয়া ফ্রান্স এবং পূর্ব ইউরোপ জয়ের স্বপ্ন দেখিতেছিলেন সেই সময় খলিফার নিকট হইতে ফরমান আসিল, তারিককে সঙ্গে লইয়া দামেস্কে হাযির হইবার জন্য। খলিফা স্পেন জয়ের সুসংবাদের সঙ্গে তারিকের প্রতি মু'সার দুর্ব্যবহারের কথাও শুনিতে পাইয়াছিলেন। মহা সেনাপতি মু'সার স্বপ্নসাধ শূন্যে বিলীন হইল।

স্পেন উত্তর, আফ্রিকা এবং ভূমধ্য সাগরীয় দ্বীপ সমূহের শাসনের ব্যবস্থা সুসম্পন্ন করিয়া দামেস্কে যাইতে মু'সার কিছু বিলম্ব হইল। ইতিমধ্যে খলিফা ওলিদ অসুস্থ হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। মহান খরিফার ইচ্ছাছিল, বিচারে যাহাই সাব্যস্থ হউক বিজয়ী সেনাপতিকে তিনিবীরোচিত সংবর্ধনা জ্ঞাপন করিবেন এবং এইরূপ ইচ্ছা তিনি প্রকাশও করিয়াছিলেন। কিন্তু মৃত্যু তাঁহার সে পরিকল্পনা ব্যর্থ করিয়া দিল। তাঁহার পরবর্তী খলিফা সুলায়মান তাঁহার সমস্ত ব্যবস্থা উলটপালট করিয়া দিলেন।

ওলিদের যশঃসূর্য যখন মধ্য গগনে সেই সময় এই ভাগ্যবান নৃপতি ইহলোক ত্যাগ করেন। তাঁহার অন্তঃকরণ পিতার ন্যায় কঠিন ছিল না। ভাইদের তুলনায় তিনি মহানুভবও ছিলেন। অপ্রতিহত বিজয় গৌরব ও অন্তরের ঔদার্য বিচার করিয়া আরব ঐতিহাসিকগণ তাঁহাকে উমাইয়াদের ভিতর সর্বশ্রেষ্ঠ সম্রাট বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

খলিফা সুলায়মান

(৭১৫–১৭ খৃঃ, হিঃ ৯৬–৯৯)

খলিফা ওলিদের দশ বৎসর ব্যাপী গৌরবময় রাজত্বের অবসান হইলে পিতার ব্যবস্থা অনুযায়ী ওলিদের কনিষ্ঠ ভ্রাতা সুলায়মান সিংহাসনে আরোহণ করেন। ওলিদ চেষ্টা করিয়াও পিতার ব্যবস্থা রদ করিতে পারেন নাই তাঁহার ইচ্ছা ছিল তাঁহার পুত্র ইয়াযিদকে সিংহাসন দান করা। সুলায়মান ইহা জানিতে পারেন এবং দতবধি তিনি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ঘোর শত্রুতে পরিণত হন।

যৌবনে সুলায়মান ছিলেন ক্রীড়াশক্তি ও আমোদ প্রিয়। সিংহাসন লাভের পূর্ব পর্যন্ত তিনি শিকার ও মাসরিক ক্রীড়া-কৌশল প্রদর্শনীতে মাতিয়া থাকতেন। এতবড় বিশাল সাম্রাজ্যের দায়িত্ব বহনের মত মস্তিষ্ক তাঁহার ছিল না। রাজ্যের সাধারণ ব্যাপারেও তিনি তাঁহার জ্ঞাতিভ্রাতা ওমর ইবনে আব্দুল আযীযের নিকট উপদেশ লইতেন। কিন্তু যেখানে ব্যক্তিগত আক্রোশ অথবা স্বার্থের ব্যাপার থাকিত সে সব ক্ষেত্রে তিনি তাঁহার সেনাপতি ইয়াযিদ ইবনে মহাল্লাবের দ্বারা চালিত হইতেন। ওলিদের সমর্থক হাজ্জাজের উপর সুলায়মানের ক্রোধের সীমা ছিল না। কিন্তু ওলিদের জীবদ্দশাতেই হাজ্জাজের মৃত্যু হইয়াছিল (৭১৪ খৃঃ)। সিংহাসনে বসিয়াই সুলায়মান হাজ্জাজের বন্দীশালা উন্মুক্ত করিয়া দেন এবং বহু সহস্র কয়েদীকে মুক্ত করিয়া দেন। তিনি হাজ্জাজের স্থলে ইয়াযিদকে ইরাকের গভর্ণর নিযুক্ত করেন হাজ্জাজের প্রবর্তিত কতিপয় অন্যান্য ট্যাক্সও তিনি রহিত করেন। ইরাকের গভর্ণর ছিলেন সমগ্র পূর্বাঞ্চলের শাসক। পারস্য, তুর্কীস্তান, আফগানিস্তান ও সিন্ধু তাঁহার কর্তৃত্বাধীন ছিল। খলিফা ওলিদের আমলে ইয়াযিদ একবার খোরাসানের গভর্ণর নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু হাজ্জাজ তাঁহাকে কোনও অপরাধের জন্য পদচ্যুত করিয়া কারারুদ্ধ করেন। ইয়াজিদ সে অপমান জীবনে ভুলিতে পারেন

নাই। খলিফাও ক্রমশঃ তাঁহার মন্ত্রণায় প্রতিহিংসা পরায়ণ হইয়া উঠেন। ইরাকের শাসনভার পাইয়া ইয়াযিদ যখন হাজ্জাজের উপর প্রতিশোধ লওয়ার সুযোগ লাভ করিলেন হাজ্জাজ তখন পরলোকে, তাই ইয়াযিদের সকল আক্রোশ এক্ষণে নিবর্তিত হইল হাজ্জাজের ভ্রাতুষ্পুত্র নিরপরাধ মুহম্মদ বিন কাসিমের উপর। খলিফার নামে তিনি মুহম্মদকে দামেস্কে আহ্বান করিলেন।

মুহম্মদ বিন কাসিম তখন মুলতান জয় সমাপ্ত করিয়া কাশ্মীর অধিকারের জন্য উত্তর দিকে অভিযান চালাইতে ছিলেন। ইতোমধ্যে খলিফার নামাঙ্কিত ফরমান আসিয়া তাঁহার সকল পরিকল্পনা ব্যর্থ করিয়াছিল। তিনি সিন্ধুত্যাগ করিয়া সমুদ্র পথে ইরাকে রওয়ানা হইলেন। সিন্ধুর অধিবাসীরা তাঁহাকে দেবতার ন্যায় ভক্তি করিত। তাহারা তাঁহাকে ছাড়িতে চাহে নাই। তাঁহার সহযোগী সেনাপতি ও বন্ধুগণও তাঁহাকে দামেস্কে যাইতে নিষেধ করেন। তিনি তখন বিপুল শক্তির অধিকারী। ইচ্ছা করিলেই বিদ্রোহ করিতে পারিতন। কিন্তু সে যুগের সামরিক শিক্ষা ছিল নৈতিক শিক্ষারই পর্যায়ভুক্ত। তিনি দেখিলেন মুসলিম সাম্রাজ্য তখন তিন মহাদেশে পরিব্যপ্ত। পৃথিবীর বিভিন্ন রণাঙ্গণে বীর সেনাপতিগণ একই কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে যুদ্ধরত রহিয়াছেন। সে ক্ষেত্রে দূরতম প্রদেশের শাসক বা বিজয়ী সেনাপতিগণ যদি নিজ নিজ শক্তির সুযোগ গ্রহণ করিয়া কেন্দ্রীয় সরকারকে অগ্রাহ্য করিতে শুরু করেন তবে সে নযীর সংক্রামক হইবে এবং বিশাল মুসলিম সাম্রাজ্য সংহতি অভাবে খণ্ড খণ্ড হইয়া অচিরেই ভাঙ্গিয়া পড়িবে। তাই সিন্ধু বিজয়ী মহাবীর মুহম্মদ একজন সাধারণ সৈনিকের ন্যায় একাকী ইরাকে উপনীত হইলেন। গভর্ণর ইয়াযিদ তাঁহাকে পাইবা মাত্র গ্রেফতার করিলেন। তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল, তিনি ভারতে স্বাধীন রাজ্য স্থাপনের ষড়যন্ত্রে রত হইয়াছিলেন এবং সেই উদ্দেশ্যে সিন্ধু জয়ের পর খলিফার বিনা হুকুমে উত্তর ভারতে অভিযান চালাইয়া ছিলেন। খলিফার আদেশ আনাইয়া তাঁহার শিরচ্ছেদন

করাইতে ইয়াযিদের বিলম্ব হইল না। বীরপ্রসু আরবের এক কৃতি সন্তান এইভাবে কুচক্রীর চক্রান্তে বিনা বিচারে অকালে জীবন হারাইল (৭১৫ খৃঃ)।

অতঃপর মধ্য এশিয়া ও তুর্কীস্তান বিজয়ী প্রখ্যাত সেনাপতি এবং ঐ অঞ্চলের গভর্ণর কুতায়বা হইলে ইয়াযিদের দ্বিতীয় শিকার। তিনি ছিলেন হাজ্জাজের নিয়োজিত। তাঁহাকেও অনুরূপ ভাবে ডাকিয়া পাঠান হইল। কিন্তু তিনি ইয়াযিদের উদ্দেশ্য পুর্বেই অনেকটা অনুমান করিতে পারিয়াছিলেন, তাই খলিফার নামাঙ্কিত ফরমান পাইয়াও দামেস্কে অসিতে অস্বীকার করিলেন। তখন দামেস্ক হইতে তাঁহার বিরুদ্ধে শাহী সৈন্য প্রেরীত হইল এবং যুদ্ধে তিনি নিহত হইলেন।

ইতোমধ্যে স্পেন হইতে মহা সেনাপতি মু'সা ও তারিক দামেস্কে আসিয়া উপনীত হইলেন। ন্যায় বিচারক বলিয়া সুলায়মানের মনে গর্ব ছিল। মু'সা তাঁহার সহিত সাক্ষাত প্রার্থী হইলে সমস্ত দিন তাঁহাকে দরবার গৃহের বাহিরে পাথরফাটা রৌদ্রে দাঁড়া .করাইয়া রাখা হইল। সুলায়মানের মনে ধারণা জন্মিয়াছিল, সমৃদ্ধ স্পেন দেশ জয় করিয়া মু'সা বিপুল ঐশ্বর্যের অধিকারী হইয়াছেন। বিচারে তিনি মু'সার এত টাকা জরিমানা করিলেন যে তিনি তাঁহার সারা জীবনের উপার্জন রাজকোষে জমা দিয়াও সম্পূর্ণ অব্যাহতি পাইলেন না। কোনও মতে কারাদণ্ড হইতে মুক্তি পাইলেন কিন্তু চাকুরী তাঁহাক হারাইতে হইল। কথিত আছে, শেষ জীবনে তিনি নিঃস্ব অবস্থায় নিজ দেশ হিজাযের পল্লীতে ভিক্ষা দ্বারা দিনপাত করিয়াছেন। হিজায সন্তান তারিকও বরখাস্ত হইলেন। তাঁহারও বাকী জীবন দারিদ্রের ভিতর দিয়া অতিবাহিত হয়। সাম্রাজ্যকে যাহারা ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসাবে ব্যবহার করে তাহাদের কার্যকলাপ জাতির উপর কত বড় অভিসম্পাত ডাকিয়া আনিতে পারে সুলায়মানের আচরণ তাহার দৃষ্টান্ত স্থল। আরবের শ্রেষ্ঠ বীরগণ তাঁহারই অবিমৃশ্যকারিতার ফলে একে একে পৃথিবীর সকল রণাঙ্গণ হইতে অপসৃত হন এবং মুসলিম বিজয় স্রোত চিরতরে ব্যাহত হয়।

মাত্র আড়াই বৎসর স্থায়ী রাজত্বের ভিতর সুলায়মান ওলিদের আমলের সকল বড় বড় শাসক ও সৈন্যাধ্যক্ষকে অপসারিত করিয়া নিজের ভবিষ্যৎকে

সর্বপ্রকার আশঙ্কা হইতে বিমুক্ত করিলেন। কিন্তু অদুরদর্শী সুলায়মান ইহার পরিণাম অনুধাবন করিতে পারেন নাই। অতঃপর পিতা ও ভ্রাতার ন্যায় দেশজয়ের খ্যাতি অর্জনের জন্য তিনি বাইজেনটাইন রোমক সাম্রাজ্যের রাজধানী কনষ্টান্টিনোপল আক্রমণের জন্য জলস্থল উভয় পথে বিপুল সৈন্য প্রেরণ করিলেন। আঠার শত মুসলিম রণতরী বসফোরাসের অদূরে নঙ্গর করিল। স্থলসৈন্যগণও বসফোরাসের দক্ষিণ উপকূলে ছাউনী ফেলিল। কিন্তু প্রাকৃতিক দুর্যোগে আক্রমণ বিলম্বিত হইতে লাগিল। ক্রমে সৈন্যদের রসদও নিঃশেষ হইয়া আসিল। পরন্তু, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও রাজধানীর কর্মকর্তাদের অযোগ্যতার কারণে যুদ্ধক্ষেত্রে রসদ পৌছিতে অত্যধিক বিলম্ব ঘটিল। ফলে মুসলিম বাহিনীর কনষ্টান্টিনোপল অভিযান চরম ব্যর্থতায় পর্য্যবসতি হইল।

সুলায়মান এই দুঃসংবাদে মর্মাহত হন এবং অতঃপর স্বয়ং অভিযান পরিচালনা উদ্দেশ্যে যুদ্ধযাত্রা করেন। কিন্তু টুর্ণামেন্টে বিজয়-মাল্য লাভ ও যুদ্ধজয় এক জিনিস নহে। চির বিলাসিতার ক্রোড়ে লালিত শাহী দুলালের পথশ্রম ও আহারনিদ্রার অনিয়ম সহ্য হইবে কেন? তিনি পথিমধ্যে অসুস্থ হইয়া প্রাণ ত্যাগ করিলেন (৭১৭ খৃঃ)।

খলিফা দ্বিতীয় ওমর

(৭১৭-৭২০ খৃঃ, ৯৯-১০১ হিঃ)

খলিফা সুলায়মান যখন পরলোক গমণ করেন তখন সিংহাসনের পরবর্তী উত্তরাধিকারী আব্দুল মালিকের তৃতীয় পুত্র ইয়াযিদ সম্পূর্ণ সাবালক হন নাই। সেই সময় আবদুল মালিকের ভ্রতুষ্পুত্র ওমরকে সিংহাসনে বসিতে দেওয়া হয়। উমাইয়া কুলে এই ওমর বিন আবদুল আযীযই ছিলেন একমাত্র খলিফা যিনি পুরাপুরি ইসলাম আদর্শ মানিয়া চলিতেন। তিনি ছিলেন মদীনার দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমরের পদাঙ্ক অনুসারী এবং পরম ধার্মিক। এজন্য পাশ্চাত্য ঐতিহাসিক তাঁহাকে "ধর্মাত্মা ওমর" (Omar the Pious) বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। তিনি জীবনে কখনও মদ্যপান করেন নাই। নিজে যাবতীয় বিলাসিতা বর্জন করিয়া রাজপুরীকেও বিলাসিতামুক্ত করিতে তিনি চেষ্টা করেন। শাহী আস্তাবলের অতিরিক্ত অশ্বগুলি বিক্রয় করিয়া সেই অর্থ তিনি রাজকোষে জমা দেন। স্বীয় পত্নী. আব্দুল মালিক তনয়া ফাতিমার রত্নালঙ্কারগুলিও তিনি পত্নীর সম্মতিক্রমে সরকারী ধন-ভাণ্ডারে জমা দেন। এই রমণীও ছিলেন পরম ধার্মিক। তাঁহার স্বামীর মৃত্যুর পর লোকেরা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করে, তিনি অলঙ্কারগুলি ফিরাইয়া চাহেন কিনা। উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, স্বামী বাঁচিয়া থাকিতে যেগুলির প্রয়োজন হয় নাই, এখন আর সেগুলিতে তাঁহার কি প্রয়োজন?

ওমরের আমলে ইসলামী শরীয়ৎ ও সুন্না অনুযায়ী বহু জনহিতকর ফরমান প্রচারিত হয়। উমাইয়া খলিফাগণ জু'মার খুৎবার ভিতর হযরত আলীর কুৎসা প্রচার করিতেন। মু'য়াবিয়ার আমল হইতে এই রীতি চলিয়া আসিতেছিল। ওমর উহা রহিত করেন। কিন্তু দুর্নীতিপরায়ণ উমাইয়া নেতাগণ তাঁহার এই ঋষিজনোচিত মনোবৃত্তি সহিতে পারিলেন না। তাঁহারা নানাপ্রকারে বাধা সৃষ্টি

করিতে লাগিলেন। ফলে মাত্র আড়াই বৎসর রাজত্বের পর এই মহানুভব খলিফা বিষ প্রয়োগের ফলে অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হন (৭২০ খৃঃ, ১০১ হিজরী)। তখন তাঁহার বয়স মাত্র ঊনচল্লিশ বৎসর হইয়াছিল। গীবন বলিয়াছেন, উমাইয়া রাজত্বের ইতিহাসে ওমর সংক্রান্ত এই ক্ষুদ্র অধ্যায়টি লিখিতে ঐতিহাসিকগণ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়াছেন। ইহা যেন মরুভূমিতে শান্তিপ্রদ ওয়েসিস। ইহার পরেই আবার সেই অত্যাচার, অবিচার, পক্ষপাতিত্ব ও কাটাকাটির রক্তাক্ত কাহিনী।

খলিফা দ্বিতীয় ইয়াযিদ

(৭২০-৭০৪ খৃঃ, ১০১-১০৫ হিজরী)

ওমরের মৃত্যুর পর আব্দুল মালিকের তৃতীয় পুত্র ইয়াযিদ সিংহাসনে আরোহণ করেন (৭২০ খৃঃ)। তিনি পূর্বাপেক্ষা দ্বিগুণ বেগে বিলাসিতার স্রোতে রাজধানী প্লাবিত করেন এবং ওমরের প্রচারিত যাবতীয় শরিয়ৎ ভিত্তিক ফরমান রহিত করিয়া তৎপরিবর্তে নিজের খোশ-খেয়াল মত নিত্য নূতন আদেশ যারী করিতে থাকেন। তিনি সাল্লামা ও হাবাবা নাম্নী দুই আরব সুন্দরীর প্রেমে দিবারাত্রি মশগুল থাকিতেন। মদ ও নারী ছিল তাঁহার নিত্য সহচর। এদিকে রাজ্যের সর্বত্র অরাজকতা, অত্যাচার ও অশান্তির করাল ছায়া বিস্তার লাভ করে। এই অকর্মন্য খলিফার আমলে, শাসকদের দুর্নীতি ও বিলাসিতার ফলে খলিফা নিজে এবং তদীয় কর্মচারীরা প্রজাদের শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি এমনভাবে হারাইয়া বসেন যে বিদ্রোহের ষড়যন্ত্র ও বিপ্লবীদের গোপন আড্ডায় দেশ আচ্ছান্ন হইয়া যায়। ইহার ফলে সাম্রাজ্যের ভিত্তিমূল এমনভাবে নাড়িয়া যায় যে, পরবর্তী খলিফাগণ শত চেষ্টা করিয়াও উহা আর সুদৃঢ় করিতে সমর্থ হন নাই। ইঁহারই সময় আব্বাসীয় বংশের যুবকগণ ওমাইয়া বংশের উচ্ছেদের জন্য সুপরিকল্পিত কর্মসূচী গ্রহণ করেন এবং স্থানে স্থানে বিদ্রোহের গোপন ঘাঁটি প্রতিষ্ঠিত করেন।

খলিফা হিসাম

(৭২৪–৭৪৩ খৃঃ, ১০৫–১২৫ হিজরী)

চার বৎসর ব্যাপী ইয়াযিদ রাজত্বের কলঙ্কময় অধ্যায় সমাপ্ত হইলে আবদুল মালিকের চতুর্থ পুত্র হিসাম সিংহাসনে আরোহণ করেন (৭২৪ খৃঃ, ১০৫ হিঃ) পূর্ববর্তী খলিফা সুলায়মান ও ইয়াযিদের অকর্মণ্যতার ফলে বিশাল উমাইয়া সাম্রাজ্যের সর্বত্র বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়াছিল। সীমান্তবর্তী কতিপয় এলাকা খলিফার হস্তচ্যুত হইয়াছিল। বিদ্রোহ দমন, বিশৃঙ্খলা দূরীকরণ ও হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধার করিতে তরুণ বয়স্ক হিসামকে অনেক বেগ পাইতে হইয়াছিল।

মধ্য এশিয়ার তাতারগণ বিদ্রোহী হইয়া পূর্বাঞ্চলে অসহ্য উপদ্রব সৃষ্টি করিয়াছিল। তাহারা পারস্যেও প্রবেশ করিয়া লুটতরাজ ও হত্যার স্রোত বহাইত। জর্জিয়া ও কাস্পিয়ান তীরবর্তী এলাকার পার্বত্য জাতিসমূহ উত্তর আর্মেনিয়ায় উপদ্রব করিত। পারস্যের খোরাসানে 'মুজহারিট' ও 'হিমায়ার' সম্প্রদায়ের লোকেরা ধর্মীয় কলহ হইতে পরে রাজনৈতিক দ্বন্দ্বে লিপ্ত হইয়া রক্তস্রোতে অবগাহন করিতে থাকে। উত্তর আফ্রিকার খারেজী দল ও বার্বার জাতি গৃহযুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছিল। উহার প্রতিক্রিয়া স্পেন পর্যন্ত প্রসারিত হয় এবং সেখানে অশান্তির দাবানল জ্বলিয়া উঠে। পিরোনীজ পর্বতমালার অপর পার্শ্বস্থ মুসলিম এলাকার গভর্ণর ওসমান ইবনে আবু নেজা, ওরফে মনুজা, পার্শ্ববর্তী একুইটন রাজ্যের ডিউক ইউডিসের সুন্দরী কন্যা ল্যাম্পিজীকে বিবাহ করিয়া খৃষ্টানদের সহিত মৈত্রী স্থাপন করিয়াছিলেন এবং কিছুকাল যাবৎ মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন।

বয়সে তরুণ হইলেও হিসাম এই বিশৃঙ্খল রাজ্যের কর্ণধার হইয়া কঠোর পরিশ্রম করিতে লাগিলেন এবং ক্ষিপ্রহস্তে সকল দিকের বিদ্রোহ দমনে তৎপর

হইলেন। পশ্চিম আফ্রিকা ও স্পেন ছিল সর্বাপেক্ষা দুরবর্তী এবং বিশৃঙ্খল এলাকা। এই দুই দেশে তিনি হানজালা ও আবদুর রহমান ইবনে আবদুল্লাহ আর গাফেকী নামক দুই অভিজ্ঞ সেনাপতিকে গভর্ণর করিয়া পাঠান।

ভূমধ্য সাগরে তাঁহার সেনানিগণ সিসিলির রাজধানী হ্যাইরাকিউস অধিকার করে এবং দক্ষিণ ফ্রান্সে পদক্ষেপ করে। কিন্তু দক্ষিণ ফ্রান্সে মুসলিম অধিকার দৃঢ় হওয়ার পূর্বেই তাহাদিগকে পশ্চিম আফ্রিকায় হানজালার সাহায্যে অগ্রসর হইতে হয় এবং এই ভাবে দক্ষিণ দিক হইতে ফ্রান্স বিজয় স্থগিত হইয়া যায়।

স্পেনে আবদুর রহমান অপূর্ব দক্ষতাগুণে অল্পদিনের মধ্যে শান্তি স্থাপনে সক্ষম হইলেন। অতঃপর আবদুর রহমান বিদ্রোহী গভর্ণর মনুজার দিকে হস্ত প্রসারিত করেন। মনুজা তখন পত্নীসহ এক শৈল শিখরে বিলাস মত্ত ছিলেন। আব্দুর রহমানের সৈন্যগণ অদ্ভুত ক্ষিপ্রতার সহিত এই কপোত-কপোতীকে তাঁহাদের শৈল নিবাসে বেষ্টন করে। মনুজা পলায়ন করেন কিন্তু ধৃত হইয়া পরে নিতহ হয়। সুন্দরী ল্যামপিজ্ঞী বন্দিনী অবস্থায় সসম্মানে দামেস্কে প্রেরিত হইলেন। তথায় হিশামের এক পুত্রের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়।

মনুজার পতনে একুইটেন ও উহার পার্শ্ববর্তী এলাকা সমূহের খৃষ্টানদের ভিতর তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি হয়। তাহারা ডিউক ইউডিসের নেতৃত্বে স্পেন আক্রমণের জন্য সংঘবদ্ধ হইতে থাকে। আবদুর রহমান এই সংবাদ পাইয়া ঐ অঞ্চলের খৃষ্টান-শক্তি সমূহের সহিত যুদ্ধবিগ্রহের জন্য প্রস্তুত হন। ৭৩২ খৃষ্টাব্দে বসন্ত সমাগমে পিরেনীজের তুষার যখন সবেমাত্র গলিতে আরম্ভ করিয়াছে, সেই সময় অপ্রত্যাশিত ভাবে আবদুর রহমান সসৈন্যে উহার পশ্চিম বাহু অতিক্রম করিয়া ফরাসী ভূমিতে অবতীর্ণ হইলেন। রোন নদীর তীরে চল্লিশ হাজার খৃষ্টান সৈন্য তাঁহার গতিরোধ করিয়া দাঁড়াইল। তিনি তাহাদিগকে পরাভূত করিয়া আর্লস শহর অধিকার করেন। ইহার পর তাঁহার হস্তে ফরাসী বোর্দো শহরের পতন ঘটে। বোর্দোর পথে গ্যারোণ নদীর তীরে এক গিরিসঙ্কটে ইউডিসের বিশাল বাহিনী এবার তাঁহার সহিত শক্তি পরীক্ষায়

রত হইয়াছিল। কিন্তু যুদ্ধে ভীষণ ভাবে পরাজিত হইয়া তাহারা উত্তর ফ্রান্সে পলায়ন করে। আব্দুর রহমান ইউডিসের রাজধানী তুলুজ শহর জয় করিয়া সমগ্র একুইটেন অধিকার করিয়া লইলেন। এই যুদ্ধ সম্বন্ধে ইসিডোর নামক জনৈক পাশ্চাত্য ঐতিহাসিক লিখিয়াছেন, কত খৃষ্টান যে এই যুদ্ধে নিহত হইয়াছিল একমাত্র ঈশ্বরই তাহা গণনা করিতে পারেন।

ইহার পর মুসলিমগণ উত্তর–পশ্চিম ফ্রান্সে বার্গাণ্ডি অঞ্চল অধিকার করে এবং লিবোঁ, বেসঙ্কো শহরের উপর তাহাদের বিজয় পতাকা উড্ডীন করে।

রাজ্যভ্রষ্ট উইডিস তখন নিরুপায় হইয়া চার্লস মর্টেল নামক উত্তর ফ্রান্সের এক দুর্ধর্ষ শাসকের শরণাপন্ন হন। তাঁহাদের সমবেত চেষ্টায় সমস্ত উত্তর ফ্রান্সের খৃষ্টানগণ মুসলিমদিগকে বিতাড়িত করার জন্য অস্ত্রসজ্জা করিল। দক্ষিণ জার্মানীর পার্বত্যজাতি সমূহও মর্টেলের পতাকা তলে সমবেত হইল। আব্দুর রহমান যখন প্যারিস আক্রমণের উদ্দেশ্যে লয়ার নদী পার হইবার আয়োজন করিতেছেন, এমন সময় তিনি অপর তীরে অগণিত খৃষ্টান সৈন্যরা কুচ–কাওয়াজের আওয়াজ পাইলেন। রণপণ্ডিত আব্দুর রহমান তখন সসৈন্যে কিঞ্চিৎ পশ্চাদ্বর্তী হইয়া টুর্স ও পাইওটিয়ার্স শহরদ্বয়ের মধ্যবর্তী ক্রেন ও ভিয়েন নদীর সঙ্গমস্থলে ঘুরিয়া দাঁড়াইলেন। খৃষ্টান বাহিনী অবিলম্বে লয়ার পার হইয়া পঙ্গপালের ন্যায় ছুটিয়া আসিল এবং মুসলিম বাহিনীকে আক্রমণ করিল। ক্রমাগত দশদিন যুদ্ধ চলিল। জয় পরাজয় অনিশ্চিত থাকা অবস্থায় দশম দিবসে সেনাপতি আব্দুর রহমান অতর্কিত ভাবে পার্শ্বদেশে বর্শাবিদ্ধ হইয়া ধরাশায়ী হইলেন। মুসলিম বাহিনী বিশৃঙ্খলার ভিতর পরাজয় বরণ করিল। খৃষ্টানগণ পরাজিত ও আহত মুসলিম সৈন্যগণকে নির্মমভাবে হত্যা করিল। এই যুদ্ধ টুর্সের যুদ্ধ নামে অভিহিত। পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকগণ এই যুদ্ধের উপর অত্যাধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। গীবন বলিয়াছেন, এই যুদ্ধে মুসলিমগণ পরাজিত না হইলে হয়ত সমগ্র ফ্রান্স ও ইংল্যাণ্ড তাহাদের

কবলে যাইত এবং অকসফোর্ড ও কেমৃব্রিজের শিক্ষামঞ্চগুলি হইতে বাইবেলের স্থলে কুরআন ও তফসীরের ব্যাখ্যা প্রচারিত হইত। (১)

ইহার পর ফ্রান্সের খৃষ্টানদের সহিত ইটালীর লম্বর্ডি এবং মুসলিম অধিকৃত পিডমন্টের খৃষ্টানগণ সংঘবদ্ধ হইয়া প্রবল প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। ফলে মুসলিমগণ ইহার পর ফ্রান্সে আর বিশেষ সুবিধা করিতে পারে নাই। হিসামের মৃত্যুর পর উত্তর পশ্চিম ফ্রান্সে মুসলিম অধিকার ক্রমে বিলুপ্ত হয়।

হিসামের সময় মুসলিম সাম্রাজ্য সর্বাপেক্ষা বৃহত্তর বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। পশ্চিম আটলান্টিকের তরঙ্গমালা ও বিস্কে উপসাগর, পূর্বে বিশাল সিন্ধুনদ ও মঙ্গোলিয়ার গিরিশ্রেণী, উত্তরে কাস্পিয়ান সাগর ও উরল পর্বত এবং দক্ষিণে আরব সাগর ও মিশরের দক্ষিণ প্রান্ত ছিল উহার সীমানা। এত বৃহৎ এবং অখণ্ড সাম্রাজ্য পৃথিবীর অন্য কোনও জাতি কোনও যুগে স্থাপিত করিতে পারে নাই।

হিসাম অত্যন্ত কর্মঠ ছিলেন। তাঁহারই অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে ইয়াযিদ আমলে ধ্বংসোন্মুখ উমাইয়া সাম্রাজ্য আরও বিশ বৎসর টিকিয়াছিল। তাঁহার কোনও জাঁকজমক বা বিলাসিতা ছিল না। তিনি মদ্যপান করিতেন না।(২) তাহা ছাড়া তিনি রণপণ্ডিত এবং বিদ্বান ছিলেন। তাঁহার মন্ত্রী সলিম বহু ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি গ্রিক ভাষা হইতে কয়েকখানি দার্শনিক গ্রন্থের অনুবাদ করিয়াছিলেন। তৎপুত্র বাজালাও অনেকগুলি ভাষা জানিতেন। তিনি ফরাসী ভাষায় লিখিত কয়েক খণ্ড ইতিহাস–গ্রন্থের আরবীতে অনুবাদ করেন। কিন্তু হিসামের সম্রাট–সুলভ উদারতা ছিল না। তিনি অত্যন্ত সন্দিগ্ধমনা ও অস্থিরচিত্ত ছিলেন। দামেস্কের রাজসভা ছিল তখন ষড়যন্ত্রের একটি বৃহৎ আড্ডা।

---

(১) History of the Saracens by Ameer Ali, P. 142-50. See also The Arabs, by Hitti, P. 70-71.

(২) উমাইয়া সম্রাটদের ভিতর মাত্র তিনব্যক্তি সুরাপায়ী ছিলেন না। তাঁহারা হইলেন ওমর ইবনে আব্দুল আযীয, হিসাম এবং তৃতীয় ইয়াযিদ ইবনে প্রথম ওলিদ।

তাঁহার সভাসদগণের কাহারও উদ্দেশ্য সাধু ছিল না। তাঁহারা রাষ্ট্রের মঙ্গল অপেক্ষা নিজ স্বার্থসিদ্ধ ও সাধনাকেই উর্ধে স্থান দিতেন। ফলে কাহাকেও বিশ্বাস করার উপায় তাঁহার ছিল না। সত্যাসত্য নির্ণয় ও পক্ষপাতিত্বহীন ন্যায়বিচারও তাঁহার দ্বারা অনেক ক্ষেত্রেই সম্ভবপর হইত না। তিনি গুপ্তচরের উপর বেশীরভাগ নির্ভর করিতেন। ফলে অনেক নির্দোষ লোক নিপীড়িত হইত, অনেক যোগ্যকর্মচারীর অপসারণ বা জীবন নাশের কারণ ঘটিত। এইসব কারণে প্রজাপুঞ্জের সহানুভূতি লাভে তিনি ব্যর্থকাম হন। কেবল তরবারির বল ও ত্রাসের সৃষ্টিদ্বারা তাঁহাকে শাসককার্য চালাইতে হইত। আর এই কারণেই তাঁহার সময় ইমাম-বংশের উপর অবিচার ও অত্যাচার শুরু হয়। ইমাম যায়েদের হত্যা এবং তৎপুত্র কিশোর ইয়াহিয়ার প্রাণদণ্ড হিসাম-রাজত্বের শুধু অনপনেয় কলঙ্ক নহে, উমাইয়াদের পতনেরও উহা একটি প্রত্যক্ষ কারণ। তাঁহার পক্ষপাতিত্বের ফলেই বিপ্লবীদের গোপন ষড়যন্ত্র এবং আব্বাসীয় বংশের বিদ্রোহমূলক প্রচারণা রুদ্ধ না হইয়া বরং অধিকতর বিস্তৃতি লাভ করে। সে কাহিনী আমরা পরবর্তী অধ্যায়ে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিব।

হিসাম লোকান্তরিত হইবার পর উমাইয়া বংশের রাজত্ব আর মাত্র সাত বৎসর টিকিয়া ছিল। প্রথম বৎসর একে একে তিনজন খলিফার উত্থান ও পতন ঘটে। পরবর্তী সনে চতুর্থ ব্যক্তি মারোয়ান সিংহাসন লাভ করেন। তিনি ছয় বৎসর রাজত্ব করেন। তারপর উমাইয়া রাজত্বের অবসান ঘটে।

খলিফা দ্বিতীয় ওলিদ (৭৪৩–৪৪ খৃঃ)

পিতৃব্য হিসাম দীর্ঘ কুড়ি বৎসর কাল সিংহাসন জুড়িয়া থাকায় সিংহাসনের পরবর্তী উত্তরাধিকারী দ্বিতীয় ওলিদ ইবনে দ্বিতীয় ইয়াযিদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটিয়াছিল। সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই তিনি হিসামের পরিবারবর্গকে প্রসাদ হইতে বাহির করিয়া দেন। তিনি এমনই উদ্ধত, বিলাস পরায়ণ ও অত্যাচারী ছিলেন যে, এক বৎসর অতীত না হইতেই প্রজাগণ অতিষ্ঠ হইয়া তাঁহার প্রাসাদের ভিতর প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে খুন করে (৭৪৪ খৃঃ)।

খলিফা তৃতীয় ইয়াযিদ (৭৪৩ খৃঃ) ও ইব্রাহীম (৭৪৩)

অতঃপর প্রথম ওলিদের ধার্মিক পুত্র তৃতীয় ইয়াযিদ সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু মাত্র পাঁচ মাস রাজত্বের পর শত্রুদের ষড়যন্ত্রের ফলে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। ইনি ন্যায় পরায়ণ ছিলেন এবং মদ্যপান করিতেন না। ইহার পর সিংহাসন লইয়া ভীষণ গণ্ডগোল চলিতে থাকে এবং কতক লোকের সমর্থনে মৃত খলিফার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ইব্রাহীম সিংহাসনে বসেন। কিন্তু আর্মেনিয়ার গভর্ণর দ্বিতীয় মারোয়ান তাঁহাকে খলিফা বলিয়া স্বীকার করিলেন না, পরন্তু দামেস্কের বিরুদ্ধে অভিযান করিলেন।

খলিফা দ্বিতীয় মারোয়ান (৭৪৪–৫০ খৃঃ)

রাজ্যের অবস্থা তখন অত্যন্ত শোচনীয়।খলিফাদের অকর্মন্যতা ও আত্মকলহের দরুন সাম্রাজ্যের ভিতর অরাজকতার সৃষ্টি হইয়াছিল। তাই উমাইয়া সাম্রাজ্যের মঙ্গলাকাঙ্খী আমীর ওমরাহগণ একজন শক্তিশালী শাসকের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিতেছিলেন। খলিফা আব্দুল মালিকের ভ্রাতুষ্পুত্র দ্বিতীয় মারোয়ান ইবনে মুহম্মদ ছিলেন একজন কর্মঠ বীর পুরুষ। জীবনে তিনি বহু যুদ্ধে নেতৃত্ব করিয়াছেন এবং শাসক হিসাবেও তাঁহার দৃঢ়তা ও দক্ষতার পরিচয় মিলিয়াছিল প্রচুর। তাই ওমরাহগণ তাঁহার বিদ্রোহ ও দামেস্ক অভিযান শুধু ক্ষমার চক্ষে দেখেন নাই, তাঁহার সিংহাসন–দাবীর প্রতি সমর্থনও জোগাইয়াছিলেন। বিশাল দামেস্ক সাম্রাজ্যের ইনিই সর্বশেষ সম্রাট। পরবর্তী অধ্যায়ে ইহার কথা পুনরায় আলোচিত হইবে।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

উমাইয়াদের আমলে ইমামবংশের অবস্থা

আবার ইমাম হত্যা ওরফে দ্বিতীয় কারবালা

ইমাম হুসায়েনের একমাত্র বংশধর ইমাম যয়নুল আবেদীন ওরফে দ্বিতীয় আলী রাজনীতির সংশ্রব বর্জন করিয়া ফকীরী গ্রহণ করেন, একথা পূর্বে বলিয়াছি। খলিফা ওলিদের রাজত্বকালে, ৭১২ খৃষ্টাব্দে তিনি মদীনায় দেহত্যাগ করিলে তৎপুত্র মুহাম্মদ আল বাকের তাঁহার স্থলে গদী-নেশীন ইমাম হন। প্রথম ইমাম হযরত আলী রাঃ-এর সময় হইতে ইমাম বংশে এই নিয়ম চলিয়া আসিতেছিল যে, প্রত্যেক গদী-নেশীন ইমাম তাঁহার নিরঙ্কুশ ইচ্ছা অনুযায়ী তাঁহার পুত্র অথবা দূরবর্তী সন্তানদের ভিতর হইতে কাহাকেও তাঁহার ইমামতীর উত্তরাধীকারী নির্বাচন করিয়া যান। এক্ষেত্রেও ইমাম মুহম্মদ তাঁহার পিতা কর্তৃক নির্বাচিত হইয়াছিলেন। তিনি অসাধারণ বিদ্বান ছিলেন বলিয়া লোকে তাহাকে "আল বাকের" বলিত।

৭৩২ খৃষ্টাব্দে মুহম্মদ আল বাকের পরলোক গমন করেন। তৎপর তঁহার সুযোগ্য পুত্র যাফর আস্ সাদিক ইমামতী লাভ করেন। এই ভাবে ইমাম বংশের সর্ব প্রধান ব্যক্তি গদী-নেশীন থাকিতেন, কিন্তু উক্ত বংশের অন্যান্য সন্তানগণও অলসভাবে বসিয়া থাকিতেন না। তাঁহারা ইসলামী শিক্ষা ও কুরআন হাদীস প্রচারের জন্য দিকে দিকে বাহির হইয়া পড়িতেন। ইঁহাদের একজন ছিলেন ইমাম যায়েদ। ইনি যয়নুল আবেদীনের পৌত্র ছিলেন। ইনি কুফায় তাঁহার আস্তানা স্থাপন করেন। কুফা শুধু ইরাকের রাজধানী ছিল না, সমগ্র পূর্ব আরবে উহার বৃহত্তর বাণিজ্য কেন্দ্র ছিল। এইখানে বসিয়া ইরাকের লোকদিগকে তিনি হেদায়েত করিতেন।

ইমাম যায়েদের হত্যা

মুসলিম জাহানে এই সময় কুরআন, হাদীস ও শরীয়তী শিক্ষা প্রচারের বিশেষ প্রয়োজন দেখা দিয়াছিল। কারণ শাসক সম্প্রদায় নিজেরা ছিলেন বিলাসিতায় মগ্ন। তার ফলে দেশে অরাজকতা ও দুর্নীতির স্রোত প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। মানুষ ধর্মীয় শিক্ষা ভুলিয়া যাইতেছিল। কুরআন-হাদীসের সুস্পষ্ট নির্দেশও তাহারা নির্ভয়ে এড়াইয়া চলিত। আলিমদের নির্দেশ কার্যকরী করার মত উপযুক্ত সরকারী ব্যবস্থা না থাকায় সমাজে আলিমগণ উপেক্ষার পাত্র হইয়াছিলেন। এমত অবস্থায় নবীর আওলাদগণ কি করিয়া ঘরে বসিয়া থাকেন? তাঁহারা লুপ্তপ্রায় ইসলামকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। আর একাজে তাঁহাদের চাইতে উপযুক্তই বা আর কে ছিলেন? একে নবীর আওলাদ হিসাবে জনগণের সমক্ষে তাঁহাদের মর্যাদা ছিল অত্যধিক, তার উপর কুরআন, হাদীস ও শরীয়ৎ সম্পর্কে তাঁহাদের জ্ঞান ছিল বংশানুক্রমিক ও সংশয়াতীত। সর্বোপর, তাঁহাদের নির্মল চরিত্র, উদার ও অমায়িক ব্যবহার এবং নবীবংশের বৈশিষ্ট্যবাহী ব্যক্তিত্ব, জনসাধারণের সমক্ষে ছিল বিরাট আকর্ষণ। ফলে ইমাম যায়েদ কুফা হইতে বসরা পর্যন্ত প্রচারকার্যে অসাধারণ সাফল্য অর্জন করেন। ইরাকে তাঁহার শিষ্যের সংখ্যা দাঁড়ায় লক্ষাধিক। কুফার শাসনকর্তা খালেদ তাঁহার চারিত্রিক মাধুর্যে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে অশেষ শ্রদ্ধা করিতেন এবং জটিল ধর্মীয় সমস্যায় তাঁহার উপদেশ লইয়া চলিতেন। মদীনার হাশেমী গোত্রের বহু লোক ব্যবসার উপলক্ষে বসরায় বসবাস করিত। ইমাম যায়েদের জ্ঞাতি হিসাবে এই ব্যবসায়ীকে খালেদ যথেষ্ট খাতির করিতেন। কিন্তু ইহাই খালেদের পতনের কারণ হইয়াছিল। কারণ, উমাইয়া গোত্রের লোকেরা ইহা পছন্দ করিত না। তাহারা খলিফা হিশামের নিকট তাহার বিরুদ্ধে গোপনে কুৎসা করিত।

তাহারা এমন কথাও রটনা করে যে, গভর্ণর খালেদ রাজকোষের অর্থ দ্বারা ইমাম যায়েদকে পোষণ করেন। ফলে হাশিমের মন খালেদের বিরুদ্ধে বিষাক্ত হইয়া উঠে। তিনি খালেদের কোনও কৈফিয়ৎ না-লইয়াই সরাসরি তাঁহাকে পদচ্যুত করিলেন এবং তাঁহার স্থলে ইউসুফ নামক নিজের এক অনুগত ব্যক্তিকে কুফার গভর্ণর করিয়া পাঠাইলেন। এই ইউসুফ ছিলেন খালেদের পরম শত্রু। ইনি শাসন ভার পাইয়াই খালেদের উপর এবং হাশেমী গোত্রের প্রবাসী ব্যবসায়ীদের উপর অত্যাচার শুরু করিলেন। কিন্তু হাশেমীদের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন ইমাম যায়েদ। ইউসুফ তাঁহার অসাধারণ প্রতিপত্তি দর্শনে শঙ্কিত হইয়া তাঁহাকে ইরাক ত্যাগ করিতে অনুরোধ জানাইলেন। ইমাম কিছুকালের জন্যসময় চাহিয়া পাঠাইলেন। প্রার্থিত সময় অতীত হইলে ইউসুফ পুনরায় তাহাকে তাগিত দিতে লাগিলেন এবং জানইয়া দিলেন যে, রাষ্ট্রের নিরাপত্তার জন্য তাঁহার স্থানান্তর গমন একান্ত আবশ্যক। খলিফা হিশাম যুদ্ধ বিগ্রহ ও বৈদেশিক রাষ্ট্রনীতি লইয়া এত বিব্রত থাকিতেন যে, এই সমস্ত আভ্যন্তরীণ গণ্ডগোলের কোনই খবর রাখিতেন না। যাহা কিছু খবর তিনি পাইতেন তাহাও ছিল একতরফা অর্থাৎ উমাইয়াদের তরফ হইতে প্রাপ্ত এবং স্বভাবতই অতিরঞ্জিত। কাজেই প্রকৃত অবস্থা অবহিত হওয়া তাঁহার পক্ষে সহজ ছিল না। ফলে সময়মত প্রতিকার অভাবে পরিস্থিতি ক্রমশঃ গুরুতর আকার ধারণ করিল।

ইউসুফের হুকুমে ইমাম মদীনায় যাইতে প্রস্তুত হইলেন। কিন্তু অসংখ্য শিষ্য তাঁহাকে বাধা দিল। তাহারা নিবেদন করিল যে, আমারা একলক্ষ লোক আপনার অঙ্গুলি হেলনে জীবন দান করিতে প্রস্তুত আছি। আপনি কি জন্য নির্বাসনে যাইবেন? আমরা তরবারির দ্বারা হাকীম ইউসুফকে জবাব দিতেছি। ইমাম যায়েদ কহিলেন, বৎসগণ, আমি সিংহাসন বা শাসন ক্ষমতার জন্য লালায়িত নহি। আমি নির্জনে খোদাতা'লার উপাসনা করিতে চাই। আমা কর্তৃক রাজ্যের মুসলমানদের উপর কোন বিপদ আসিয়া পড়ে, ইহা আমি ইচ্ছা করি না। আর মদীনা আমার পৈতৃক বাসভুমি। উহা নির্বাসন নহে। হাকীম যখন আমার এখানে থাকা সঙ্গত বোধ করেন না, তখন আমার এখানে থাকা আর কোন ক্রমেই উচিত নহে। এই বলিয়া তিনি যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইলেন।

কিন্তু শিষ্যগণ কিছুতেই তাঁহাকে যাইতে দিল না। তাহারা তাঁহাকে সকল প্রকারে অভয় দিল এবং পনরো হাজার লোক তাঁহার অধীনে স্বীকার করিয়া বলিলঃ আমরা আপনার জন্য জীবন উৎসর্গ করিলাম। বহু সম্রাট ও সাম্রাজ্য আমরা উল্টাইয়া দিয়াছি। আমরা কুফার হাকীমের ভয়ে আপনাকে এস্থান ত্যাগ করিতে দিব না। তখন হযরত যায়েদ কহিলেন, তবে আমি এমন স্থানে যাইব যেখান হাকীম ইউসুফের কোনও আশঙ্কার কারণ না থাকে। তিনি যখন আমার উপর রাজোচিত হুকুম প্রচার না করিয়া মিনতি জানাইয়াছেন, তখন তাঁহার অনুরোধ উপেক্ষা করিতে আমি পারিব না। তদনুসারে তিনি ইরাক পরিত্যাগ করিয়া সারেম উপত্যকায় গিয়া মু'আবিয়া বিন যায়েদ বিন হারিস–এর মুসাফির খানাতে আশ্রয় লইলেন। সেখানে তিনি এক বৎসর কাল অতিবাহিত করিলেন। ইতোমধ্যে বসরার হাশেমীদের উপর অত্যাচার চলিতেই লাগিল। ইউসুফ তাঁহার পূববর্তী গভর্ণর খালেদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করিলেন যে, তিনি বিপুল পরিমাণ সরকারী অর্থ ইমাম যায়েদকে নযরানা দিয়াছেন। এই অযুহাতে ইউসুফ খালেদের অনুগৃহীত সকলের উপরই লাঞ্ছনা চালাইতে লাগিলেন। নির্দোষ প্রজাদের উপর অত্যাচার নিবারণের জন্য ইমাম যায়েদ অগত্যা খলিফা হিশামের দরবারে উপনীত হইলেন এবং পতিকার প্রার্থনা করিরেন। কিন্তু খলিফা পূর্ব হইতেই বিরুক্ত ছিলেন। ইমামের কথায় কর্ণপাত করিলেন না, অধিকন্তু তাঁহাকে ভিখারীর ন্যায় তাচ্ছিল্যের সহিত দরবার হইতে তাড়াইয়া দিলেন। ইহাতে ইমাম অত্যন্ত মনঃক্ষুন্ন হইয়া কুফায় প্রত্যাবর্তন করিলেন এবং নিজ শিষ্যবর্গের নিকট সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিলেন। গুরুর অবমাননা শিষ্যদের প্রাণে লাগিল। তাহারা ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া বিদ্রোহ ঘোষণা করিল।

অতঃপর এমন একটি দুর্ঘটনা ঘটিল যাহা ইমামের ভাগ্য আরও মন্দ করিয়া দিল। ইউসুফের শাসনাধীন মসৌলবাসিগণের নামে কে বা কাহারা এক কাসেদ প্রেরণ করিয়াছিল। কাসেদের যষ্টির ভিতর মসৌলবাসীদের নামে

এক উস্কানী মুলক পত্র লেখা ছিল। তাহাতে ইমাম যায়েদের নামাঙ্কিত সলিমোহরও যুক্ত ছিল। উহাতে মসৌলবাসিগণকে ইমাম যায়েদের অবশম্ভাবী বিজয় ও তৎপ্রতি আল্লা'র বিশেষ রহমতের কথা বলা ছিল। এই কাসেদ মসৌল এলাকায় প্রবেশ করিলে গুপ্ত চর কর্তৃক ধৃত হয় এবং হাকীম ইউসুফের নিকট নীত হয়। ইউসুফ উক্ত পত্র পাঠ করিয়া দুতের প্রাণবধের আদেশ দেন এবং হযরত যায়েদের উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন। তিনি তৎক্ষণাৎ একদল সৈন্য প্রেরণ করেন। ইহারা যায়েদকে আক্রমণ করিল। হযরত যায়েদ শিষ্যগণকে কহিলেন, তোমাদেরই হঠকারিতার জন্য এই বিপদ আসিয়া জুটিল। এখন তোমরা কি করিতে চাও? তখন আঠারো হাজার শিষ্য সমবেত হইয়া হযরত যায়েদের পতাকা লইয়া যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হইল। কিন্তু যখন যুদ্ধ আরম্ভ হইল তখন মাত্র দুই হাজার লোক দেখা গেল। হযরত যায়েদ কহিলেন, অবশিষ্ট লোক কোথায় গেল? যে পনরো হাজার লোক পূর্বেআমার নিকট বায়াৎ হইয়াছিল তাহারাই বা কোথায়? লোকেরা বলিল, তাহারা হাকীম ইউসুফ কর্তৃক মসজিদের ভিতর বন্দী রহিয়াছে। হযরত যায়েদ এই সামান্য সৈন্য লইয়াই যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন এবং রণ নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন।একটি তীর তাঁহার ললাটে আসিয়া বিদ্ধ হওয়ায় তিনি ভূপতিত হন। তাঁহার মৃত্যুর পর বিদ্রোহীদের উপর সাধারণ-হত্যার এক ভয়াবহ অনুষ্ঠান চলিল। শিয়ারা হযরত যায়েদের মৃতদেহ কোনও এক গোপন স্থানে সমাধিস্থ করিয়াছিল। কিন্তু উমাইয়া কুকুরেরা সেই নিভৃত কবরও খুঁজিয়া বাহির করিল এবং কবর হইতে লাশ উঠাইয়া উহার দেহ হইতে মস্তক বিচ্ছিন্ন করিল। তৎপর সেই মৃতদেহ তাহারা শুলে চড়াইয়া দিল। তাহারা এখানেই ক্ষান্ত হইল না। কয়েকদিন পর দেহটি শুল হইতে নামাইয়া আগুনে ভষ্মীভূত করিল এবং ভষ্মরাশি ফোরাতের স্রোতে ভাসাইয়া দিল। তদীয় অনুচরদের মৃতদেহ নানাভাবে নির্যাতীত হইল (হিজরী ১২৪ সন, ৭৪২ খৃঃ)।

ইমাম ইয়াহিয়ার মৃত্যুদণ্ড

ইরাকীদের গুরভাক্তি বহুবার আলীবংশকে পথে বসাইয়াছে, এবারও তাহাই করিল। ইমাম যায়েদ তাহাদের প্ররোচনায় আস্থা স্থাপন করিয়া শহীদ হইলেন। রাজদ্রোহী হিসাবে তাঁহার অস্তিত্বের চিহ্নমাত্র উমাইয়াগণ দুনিয়ায় রাখিল না। তাঁহার দেহাবশেষ ভস্মরাশি পর্যন্ত তাহারা ফোরাতের স্রোতে ভাসাইয়া দিল। এই বর্বরাতা ইরাকের ন্যায়বুদ্ধি ও ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি মাত্রকেই ব্যথিত করিয়াছিল। কিন্তু কাহারও কিছু করিবার সাধ্য ছিল না। তাহাদের উপদেশে ইমামের সতেরো বৎসর বয়স্ক কিশোর পুত্র ইয়াহিয়া প্রাণরক্ষার্থ সুদুর খোরাসানে পলাইয়া গেলেন, যাহাতে ইরাকের শাসকদের নির্মম হস্ত তাঁহার নিকট পর্যন্ত পৌছিতে না পারে। কিন্তু সেখানে গিয়াও ইয়াহিয়া নিষ্কৃতি পাইলেন না। খোরাসানের শাসনকর্তা নসর বিন সাইয়ারকে ইউসুফ পত্র লিখিলেন, ইয়াহিয়াকে ধৃত ও বন্দী করিতে। তথাকার উমাইয়া কর্মচারীগণ তাঁহার অনুসন্ধান করিতে লাগিল এবং ব্যাধের ন্যায় তাঁহাকে এক স্থান হইতে অন্যস্থানে তাড়াইয়া ফিরিতে লাগিল। বিপন্ন ইয়াহিয়া লোকালয় ছাড়িয়া বন জঙ্গলের আশ্রয় লইলেন। বনে বনে ঘুরিয়া বনের ফলমুল খাইয়া নিরাশ্রয় যুবক জীবন ধারণ করিতে লাগিলেন। আহার-কষ্ট ও অনিদ্রায় তাঁহার সোনার বরণ মলিন হইয়া গেল। মাথার দীর্ঘ কেশ জট পাকাইয়া গেল। তিনি এ অবস্থায় আর বেশী দিন বনবাসে থাকিতে পারিলেন না। মুসাফির হালে ঘুরিতে ঘুরিতে আবু কাফ্‌জে নামক এক ব্যক্তির সরাইখাণায় আসিয়া আশ্রয় লইলেন। উমাইয়াগণ প্রতি গ্রামে, প্রতি সরাইখানায় তাঁহার জন্য অনুসন্ধান চালাইতেছিল। গুপ্তচরেরা আবু কাফজের সরাইতে ইয়াহিয়ার সন্ধান লইল। একদিন হঠাৎ আসিমা নামক এক সরকার পক্ষীয় কর্মচারী আসিয়া সরাইখানায় উপনীত হইলেন এবং সকল মুসাফিরকে একে একে সরাইয়ের

বাহিরে আসিতে বলিলেন। কাহার জন্য এই আয়োজন কেহ তাহা বুঝিতে পারিল না। লোকেরা একে একে দরজা দিয়া বাহির হইয়া আসিল। সর্বশেষে নির্গত হইলেন এক হরিদ্রা বর্ণের তরুণ যুবক। দারুণ মনোকষ্টে তাঁহার মুখমণ্ডল শুষ্ক ও চোখের দৃষ্টি উদাস হইয়াছিল। শরীরে পশমী মোটা বস্ত্র, মাথায় পশমী টুপী, স্কন্ধে ঘোড়ার চার্জামা (জিনের নীচের চাদর)। এ সমস্তই সুফী ফকীরদের লেবাস। কিন্তু তাঁহার আভিজাত-সুলভ মুখাকৃতির সহিত স্থানীয় কাহারও চেহারার মিল ছিল না। আসিয়া দেখিয়াই তাঁহাকে চিনিয়া ফেলিলেন। তাঁহার ম্লান মুখ ও পোশাকের হাল দেখিয়া আসিমারও চোখে পানি আসিল। তিনি মনে মনে বলিলেন,হায়! পয়গম্বরের নিষ্পাপ বংশধরের এই অবস্থা। তিনি যখন বুঝিলেন, সরাইয়ের সকলেই ইহাকে অপরিচিত মনে করিতেছে, তখন তিনি গোপনে ইয়াহিয়াকে বলিলেন, ওহে চার্জামাওয়ালা বিদেশী মুসাফির, তুমি এই মুহূর্তে এস্থান ত্যাগ কর। নিশ্চয় জানিও এ সরাই তোমার বধ্যভুমি রূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে। ইয়াহিয়া তাঁহাকে অশেষ শোকরিয়া জানাইয় দ্রুত অশ্বারোহণে সেস্থান ত্যাগ করিলেন। যাহারা এ দৃশ্য দেখিল তাহারা বিস্ময়ে হতবুদ্ধির হইয়া রহিল।

খোরাসান প্রদেশ পারস্যের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে। ইয়াহিয়া অনির্দিষ্ট ভাবে সেইদিকে চলিতে লাগিলেন। কিন্তু সেখানেও সাইয়ারের গুপ্তচরেরা তাঁহার খোঁজ করিতেছিল। অগত্যা তিনি পূর্ব সীমান্তে অবস্থিত বলখের দিকে অশ্ব ছুটাইলেন। কিন্তু উমাইয়াদের হিংসাবৃত্তি ছিল পৈশাচিক। বলখের হাকীম আকিলের নিকট পূর্বেই ইয়াহিয়ার সম্বন্ধে গোপনীয় আদেশ পৌঁছিয়াছিল। তিনি ইয়াহিয়ার অনুসন্ধানে গুপ্তচর নিয়োজিত করিয়াছিলেন। এতদূরেও যে তাঁহার জন্য ব্যাধের জাল পাতা রহিয়াছে সংসার অনভিজ্ঞ যুবক তাহা ধারণা করিতে পারেন নাই। তিনি সহজেই ধরা পড়িলেন। আকিল তাঁহাকে কারাগারে নিক্ষেপ করিয়া পত্র দ্বারা ইউসুফকে এই সুসংবদ জ্ঞাপন করিলেন। ইউসুফ ইমাম যায়েদের মৃত্যু ঘটাইয়া ছিলেন বলিয়া সমস্ত ইরাক-আযম তাঁহার বৈরী হইয়াছিল। এক্ষণে ইয়াহিয়াকে কি দণ্ড দেওয়া উচিৎ সে সম্বন্ধে খলিফার

নির্দেশ লওয়া তিনি আবশ্যক মনে করিলেন। খলিফা হিশাম তখন মৃত্যু শয্যায় শায়িত। তিনি ইয়াহিয়ার ধৃত হওয়ার সংবাদ শুনিয়া হয়ত তৃপ্তি নিশ্বাস ফেলিয়াছিলেন কিন্তু কোনও নির্দেশ দিয়া যাইতে পারেন নাই। তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র দ্বিতীয় ওলীদ ইবনে দ্বিতীয় ইয়াযিদ সিংহাসনে আরোহণ করিলেন (৭৪৩ খৃঃ)। ইনি ছিলেন হিশামের পরম শত্রু। হিশামের আসামী ইয়াহিয়াকে তিনি শুধু মুক্তি দিলেন না, আকিলকে লিখিয়া পাঠাইলেন, ইয়াহিয়াকে খালাস করিয়া সসম্মানে ইরাকে প্রেরণ করিতে। হুকুম আসিতে বেশ সময় লাগিল, কারণ সাম্রাজ্য তখন এক হাত হইতে অন্য হাতে চলিয়া গিয়াছিল। নুতন খলিফার হুকুম দেখিয়া আকিলের মাথা হেট হইল। তিনি নিজকে অপমানিত বোধ করিলেন। কিন্তু খলিফার হুকুম না মানিয়াও উপায় ছিল না। তাই দীর্ঘকাল পরে তিনি বন্দী ইয়াহিয়াকে অগত্যা ছাড়িয়া দিলেন, কিন্তু তাঁহার ইরাকে গমনের কোনও নিরাপদ ব্যবস্থা করিয়া দিলেন না।

ইরাকে যাইতে ইয়াহিয়া নিশাপুরের পথ ধরিয়া চলিলেন। নিশাপুরে উপনীত হইলে গুপ্তচরেরা তত্রতা হাকীম ওমর বিন জিবারাকে তাঁহার আগমন সংবাদ অবগত করাইল। ওমর মনে করিলেন, ইয়াহিয়া নিশ্চয়ই বলখের কারাগার হইতে পলায়ন করিয়াছে। এই সন্দেহ তিনি তৎক্ষণাৎ ইয়াহিয়াকে বন্দী করার জন্য একদল সৈন্য প্রেরণ করিলেন। ইয়াহিয়া ওমরের কর্মচারীগণকে অনেক প্রকার বুঝাইলেন যে, তিনি খলিফার আদেশে মুক্ত হইয়া ইরাকে চলিয়াছেন; কিন্তু ওমর তাহার একবর্ণও বিশ্বস করিলেন না। ইয়াহিয়া ওমরকে বলিয়া পাঠাইলেন যে, খলিফার নিকট পত্র লিখিয়া তাঁহার কথার সত্যতা পরীক্ষা করা হউক এবং সে পর্যন্ত তিনি নিশাপুরে অবস্থান করিতে প্রস্তুত আছেন। ওমর দেখিলেন এ সব বিলম্বের ব্যাপার। ইত্যবসরে ইয়াহিয়ার সমর্থকেরা, বিশেষতঃ স্থানীয় শিয়ারা তাঁহার পক্ষাবলম্বন করিয়া বিদ্রোহ ঘটাইতে পারে। তিনি কালবিলম্ব না করিয়া হুকুম দিলেন, ইয়াহিয়াকে ধৃত ও বন্দী করার পূর্ব আদেশ কার্যকরী করিতে। ওমরের এই

আচরণ ইয়াহিয়ার আত্মসম্মানের মূলে আঘাত করিল। খলিফার আদেশে মুক্তি পাইয়া এখন একজন আঞ্চলিক হাকীমের দ্বারা এই ভাবে লাঞ্ছিত হওয়া তিনি অত্যন্ত অপমানজনক মনে করিলেন। দীর্ঘকালের নির্যাতনের ফলে তাঁহার ধৈর্য টুটিয়া গিয়াছিল। তিনি স্থির করিলেন, ধরা তিনি দিবেন না কিছুতেই; বন্দীত্বও স্বীকার করিবেন না; তার চাইতে বরং প্রাণ বিসর্জন দিবেন। অতঃপর যখন ওমরের সৈন্যেরা তাঁহাকে ঘিরিয়া ফেলিল তিনি উলঙ্গ তরবারি হস্তে তাহাদের সম্মুখীন হইলেন এবং অসীম সাহসে লড়িতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ যুদ্ধ হইল, তারপর সব শেষ! ইয়াহিয়া ও তাঁহার সঙ্গী অনুচরটি শহীদ হইলেন। (১২৫ হিঃ ৭৪৩ খৃ)। ওমর মহা গর্বের সহিত ইয়াহিয়ার মস্তক কাটাইয়া দামেস্কে প্রেরণ করিলেন এবং মুণ্ডহীন দেহ গুর্গণের প্রকাশ্য ময়দানে ফাঁসিকাষ্ঠে লটকাইয়া দিলেন। কথিত আছে, দীর্ঘকাল সেই দেহ সেই খানেই লটকান ছিল। উমাইয়াদের ভয়ে উহা স্পর্শ করে নাই, নামাইয়া দাফনও করে নাই। পথিকেরা ঐ পথ দিয়া চলিতে গিয়া অঙ্গুলী তুলিয়া সজল চক্ষে দেখাতি,–এই সেই নবীবংশের মাসুম বাচ্চা, আমাদের নয়া ইমাম।

কুক্ষণে উমাইয়ারা এই ফাঁসি-কাষ্ঠ গড়িয়াছিল গুর্গনের মাঠে। কে জানিত এই ফাঁসি-কাষ্ঠ হইতে ইয়াহিয়ার মুণ্ডহীন কবন্ধ তর্জনী তুলিয়া উদ্ধত উমাইয়াদের মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করিবে। এই ফাঁসি-কাষ্ঠের নীচে দাঁড়াইয়া ইরানের বিখ্যাত বিপ্লবী নেতা আবু মুসলিম জ্বালাময়ী বক্তৃতায় তাঁহার দেশবাসিগণকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন, উমাইয়া-শক্তি ধ্বংসের জন্য অস্ত্র ধারণ করিতে। ইরানের যুবকেরা হাজারে হাজারে আসিয়া এই স্থানের পবিত্র ধুলি স্পর্শ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, অত্যাচারী উমাইয়াদের তাড়াইয়া দিয়া ইমামবংশের তাহারা পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিবে।

আবু মুসলিমের উত্থান

এই সময় পারস্য দেশে বিপ্লবী নেতা আবু মুসলিমের আকস্মিক অভ্যুত্থান এক বিস্ময়কর ঘটনা। আবু মুসলিম ছিলেন একজন ইস্পাহানী আরব। তাঁহার পূর্ব পুরুষেরা জাতিতে আরব হইলেও তিনি পারস্য বাসীদের স্বজাতি হইয়া পড়েন এবং তাহাদিগকে পরাধীনতার শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করার জন্য যৌবন বয়সেই সঙ্কল্প গ্রহণ করেন। আরব আযমে কৌলিন্য লইয়া বরাবর ঝগড়া ছিল। আরবেরা সর্বদাই কৌলিণ্যের গর্ব করিত এবং পারসিকদিগকে বিজিত জাতি বলিয়া হেকারত করিত। অতি পুরাতন ঐতিহ্যের অধিকারী পারসিকেরা ইহাতে মর্মাহত হইত। উমাইয়া কর্মচারীদের দাম্ভিকতাও জনসাধারণের মন তিক্ত করিয়া তুলিত। আবু মুসলিম এই সকলের প্রতিকারের জন্য যৌবনকাল হইতেই উমাইয়াদের বিরুদ্ধে প্রচারণা চালাইতে থাকেন। তাঁহার চরিত্রে আরবীর দৃঢ়তা ও পারসিক কমনীয়তার মধুর সমাবেশ হইয়াছিল। তিনি যেমন সুবক্তা ছিলেন, তাঁহার ব্যবহারও ছিল তেমনি মধুর। যে তাঁহার সংশ্রবে আসিত সেই মুগ্ধ হইত। বক্তৃতায় তিনি পরম শত্রুকেও বশ করিতে পারিতেন। তাঁহার সংগঠনী শক্তিও ছিল আশ্চর্য রকমের। তাঁহার নেতৃত্ব-সুলভ গুণরাশি ও বক্তৃতার খ্যাতি ক্রমে পারস্যের সীমা ছাড়াইয়া ইরাক ও সিরিয়ায় ছড়াইয়া পড়ে।

এই সময় মদীনার আব্বাসীয় বংশের যুবকেরা উমাইয়াদের উৎখাত করার জন্য গোপনে চেষ্টা করিতেছিলেন। পারস্যের বিপ্লবী নেতা আবু মুসলিমের অসাধারণ গুণাবলীর কথা আব্বাসীয় নেতা মুহম্মদের কর্ণগোচর হয়। তিনি তাঁহার সুখ্যাতিতে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে খোরাসান এলাকার জন্য নিজেদের প্রচার কার্যে নিয়োজিত করেন এবং আব্বাসীয় বংশের ভবিষ্যৎ মঙ্গলামঙ্গল সম্পূর্ণরূপে তাঁহার হস্তে ন্যস্ত করিয়া নিশ্চিন্ত হন। আবু মুসলিম ও যতদিন বাঁচিয়া ছিলেন, কায়মনোবাক্যে আব্বাসীয়দের এই বিশ্বাসের মর্যাদা রক্ষা করিয়া চলিয়াছেন।

আবু মুসলিম আসলে চাকুরীর প্রত্যাশী ছিলেন না। কিন্তু তিনি বুঝিয়াছিলেন, জাতিকে সঙ্ঘবদ্ধ করিতে এবং প্রবল উমাইয় শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত করিতে হইলে বিপুল অর্থের প্রয়োজন। আব্বাসীয়দের অর্থ ছিল, জনবলও ছিল। বিশেষতঃ তাঁহাদের প্রকাশ্য দাবী ছিল "আহলে বায়েত" অর্থাৎ নবীবংশকে মর্যাদায় পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করা, –যাহা সাধারণ মুসলমানের দৃষ্টিতে বিশেষ করিয়া শিয়াদের নিকট ছিল দুনিয়ার সর্বাপেক্ষা বড় কামনার ধন। আবু মুসলিম খোরাসানে প্রথমতঃ গোপনে প্রচারকার্য চালাইতে থাকেন। তিনি তাহাতে দেশবাসীর অকুণ্ঠ সমর্থন পাইতে লাগিলেন। তথাকার হিজাযী ও ইয়েমেনী ব্যবসায়ীরাও আবু মুসলিমের প্রচারিত মহৎ উদ্দেশ্য শুনিয়া খুশী হইল এবং লোক ও অর্থ দ্বারা তাঁহার সাহায্য করিতে অগ্রসর হইল।

এই আসন্ন বিপ্লবের মুখে ইমাম যায়েদ ও তদীয় কিশোর পুত্র ইয়াহিয়ার নিধন ধুমায়িত বহ্নির উপর ইন্ধন নিক্ষেপ করিল। ইতোমধ্যেই মানুষের ধৈর্য সহ্যের সীমা ছাড়াইয়া গিয়াছিল। এবার বিস্ফোরণ ঘটিল।

খলিফা হিশামের রাজত্বের শেষের দিকে ইমাম যায়েদ নিহত হইয়াছিলেন, ইহা পুর্বে বলিয়াছি। বর্বর উমাইয়াগণ যে ভাবে কবর হইতে তাঁহার দেহ উত্তোলন করিয়া উহার উপর অমানুষিক অত্যাচার করে, সমগ্র আরব–আযমে সেই করুণ কাহিনী ছড়াইয়াপড়ে। লোকের মনের সেই বেদনা প্রশমিত হইবার পুর্বেই ইমাম ইয়াহিয়ার মর্মান্তিক নিধন সংবাদ সমগ্র খোরাসান আলোড়িত করিল এবং দেশব্যাপী এক বিরাট চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিল। সমগ্র দেশ ইয়াহিয়ার দুঃখে 'সার্বজনীন শোক' পালন করিল। ইয়াহিয়ার শহীদ দিবসে যত বালক জন্মগ্রহণ করে, তাহাদের সকলেরই নাম ইয়াহিয়া রাখা হইয়াছিল। এই ভাবে লোকেরা ইয়াহিয়ার শোক–স্মৃতি তাহাদের জাতীয় জীবনে স্মরণীয় করে (১২৫ হিঃ)।

১২৫ হিজরী (৭৪৩–৪৪ খৃঃ) সত্যই ইসলামের ইতিহাসে অতি গুরুত্বপূর্ণ সন। এই বৎসর সম্রাট হিশাম পরলোক গমন করেন এবং সিংহাসনের উত্তরাধিকার লইয়া গৃহ বিবাদে একের পর এক খলিফা বদল হইতে থাকে, যার ফলে উমাইয়া সাম্রাজ্যের পতন অনিবার্য হইয়া উঠে।

চতুর্দশ অধ্যায়

মদীনার জাগরণ এবং আব্বাসীয় বংশের অভ্যুত্থান

দামেস্কের কুখ্যাত উমাইয়া-খলিফা দ্বিতীয় ইয়াযিদের আমলে (৭২০-২৪ খৃঃ) দেশের সর্বত্র বিপ্লবীদের গোপন আড্ডা প্রতিষ্ঠিত হয় একথা পূর্বে বলিয়াছি। পরবর্তী খলিফা হিশাম নিজে দুর্নীতি পরায়ণ না হইলেও যুদ্ধবিগ্রহ ও রাজ্যের অস্তিত্ব রক্ষা লইয়া এত বিব্রত থাকিতেন যে, আভ্যন্তরীণ গোলযোগের দিকে মনোযোগ দিবার তাঁহার সময় ছিল না। কাজেই অবস্থার কোনও উন্নতি দেখা গেল না। দীর্ঘস্থায়ী বিশৃঙ্খলার দরুন জনসাধারণত তাহাদের খলিফার প্রতি শ্রদ্ধা হারাইয়া ফেলিয়াছিল। তারই ফলে রাজ্যের সর্বত্র গুপ্ত ষড়যন্ত্র ও বিপ্লবী আড্ডা প্রসার লাভ করিতে থাকে।

মদীনায়ও ইহার প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় অতি স্বাভাবিকভাবেই। উমাইয়া সাম্রাজ্য যে ধ্বংসের মুখে ইহা বুঝিতে কাহারও বাকী ছিল না। মদীনার তরুণদের ভিতর বিপ্লবের সুর বাজিতে ছিল। আর এই সময় হইতে মদীনার আব্বাসীয় বংশের যুবকেরা মক্কার ভূতপূর্ব খলীফা আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়েরের আদর্শে উমাইয়া শক্তির ধ্বংস করিয়া খিলাফৎ ছিনাইয়া লইবার স্বপ্ন দেখিতে থাকেন। ইঁহাদের নেতা ছিলেন হযরত আব্বাসের প্রপৌত্র মুহম্মদ ইবনে আলী।

মদীনার অন্যান্য প্রধান প্রধান বংশগুলি তখন একরূপ নিক্রিয় অবস্থায় দিন যাপন করিতেছিল। এমনি যখন দেশের অবস্থা এবং মুসলিম সাম্রাজ্যের সর্বত্র যখন বিপ্লবের আভাস আকাশে-বাতাসে অনুভূত হইতেছিল, সেই সময় সম্রাট দ্বিতীয় ইয়াযিদের স্থলে তদীয় ভ্রাতা হিশাম উমাইয়া সাম্রাজ্যের কর্ণধার হইলেন (৭২৪ খৃঃ)। উমাইয়াদের সিংহাসন তখন টলটলায়মান। এই অবস্থায় কোনও এক সন্ধ্যায় হাশেমী গোত্রের বিভিন্ন শাখার নেতারা একত্রিত হইয়া

রাষ্ট্র বিপ্লব আসন্ন মনে করিয়া নিজেদের ভবিষ্যতের জন্য একজন নেতা নির্বাচন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

ইমাম হাসানের বংশে তদীয় পৌত্র আব্দুল্লাহ তখন অতিশয় বৃদ্ধ। তাঁহার পুত্র মুহম্মদ আল হাসানী তখন এ বংশের সর্বাপেক্ষা উদ্যোগশীল ও চরিত্রবান নেতা ছিলেন। তাঁহার গভীর জ্ঞান ও নির্মল চরিত্রের জন্য লোকে তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিয়া 'নাফসে জাকীয়া" (পবিত্র আত্মা) আখ্যা দিয়াছিল। ইমাম হুসায়েনের বংশের প্রধান ব্যক্তি বিখ্যাত জাফর আস সাদিক তখন শিয়াদের ধর্মগুরুর পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। আস্ সাদিক ছিল তাঁহার উপাধি, অতিশয় পবিত্র জীবন-যাপন করিবার জন্য। নবীবংশে তৎকালে তিনি সর্বাপেক্ষা জ্ঞান-প্রবীণ বলিয়া সম্মানিত ছিলেন। কথিত আছে বিখ্যাত শরিয়ৎ-বেত্তা ইমাম মালিকের মত লোক তাঁহার পাদমূলে বসিয়া জ্ঞানার্জন করেন। ইমাম আবু হানিফাও তাঁহাকে অতিশয় শ্রদ্ধা করিতেন। কিন্তু তিনি অত্যন্ত বৃদ্ধা হইয়া পড়ায় এবং মদীনায় উপস্থিত না থাকায় সমবেত সভ্যেরা হাসান বংশীয় মুহম্মদকে তাহাদের নেতা নির্বাচিত করে। এই নেতৃত্বের সহিত রাজনীতির সংশ্রব ছিল। কাজেই এ পদের জন্য অপেক্ষাকৃত তরুণ বয়সের কর্মঠ লোকেরই প্রয়োজন ছিল। তাই লোকেরা মুহম্মদ আল হাসানীর কর চুম্বন করিয়া তাঁহার নিকট বায়াৎ হইল এবং তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিল। হাশেমী গোত্র ছাড়া তাহাদের বন্ধুভাবাপন্ন অন্যান্য গোত্রের লোকও যাহারা সেখানে উপস্থিত ছিল তাহারা সানন্দে মুহম্মদের নেতৃত্ব মানিয়া লইল।

এই সভায় আব্বাসীয় বংশের প্রতিনিধিদের ভিতর এক ব্যক্তি ছিলেন যাহার নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইনি হইলেন হযরত আব্বাসের প্রপৌত্র মুহম্মদের তৃতীয় পুত্র আব্ যাফর। এই যুবকই পরে আল মনসুর উপাধি ধারণ করিয়া বাগদাদের খলিফা হইয়াছিলেন। উপস্থিত অন্যান্য সকলের ন্যায় এই যুবকও সেদিন নাফসে জাকীয়া মুহম্মদের কর চুম্বন করিয়া তাঁহার নিকট বায়াৎ হইয়াছিলেন। সেদিন কে ভাবিয়াছিল যে, তাঁহার এই বায়াৎ গ্রহণই একদিন এই ইমাম বংশের চূড়ান্ত সর্বনাশের কাল হইবে।

আবু যাফরের পিতা মুহম্মদ বিন আলী বহুদিন হইতে উমাইয়া বংশের উচ্ছেদ সাধন করিয়া নিজ বংশকে খিলাফতের গদীতে প্রতিষ্ঠিত করিতে সচেষ্ট

ছিলেন ইহা পূর্বে বলিয়াছি। অন্ধবিশ্বাসী অনুচরদের নিকট তিনি বলিতেন, ইমাম হুসায়েন কারবালায় শহীদ হওয়ার পর তাঁহার নাবলক পুত্র যয়নুল আবদীন ইমাম হইতে পারে নাই, মুহম্মদ আল হানাফিয়া ইমাম হইয়াছিলেন, এবং হানাফিয়ার পুত্রের নিকট হইতে আমি ইমামের পদ লাভ করিয়াছি। তাহারা ইহা বিশ্বাস করিয়া মুহম্মদ ইবনে আলীকে তাহাদের ইমাম মনে করিত এবং অতিশয় নিষ্ঠার সহিত তাঁহার হুকুম তামিল করিত। বাহিরের জনসমাজে তাঁহার নিয়োজিত প্রচারকেরা বলিত যে, আব্বাসিয়গণ নবীবংশের হৃত গৌরব পুনরুদ্ধার করার জন্য ব্রতী হইয়াছেন। ইহাতে লোকেরা আব্বাসীয় প্রচারকদিগকে যথেষ্ট সহানুভূতি প্রদর্শন করিত। সাত্বিক প্রকৃতি ইমাম মুহম্মদ আল হাসানী সর্বসম্মতিক্রমে মদীনার নেতৃত্ব লাভ করিয়াও উহার সুযোগ গ্রহণ করিতে পারিলেন না। কূটনীতিতে ইমামবংশ আব্বাসীয়দের সহিত আটিয়া উঠিতে পারিল না। বস্তুতঃ ইমামদের অতি নিকট আত্মীয় এই আব্বাসিয়গণ ইমামবংশের সম্মতিক্রমেই তাঁহাদের পক্ষে কাজ করিয়া যাইতেছেন এই ভ্রান্ত বিশ্বাসে বনি-ফাতিমাদের ভক্তগণ সর্বদা আব্বাসীয়দের প্রচারণার গোপনীয়তা রক্ষা করিত এবং তাহাদিগকে সর্বপ্রকার সুযোগ-সুবিধা প্রদান করিত (১)।

আলী-বংশীয় লোকেরা দীর্ঘকাল ধর্মীয় চর্চায় অত্যাধিক নিবিষ্ট থাকায় কূটনীতিক্ষেত্রে তাঁহারা কোনও দক্ষতা দেখাইতে পারিলেন না। তাঁহারা নামে মাত্র মদীনার নাগরিকদের পুরোভাগে রহিলেন কিন্তু আসলে

---

(১) ....To the bulk of the pople, who clung to the descendants of the prophet, the emissaries of the Abassides affirmed that they were working for the apostolical family. The adherents of the Fatimides little suspecting the treachery which lay behind this professin, without the knowledge of the Imams and without their sanction, extended to Mohammad Bin Ali and his party the favour and protection which were needle to impress upon his action the sanction of a recognised authority. —A Short History of the Saracens, by Syed Ameer Ali, P. 135.

কর্মক্ষেত্রে পূর্ণোদ্যমে ঝাপাইয়া পড়িলেন আব্বাসীয় বংশের যুবকগণ। তাঁহারা পূর্ব হইতেই খিলাফৎ আয়ত্ত করার উচ্চাশা হৃদয়ে পোষণ করিতে ছিলেন। মদীনার পৌরসভার উক্ত সিদ্ধান্ত তাঁহাদের পক্ষে অনুকুল পরিস্থিতির সৃষ্টি করিল। তাঁহারা প্রচার করিতে লাগিলেন, "আহলে বায়েতকে" অর্থাৎ নবীবংশের সন্তানদিগকে খিলাফতের গদীতে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করাই তাঁহাদের উদ্দেশ্য। ইহাতে তাঁহারা সহজেই সমগ্র আরববাসীদের সহানুভূতি পাইতে লাগিলেন। পারস্যের অধিবাসীদের ভিতর বেশীর ভাগ লোক ছিল শিয়া অর্থাৎ হযরত আলী (কঃ)–এর ভক্ত। তাহারাও নবীবংশের তথা আলীবংশের হিতৈষী হিসাবে আব্বাসীয় নেতাগণের আহ্বানে সাড়া দিল। উমাইয়া রাজত্বের উচ্ছেদ সাধনের জন্য আরব ও পারস্যের বহু সংখ্যক লোক এইভাবে জোটবদ্ধ হইল।

আব্বাসীয়গণ ইরাক ও সিরিয়ার অভ্যন্তরে গোপনীয় স্থানে আড্ডা স্থাপন করিয়া সেখান হইতে বিভিন্ন দিকে তাঁহাদের প্রচারক পাঠাইতেন। আব্বাসীয় গুপ্তচরেরা নিরীহ বণিক বেশে ইরাক ও ইরানের বিভিন্ন অঞ্চলে ভ্রমণ করিত এবং বাজার বা সরাইখানায় সরল বিশ্বাসী লোক পাইলেই তাহাদের নিকট সুযোগ বুঝিয়া নিজেদের বাণী প্রচার করিত। ধরা পড়িলে অশেষ নির্যাতন, এমন কি প্রাণদণ্ড পর্যন্ত হইতে পারে, ইহা জানিয়াও তাহারা পূর্ণ উদ্যমে কাজ চালাইয়া যাইত।

ইহার পর পারস্যের আবু মুসলিমের সহিত আব্বাসীয় নেতা মুহম্মদ যে যোগাযোগ স্থাপন করেন তাহার পরিণতির কথা পুর্বে বিবৃত হইয়াছে। আব্বাসীয়দের সঙ্গে আবু মুসলিমের সহযোগিতার অঙ্গীকারে আবদ্ধ হওয়ার ইহাও ছিল একটি বিশিষ্ট কারণ।

৭৪২ খৃষ্টাব্দে (হিঃ ১২৪ সন) আব্বাসীয় নেতা মুহম্মদ পরলোক গমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র ইব্রাহিমকে তিনি তাঁহার আরব্ধ কার্য সম্পাদনরা ভার দিয়া যান। ভ্রাতাদের লইয়া ইব্রাহীম পিতৃব্রত উদযাপনে নিষ্ঠার সহিত আত্মনিয়োগ করেন। তিন মহাদেশব্যাপী বিশাল উমাইয়া

সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো তখন যে কত বড় দুঃসাহসের কাল ছিল তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। কিন্তু অবস্থা ক্রমশঃ আব্বাসীয়দের অনুকূল হইতে থাকে। ইমাম যায়েদের মৃত্যুও তাঁহাদিগকে একজন সম্ভাব্য প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে নিষ্কৃতি দান করে।

হাশেমী গোত্রের বংশ তালিকা
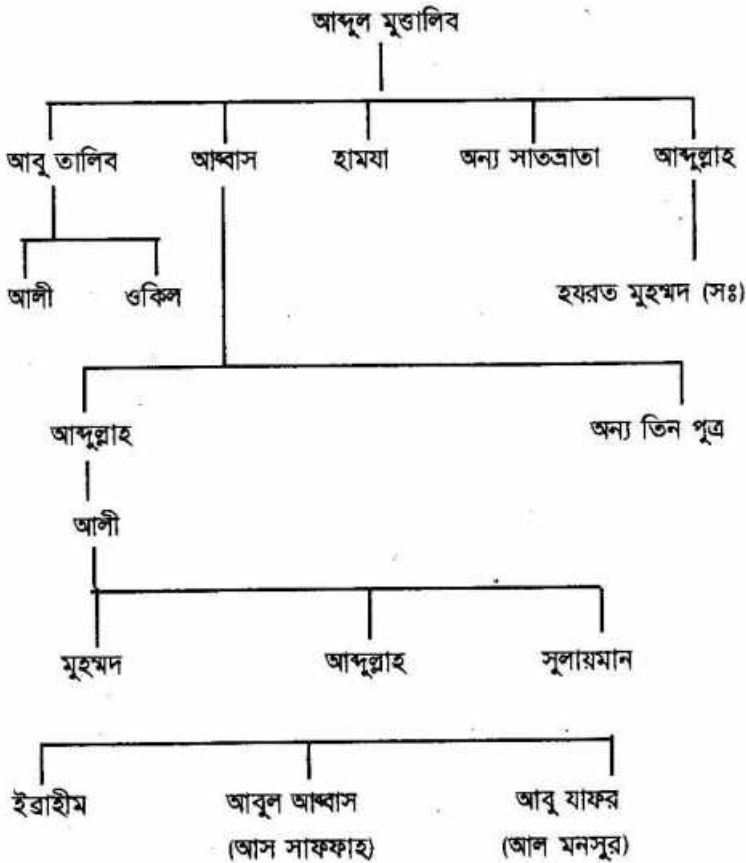
পারস্যে বিপ্লব

উমাইয়া রাষ্ট্রের দুর্যোগের অবকাশে আবু মুসলিম তাঁহার অসাধারণ বাগ্মিতার প্রভাবে ইমাম যায়েদ ও ইয়াহিয়ার মৃত্যুকে ইতোমধ্যেই বিক্ষোভের আগ্নেয় গিরিতে পরিণত করিয়াছিলেন। কারবালার হত্যাকাণ্ড, ইয়াযিদ-সৈন্য কর্তৃক মদীনা লুণ্ঠন এবং ক্বারী, হাফিয ও সাহাবীদের হত্যা, তাহাদের কর্তক পবিত্র কা'বাগৃহে অগ্নি সংযোগ ইত্যাদি যাবতীয় ঘটনা তিনি নিপুন তুলিকায় জনগণের মানসপটে আঁকিয়া দেন। সমগ্র দেশ দারুণ আক্রোশে ফাটিয়া পড়িতে থাকে। মুসলিম এই উদ্বেলিত জনসংঘকে একতাবদ্ধ ও সুনিয়ন্ত্রিত করিয়া উপযুক্ত তা'লিম দ্বারা এক শক্তিশালী যোদ্ধা দলে পরিণত করিলেন। উমাইয়াদের প্রতি অন্যান্য যে সব দলের বিভিন্ন কারণে বিদ্বেষ ছিল তাহারাও এই সময় আবু মুসলিমের সহিত হাত মিলাইল। খারেজী দল ইহাদের মধ্যে অন্যতম।

উমাইয়াদের সময় সত্যই মন্দ হইয়া আসিয়াছিল। তাই ঘটনার স্রোত কেবল বিপরীত দিকেই চলিতে লাগিল। খোরাসান প্রবাসী ইয়েমেনী নেতা কারমানী এই সময়ে বিদ্রোহ করে। গবর্ণর নসর বিন সাইয়ার তাঁহার বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করিতে বাধ্য হন। আরব সৈন্যগণ যখন এই ভাবে যুদ্ধরত, সেই সুযোগে আবু মুসলিম প্রকাশ্যভাবে বিদ্রোহ ঘোষণা করিতে মনস্থ করিলেন। ১২১ হিজরী ২৫শে রমযান, শবে বরাতের দিবস তিনি এক ঘোষণপত্র প্রচার করিলেন। তাহাতে তিনি দেশবাসীদিগকে আহ্বান জানাইলেন, বনি-হাশিমদের নেতৃত্বাধীন আসিয়া আহলে বায়েতের অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে এবং খিলাফৎ আত্মসাৎকারী উমাইয়াদিগকে বিতাড়িত করিতে।

বিপ্লবিগণকে একত্রিত করার জন্য নির্ধারিত নিশীথে অন্ধকার আচ্ছন্ন এক নির্জন পাহাড়ের চুড়ার চুড়ায় অগ্নি প্রজ্জলিত করিয়া, সঙ্কেত করা হইল।

হাজার হাজার লোক কৃষ্ণ পোশাক পরিয়া কৃষ্ণ পতাকা লইয়া পর্বতগাত্রে আবু মুসলিমের সহিত মিলিত হইল এবং প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিল। কৃষ্ণ পতাকা ছিল ইয়াহিয়ার মর্মান্তিক হত্যাজনিত জাতীয় শোকের প্রতীক। উহার নাম দেওয়া হয় 'মেঘ ও ছায়া' (the Clod and the Shadow)। কৃষ্ণ পতাকার সহিত পারস্যবাসীদের অন্তরের এই নিবিড় সংযোগ লক্ষ্য করিয়া সুচতুর আব্বাসিয়গণ কৃষ্ণ পতাকাকেই তাঁহাদের দলীয় পাতাকা রূপে গ্রহণ করেন।

৭৪৭ খৃষ্টাব্দের ৯ই জুন বিপ্লবীদল আব্বাসীয়দের কাল পাতাকা উড়াইয়া খোরাসানের রাজধানী মার্ভ শহরে প্রবেশ করে। ৮৫ বৎসর বয়স্ক বৃদ্ধ নসর প্রাণভয়ে পলায়ন করেন। কয়েক সপ্তাহ যাইতে না যাইতেই খোরাসানের সকল নগরে কৃষ্ণ পতাকা শোভা পাইতে লাগিল। যাহারা ইয়াহিয়ার হত্যা ব্যাপারে কোনও সময়ে কোন ভাবে অংশ গ্রহণ করিয়াছিল। আবু মুসলিমের দল তাহাদিগকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করিল। তিনি উল্কার ন্যায় ছুটিয়া চলিলেন নগর হইতে নগরান্তরে ধ্বংসের স্রোত বহাইয়া। যতই তিনি অগ্রসর হন, উপনদী-পুষ্ট স্রোতস্বতীর ন্যায় তাঁহার সেনাবাহী বাড়িয়া চলে। এই সর্বনাশা অভিযান ক্রমে খোরাসানের সীমানা পার হইয়া পশ্চিম দিকে প্রসারিত হইতে থাকিল। পলাতক নসর সম্রাট মারোয়ানের নিকট সৈন্য সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু সম্রাট তখন অন্যত্র যুদ্ধরত। কোনও সাহায্য আসিল না। নিরুপায় হইয়া নসর পুনরায় পত্র লিখিলেন,-"আমি বুঝিতে পারিতেছি না, উমাইয়া সন্তানগণ কি নিদ্রিত না জাগ্রত? যদি নিদ্রিত হয় তবে তাঁহাদিগকে বলা হউক এখন উঠিবার সময় হইয়াছে।"। এই পত্র পাইয়া মারোয়ান লজ্জিত হইয়া নসরের সাহায্যে সৈন্য প্রেরণ করিলেন। কিন্তু সে সৈন্য পৌঁছিবার পূর্বেই আবু মুসলিম খোরাসান ও জর্গনা প্রদেশ দখল করিয়া লইলেন এবং বহু ধনরত্নের অধিকারী হইলেন। নসর আরও দূরে পলায়ন করিলেন, কিন্তু আবু মুসলিমের দুর্ধর্ষ সেনাপতি কাহতাবা তাঁহার অনুসরণ করিতে লাগিলেন। পথিমধ্যে বৃদ্ধ নসর প্রাণত্যাগ করিলেন।

বিদ্রোহীদের ইরাকে প্রবেশ ও কারবালায় যুদ্ধ

অতঃপর সেনাপতি কাহতাবা ইরাকে অভিযান করিলেন এবং সসৈন্যে ফোরাত নদী পার হইয়া কারবলা প্রান্তরে উপনীত হইলেন। সেখানে ইয়াযিদ নামক কুফার এক উমাইয়া গবর্ণর তাঁহার গতিরোধ করেন। উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ হইল। ইয়াযিদ পরাস্ত হইয়া পলায়ন করিলেন। এই স্থানে, এই প্রান্তরে, একদা আর এক ইয়াযিদের আদেশে ইমাম হুসায়েনের পবিত্র রক্তে মরুভূমি রঞ্জিত হইয়াছিল। আজ এতদিন পরে সেই স্থানে তাহার প্রতিশোধ লওয়া হইল। এই যুদ্ধে কাহতাবা নিহত হন, কিন্তু সৈন্যগণকে উহা জানিতে দেওয় হয় নাই। কাহতাবার যোগ্য পুত্র মহাবীর হাসান যুদ্ধ জয় সমাপ্ত করেন। অতঃপর বিদ্রোহী বাহিনী কুফার দিকে অগ্রসর হয়। কুফা তখন প্রায় অরক্ষিত অবস্থায় ছিল। সেনাপতি হাসান অল্প আয়াসেই উহা জয় করিয়া লইলেন এবং আব্বাসীয়দের কৃষ্ণ পতাকা তথায় উড্ডীন করিলেন। এইভাবে ইরাক ও পারস্য উমাইয়া সাম্রাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইল।

বিপ্লবের অধিনায়ক ইব্রাহীম মায়বীর ন্যায় ছদ্মবেশে সিরিয়ার সর্বত্র ঘুরিয়া ঘুরিয়া বিপ্লবীদের ভিতর উদ্দীপনা সঞ্চার করিতে লাগিলেন। উমাইয়াদের গুপ্তচরের অভাব ছিল না। কিন্তু ইব্রাহীম কবে কোথায় অবস্থান করেন, তাহার ভ্রাতাগণ ব্যতীত কেহই তাহা জানিত না।

সম্রাট মারোয়ন আবু মুসলিমের অনুপ্রেরণার উৎস আব্বাসীয়দের গোপন আড্ডার সন্ধানে ছিলেন। একদা গুপ্তচরের মুখে দক্ষিণ প্যালেষ্টাইনের হুমাইয়া গ্রামে আব্বাসীয়দের দলপতি ইব্রাহীমের অবস্থান অবগত হইয়া মারোয়ান ত্বরিৎ গতিতে তাঁহাকে গ্রেফতার করিলেন এবং হারন নামক স্থানে এক সুরক্ষিত দুর্গে আবদ্ধ করিলেন। তাঁহার বন্দী হওয়া সত্বেও আবু মুসলিমের দৌরাত্ম্য নিবৃত্ত হইল না। উহা পুর্ণ উদ্যমে চলিতে লাগিল। ইব্রাহীমকে

এই সময় একটি সামান্য অথচ অস্বাভাবিক ঘটনা সমগ্র যুদ্ধের গতি পরিবর্তন করিয়া দিল। এক ঝাঁক কাকপক্ষী কোথা হইতে উড়িয়া আসিয়া সিরীয় সৈন্যদের মাথার উপর দিয়া চলিয়া গেল এবং আব্বাসীয় বাহিনীর পতাকাগুলির যষ্ঠির উপর গিয়া বসিল। এই তুচ্ছ ঘটনাকে মারোয়ান কিছু মাত্র গুরুত্ব না দিলেও তাঁহার কুসংস্কারাচ্ছন্ন সৈন্যদল ইহাকে ভাবী অমঙ্গলের পুর্বাভাস মনে করিয়া অত্যন্ত দমিয়া গেল। মারোয়ান ইহা লক্ষ্য করিয়া স্বয়ং অগ্রবর্তী হইলেন এবং সৈন্যগণকে তাঁহার অনুসরণ করিত উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। তাহারা সাড়া দিয়া প্রথম আক্রমণে জয়ী হইল। আব্বাসীয় বাহিনী পশ্চাতে হটিয়া গেল। কিন্তু পরক্ষণেই সেনপাতি আইয়ুনের আদেশে আব্বাসীয় সৈন্যগণ অশ্ব হইতে দ্রুত অবতরণ করিয়া ভুমিতে সারিবদ্ধ হইল এবং তাহাদের বর্শাগুলি জমীনে খাড়া করিয়া এক দুর্ভেদ্য পাহাড়–প্রাচীরের সৃষ্টি করিল। প্রধান সৈন্যাধক্ষা আব্দুল্লাহ বিন আলী পুনঃ পুনঃ খোরাসানের বিজয়ী সেনানিগণকে আহ্বান করিয়া শহীদ ইব্রাহীমের অন্যায় হত্যার প্রতিশোধ লইতে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন এবং ইয়া আলী। ইয়া মনসুর। বলিয়া মুহুর্মুহঃ হুঙ্কার দিতে লাগিলেন। এদিকে মারোয়ানও তাঁহার সৈন্যদলকে উমাইয়াদের অতীত গরিমা অক্ষুন্ন রাখার জন্য পুনঃ পুনঃ আহ্বান করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাহারা তাহাদের মনোবল হারাইয়া ফেলিয়াছিল, তাই মারোয়ানের সহস্র চেষ্টায়ও কোনও ফলোদয় হইল না। তিনি স্বয়ং বীর বিক্রমে যুদ্ধ করিতেছিলেন। তথাপি আব্বাসয়ি সৈন্যদের আক্রমণে সিরিয়গণ তিষ্টিতে পারিতেছিল না। ইতোমধ্যে মারোয়ানের একটি রিজার্ভ যুদ্ধাশ্ব কি করিয়া ছাড়া পাইয়া রণক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছিল এবং শূন্যপৃষ্ঠে রণক্ষেত্রে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। ইহার পর সিরিয়গণ সম্পূর্ণ হতাশ হইয়া ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে লাগিল। এইভাবে কুশাফ রনভুমিতে বিশ্বত্রাস উমাইয়া সাম্রাজ্যর সমাধি রচিত হইল। ঐতিহাসিক গীবন বলিয়াছেন, কুসংস্কারের ফলে এক ঝাঁক পাখী কি করিয়া একটি বিশাল সাম্রাজ্যের ভাগ্য পরিবর্তন করিতে পারে কুশাফের সময় তার দৃষ্টান্ত স্থল।

যুদ্ধে মারোয়ানের পরাজয় হইল। তিনি ভগ্ন হৃদয়ে মসৌলের দিকে পরায়ন করিলেন, কিন্তু দেখিলেন মসৌলের নগর তোরণ তাঁহার জন্য অর্গল বন্ধ। ইহার পর হারণ শহরে তিনি কিছু সময় নতুন সৈন্য সংগ্রহের চেষ্টা করেন কিন্তু ব্যর্থকাম হন। শত্রুসেনা পশ্চাতেই ছিল। অতঃপর হেম্‌স ও দামেস্ক হইয়া তিনি নগরীর পর নগরী অতিক্রম করিয়া চলিলেন কিন্তু কোথাও মাথা গুজিবার স্থান পাইলেন না। সর্বত্র আব্বাসীয়দের কৃষ্ণ পতাকা উড়িতেছিল। কোথাও আশ্রয় না পাইয়া অবশেষে তিনি মিশরে উপনীত হইলেন। মিশরে পৌছিয়া ও মারোয়ান নিরাপদ হইলেন না। আব্বাসীয়রা আঘ্রাণী-কুকুরের মত তাঁহার পশ্চাতে ছুটিতেছিল। পরিশ্রান্ত মারোয়ান নীলের পশ্চিম কুলে বুসির নামক স্থানে খৃষ্টানদের এক পরিত্যক্ত গীর্জায় বিশ্রাম আশায় আশ্রয় লইলেন। সেনাপতি আইয়ুনে গুপ্তচরেরা সেখানেই তাঁহাকে খুঁজিয়া বাহির করিল এবং গীর্জা ঘেরাও করিল। মারোয়ান বীর পুরুষ ছিলেন। তিনি শৃগাল-কুকুরের মত না মরিয়া নিষ্কোষিত তরবারী হস্তে গীর্জা হইতে নিক্রান্ত হইলেন এবং শত্রুদলের সম্মুখীন হইলেন। অর্ধ পৃথিবীর অধীশ্বর মারোয়ান এইভাবে সঙ্গীহারা সৈন্যহারা অবস্থায় শত্রুদলের সহিত একাকী যুদ্ধ করিতে করিতে বর্শাবিদ্ধ হইয়া প্রাণ ত্যাগ করিলেন। উমাইয়াদের সৌভাগ্য রবি চিরদিনের জন্য নীলের সলিলে অস্তমিত হইল (১৩২ হিঃ ৭৫০ খৃঃ)।

বিজয়ে পর নিষ্ঠুর আব্দুল্লাহ বিন আলী দামেস্কে যে অমানুষিক অত্যাচার দ্বারা উমাইয়াদের উপর প্রতিহিংসা সাধন করেন ইতিহাসে তাহার তুলনা নাই। তাঁহার আদেশে তথাকার যাবতীয় বিরুদ্ধ পক্ষীয় লোককে হত্যা করা হইল। মৃত ব্যক্তিদের কবর খুঁড়িয়া তাহাদের অস্থিপাঞ্জর বাহির করা হইল এবং সেগুলি ভস্মীভূত করিয়া বাতাসে উড়াইয়া দেওয় হইল। নগর, পল্লী, গিরিকন্দর, সরাইখানা সর্বত্র গুপ্তচর পাঠাইয়া উমাইয়া পক্ষীয় লোকদিগকে খুঁজিয়া বাহির করা হইল এবং হত্যা করা হইল। কারবালার হত্যাকান্ড হইতে আরম্ভ করিয়া এযাবৎ উমাইয়াদের কর্তৃক অনুষ্ঠিত যাবতীয় নৃশংসতার এইভাবে প্রায়শ্চিত্ত বিধান করা হইল।

পঞ্চদশ অধ্যায়

আব্বাসীয় বংশের রাজত্ব

খলিফা আবুল আব্বাস আস সাফফাহ (৭৫০–৫৪ খৃঃ)
এবং
আবু যাফর আল মনসুর (৭৫৪– ৭৫ খৃঃ)

কারবালার বিষাদময় কাহিনীর এইখানে সমাপ্তি করিতে পরিলে মন্দ ছিল না, কেননা বনি–উমাইয়া ও বনি–হাশিম বংশদ্বয়ের পরুষানুক্রমিক বিবাদের এইখানে যবনিকা পতন হইয়াছে। কিন্তু ইমামবংশের দুঃখের ইতিহাস এইখানে সমাপ্ত হয় নাই। তাঁহাদের পরবর্তী দুঃখের কারণ উমাইয়া বংশ নয়। এবার আঘাত আসে এমন একটি গোষ্ঠী হইতে যাহাদের পুর্বপুরুষ হযরত আব্বাস (রাঃ) ছিলেন মহানবী ও তাঁহার সন্তানদের নিকটতম আত্মীয়, পরম হিতাকাঙ্খী বন্ধু ও বিশ্বস্ততম পৃষ্টপোষক। আব্বাসীয় বংশ ও আলী বংশ একই হাশেমী গোত্র হইতে উৎপন্ন দুইটি শাখা। অথচ আব্বাসীয় শাখার নৃপতিগণ আলীবংশের উপর যে অত্যাচার করিয়াছেন, তাহা উমাইয়াদের দুর্ব্যবহারের চাইতে অধিক মর্মান্তিক।

এ কথা সুবিদিত যে, হযরত আব্বাস নবী–জীবনের উপর সর্বদা ঢাল স্বরূপ নিরাপত্তা বিস্তার করিয়া চলিয়াছেন। তাঁহার পুত্রগণ হযরত আলী (কঃ) র দক্ষিণহস্ত স্বরূপ ছিলেন। কি মন্ত্রণা গৃহে, কি রণক্ষেত্রে, সর্বদা তাঁহার হিতৈষণা করিয়াছেন। আর তাঁহাদেরই পরবর্তী বংশধরগণ ক্ষমতার লিপসায় অন্ধ হইয়া আলীবংশের উৎখাত সাধনে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। ইহা কি কম আক্ষেপের বিষয়? হযরত আব্বাসের চতুর্থ বংশধর (প্রপৌত্র) মুহম্মদ ইবনে

আলী ছিলেন অত্যন্ত তেজস্বী এবং কর্মঠ ব্যক্তি। তিনিই প্রথম খিলাফৎ হস্তগত করার দুরাকাঙ্খার মাতিয়া উঠেন এবং তাঁহার সন্তানগণের ভিতর উহা সংক্রমিত করিয়া যান। এই দুরাকঙ্খাই তাঁহাদিগকে আলীবংশ হইতে বিচ্ছিন্ন করে এবং সেই ভেদুবুদ্ধির ক্রমশঃ জীঘাংসায় পরিণত হয়।

আব্বাসীয় বংশে মোট সাইত্রিশ জন খলীফা রাজত্ব করেন। তাঁহাদের রাজত্ব কাল পাঁচশত বৎসরেরও অধিক। এত দীর্ঘ কাল কোনও একটি বংশের নিরবচ্ছিন্ন ভাবে সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত থাকার নযীর পৃথিবীর আর নাই। তবে এই সাইত্রিশ জন খলিফার ভিতর সকলেই নিজ যোগ্যতার দ্বারা রাজত্ব করেন নাই। তাঁহাদের ভিতর প্রথম দশ ব্যক্তি ছিলেন পরাক্রান্ত ও স্বশক্তিতে প্রতিষ্ঠিত। পরবর্তী সকলেই বিলাসী ও মন্ত্রী-নির্ভর ছিলেন। কেহ কেহ নামে মাত্র খলিফা ছিলেন। তাঁহাদের রাজকীয় ক্ষমতা পরিচালনা করিতেন তাঁহাদের অমাত্যবর্গ। প্রথম দশ খলিফার নামের একটি তালিকা পর পৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইল।

আব্বাসীয় বংশের প্রথম খলীফা আবুল আব্বাস "আল সাফ্ফাহ" চার বৎসর রাজত্ব করিয়া ৭৫৪ খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন। তৎপর তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা আবু যাফর সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং "আল মনসুর" উপাধি গ্রহণ করেন। তখন পর্যন্ত তাঁহাদের রাজধানী ছিল কুফায়। আল মনসুর খলিফা হইয়া টাইগ্রিস নদীর তীরবতী অপেক্ষাকৃত স্বাস্থ্যকর ও মনোরম বাগদাদ নামক স্থানে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। টাইগ্রিস নদী আরব ও ইরান দেশের ভিতরকার সীমারেখা। বাগদাদ উহার উভয় তীরে অবস্থিত এবং আরব আযমের উহা মিলনক্ষেত্র। প্রথম খলীফা আবুল আব্বাসের জীবন কাটে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায় এবং শত্রুদের উচ্ছেদ সাধনে। পরবর্তী খলীফা আল মনসুরই ছিলেন আব্বাসীয় সাম্রাজ্যের প্রকৃত গঠনকারী। উমাইয়া খলীফা আবদুল মালিকের মতই তিনি সাম্রাজ্যের নিরাপত্তা বিধান ব্যাপারে নির্মম হস্তে কার্য করিয়া গিয়াছেন। রাষ্ট্রের স্বার্থ ও স্থায়িত্ব যেখানে বিপন্ন হইবার সম্ভাবনা দেখা দিত সেখানে ধর্ম বা ন্যায়নীতি, কোন কিছুরই দোহাই তিনি গ্রাহ্য করিতেন না।

আব্বসীয় বংশ

(প্রথম দশ খলিফা)

স্পেনে বিদ্রোহ ও আবদুর রহমানের উত্থান

আরব ইতিহাসের আর একটি রক্তাক্ত অধ্যায়ের কথা এখানে বলিব যাহার কাহিনী একদিকে যেমন কলঙ্কমাখা অপরদিকে তেমনি গৌরবোজ্জ্বল।

খৃষ্টীয় ৭৫০ সন। দামেস্কের উমাইয়া সাম্রাজ্যের পতন ঘটিয়াছে। আব্বাসীয় বংশ সবেমাত্র সিংহাসন লাভ করিয়া কুফা নগরে রাজধানী স্থাপন করিয়াছে। এই সময় ছিল আব্বাসীয়দের প্রতিশোধ গ্রহণের যুগ। প্রতিপত্তিশালী উমাইয়াগণকে যাহাকে যেখানে পাওয়া যাইত নিহত করা হইত। এমন কি কোনও কোনও ক্ষেত্রে পরলোকগত অপরাধীর মৃতদেহ কবর হইতে উঠাইয়া ভস্মসাৎ করা হয়। অবশ্য উমাইয়া শাসকেরাই পূর্বে ইহার নযীর স্থাপন করিয়াছিলেন।

দেশের রাজনৈতিক অবস্থা যখন এইরূপ বিপদসঙ্কুল, এই সময় সম্ভ্রান্ত উমাইয়া সন্তানেরা যে যেখানে পারিল পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করিতে লাগিল। ইহাদেরই একজন, বিংশতি বর্ষীয় এক বীর যুবক, কনিষ্ঠ ভ্রাতাসহ ফোরাতের পূর্বতীরে বেদুইনদের ভিতর ছদ্মবেশে আত্মগোপন করিয়াছিলেন। কনিষ্ঠের বয়ঃক্রম মাত্র ত্রয়োদশ বর্ষ। একদা সন্ধ্যার সময় উভয় ভ্রাতা নদী তীরস্থ পর্বতগাত্রে তাঁহাদের ক্ষুদ্র তাঁবুতে বসিয়া সান্ধ্যশোভা উপভোগ করিতেছিলেন। অদূরে তাঁহাদের বিশ্বস্ত ভৃত্য সতর্কভাবে চতুর্দিকে লক্ষ্য রাখিতেছিল। যুবক চিন্তাক্লিষ্ট। অতীতের সহিত বর্তমানের তুলনাকরিয়া যুবক দূর ভবিষ্যতের পানে দৃষ্টি প্রসারিত করিয়াছিলেন। কে জানে ভবিষ্যতে তাঁহার অদৃষ্টে কি লিখিয়াছে? ইরাকের প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ইবনুল আসীরের বর্ণনা সূত্রে, যববের দেহ ছিল দীর্ঘ সরু এবং সুঠাম। চক্ষুর দৃষ্টি তীক্ষ্ণ এবং বুদ্ধিদৃপ্ত। নাসিকা উন্নত, ঈগল-চঞ্চু সদৃশ। মস্তকের কেশ লোহিত। যুবক যে অসাধারণ শারীরিক বল ও স্নায়বিক শক্তির অধিকারী ছিলেন তাঁহার সুদৃঢ় গঠন তার সাক্ষ্য বহন করিতেছিল। ফোরাতের বিপুল গর্জন তাঁহার প্রবেশ

করিতেছিল না। পশ্চিম পাড়ে অন্তর্গত সূর্যের শেষ আভা তখনও আকাশের গায়ে লাগিয়া আছে। নিম্নে নদী-জলে উহারই রক্তরাঙ্গা প্রতিবিম্ব। তরঙ্গের আঘাতে আঘাতে উহা শত খণ্ডে চুরমার হইয়া যাইতেছে। এ কি উমাইয়াদের গৌরব রশ্মির বিলীয়মান প্রতিচ্ছবি! যুবক তন্ময় হইয়া ভাবিতেছিল।

অকস্মাৎ অশ্ব পদধ্বনিতে যুবকের মোহভঙ্গ হইল। যেন কতিপয় অশ্বারোহী তাঁহাদের দিকে ছুটিয়া আসিতেছে। সময় অতিশয় সঙ্কটপূর্ণ। যুবক মুহূর্ত মাত্র বিলম্ব না করিয়া ভ্রাতা ও ভৃত্যকে সঙ্কেত-ধ্বনি করিলেন এবং যুগপৎ তিনজনে নদীজলে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন।

দেখিতে দেখিতে একদল অশ্বারোহী সৈন্য কৃষ্ণ পতাকা উড়াইয়া বর্শা হস্তে পাহাড়টি ঘিরিয়া ফেলিল। কৃষ্ণ পতাকা আব্বাসীয়দের যুদ্ধের প্রতীক। তাহাদেরই কতক লোক পলাতক শিকারের পশ্চাদ্ধাবনের জন্য নদীতীর দিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। নদীর তরঙ্গ প্রবল। সান্ধ্য আকাশে অগণিত তারা ফুটিয়াছিল। নক্ষত্রালোকে তরঙ্গগুলির ফেনিল উচ্ছ্বাস এক অপার্থিব সৌন্দর্যের অবতারণা করিতেছিল। সেই তরঙ্গের ভিতর কখনও ডুবিয়া কখনও জাগিয়া আগাইয়া চলিয়াছে তিন জন বিপন্ন মানুষ। ওদিকে তীর হইতে শর নিক্ষেপ করিতেছে শত্রুদল। কিয়ৎকাল পরে কনিষ্ঠ ভ্রাতাটি ক্লান্ত ও অবসন্ন হইয়া পড়িল। সে আর সম্মুখে আগাইতে না পারিয়া স্রোতের টানে গা ভাসাইয়া দিল এবং কিছুক্ষণের মধ্যে আবার পূর্ব তীরে ফিরিয়া আসিল। কিন্তু তাহাকে আর নদী হইতে উঠিতে হইল না। মুহূর্তের ভিতর আব্বাসীয় সৈন্যগণ তরবারির আঘাতে তাহার দেহ দ্বিখণ্ডিত করিল। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ও ভৃত্যটি সেই অন্ধকারের কোথায় অদৃশ্য হইল শত্রুগণ তাহা নির্ণয় করিতে পারিল না। তাহারা নিরাশ হইয়া ফিরিয়া গেল।

পাঁচ বছর পরের কথা

তখন খৃষ্টীয় ৭৫৫ সন। এই পাঁচটি বৎসর ছিল আরব ইতিহাসের জন্য কতই না গুরুত্বপূর্ণ। চার বৎসর কুফায় বাদশাহী করার পর রক্তপিপাসু আবদুল আব্বাস আল্লা'র সমীপে তাঁহার কৃতকর্মের জবাবদিহি করিতে চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা আবু যাফর সিংহাসনে বসিয়াছেন এবং টাইগ্রিস তীরে বাগদাদ নামক স্থানে নূতন রাজধানী রচনা করিতেছেন। প্রাচীন পারস্য সম্রাট নওশেরওয়ার 'বাগেদাদ' শহর নব কলেবর ধারণা করিয়া আব্বাসীয়দের নূতন রাজধানী পরিণত হইতে চলিয়াছে।

মুসলিম সাম্রাজ্যের দিকে দিকে আব্বাসীয় খলীফাদের ফরমান জারী হইয়াছে। মধ্য এশিয়া ও খোরাসান হইতে মিশর, মরক্কো ও স্পেন পর্যন্ত আব্বাসীয় খলীফার হুকুমৎ চলিতেছে এবং তাঁহার নামে প্রতি জুমা'য় খোৎবা পাঠ হইতেছে।

কিন্তু স্পেনের অভিজাত সম্প্রদায় আব্বাসীয়দের নিয়োজিত নূতন গভর্ণরকে সহ্য করিতে পারিতেছিল না। দেশময় অশান্তি, গোলযোগ ও অন্তর্দ্বন্দ্ব চলিতেছিল। এই অবস্থায় কতিপয় নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি জানিতে পারিলেন, উমাইয়া খলীফা হিশামের এক বংশধর বার্বার অঞ্চলে ছদ্মবেশে বিচরণ করিতেছেন। তখন তাঁহারা পরামর্শ করিয়া এই বীর যুবার অন্বেষণে একদল প্রতিনিধি প্রেরণ করিলেন।

পাঁচ বৎসর পূর্বে একদা সন্ধ্যায় ফোরাতের তরঙ্গমালার ভিতর যে বীর যুবককে আমরা নিরুদ্দেশ হইতে দেখিয়াছি, তিনিই এই সুদূর বার্বার প্রদেশে বেদুইনদের ভিতর ছদ্মবেশে বাস করিতেছিলেন। নিয়তির বিধান বিচিত্র সন্দেহ নাই। পাঁচ বৎসর ধরিয়া যুবক মেবারের প্রতাপ সিংহের ন্যায়, আফ্রিকার বনে-জঙ্গলে, পাহাড়ে-উপত্যকায় বেড়ায়াছেন। বন্য ফল-মূল ও শিকারের মাংসে ক্ষুন্নিবৃত্তি করিয়াছেন এবং প্রস্তর শিলা ও কঙ্কর শয্যায় রাত্রি

যাপন করিয়াছেন। অসভ্য বার্বার নরনারী ও বনের হিংস্র পশু ছিল তাঁহার জীবনসঙ্গী। ইরাক হইতে মরক্কো পর্যন্ত সুদীর্ঘ পথে কতবার তিনি শত্রুহস্তে পড়িবার আসন্ন দুর্বিপাক হইতে শুধু সাহস ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের বলে নিজেকে রক্ষা করিয়াছেন। পরিশেষে তিনি এই বার্বার দেশে একটি শক্তিশালী পার্বত্য জাতির আশ্রয় লাভ করেন।

বার্বার দেশের উত্তরে ভূমধ্য সাগর এবং পশ্চিমে মরক্কো ও আটলান্টিক মহাসাগর। ভূমধ্য সাগরের উত্তর পারেই সুজলা-সুফলা স্পেন দেশ। বার্বার ও ম্যুর জাতির নিকট স্পেন অতি সুপরিচিত। মহাবীর তারিক যখন স্পেন দেশে মুসলিম পতাকা উড্ডীন করিয়াছিলেন তখন তিনি এই ম্যুর সৈন্যদের সাহায্য লইয়াছিলেন। অতীত দিনের কত কথাই না যুবক শুনেন আর দীর্ঘশ্বাস ফেলেন,- হায়! এই সুন্দর দেশ তো এককালে তাঁহারই পূর্ব পুরুষদের সম্পত্তি ছিল! আবার যদি সেদিন ফিরিয়া আসিত! অদৃষ্টের যবনিকা কেহ উত্তোলন করিতে পারে না। উহার অপর পারে কি আছে তাহাও কেহ দেখিতে পায় না। তাই উহার নাম অ-দৃষ্ট। যুবকের অদৃষ্টে কি লিখিত আছে, তাহা সে কি করিয়া জানিবে। আশা ও নৈরাশ্যের ভিতর তাঁহার চিত্ত অহর্নিশ দোল খাইতেছিল। এমনই সময় স্পেনের এক দল প্রতিনিধি আসিয়া উপনীত হইল সেই মরুচারী যুবকের নিকট। আরব জাতির ইতিহাসের কাহিনী আরব্য উপন্যাসের মতই রোমাঞ্চকর, কিন্তু সত্য। প্রতিনিধিদল বলিল, আমরা লোক পরম্পরা অবগত হইয়াছি, মহিমান্বিত খলীফা হিশামের এক পৌত্র পাঁচ বৎসর পূর্বে দুরন্ত ফোরাত নদী সন্তরণ দ্বারা পার হইয়া আব্বাসীয় শত্রুবর্গের হস্ত হইতে বাহুবলে আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন এবং অধুনা তিনি বার্বাদের ভিতর গোপনে অবস্থান করিতেছেন। আপনার আকৃতি-প্রকৃতি দর্শনে মনে হইতেছে আপনিই সেই ভাগ্যতাড়িত শাহজাদা। আপনার পিতামহগণ পৃথিবীর বৃহত্তম সাম্রাজ্যের অধিপতি ছিলেন। পশ্চিম আটলান্টিকের তরঙ্গমালা হইতে পূর্বে সিন্ধুনদ ও মঙ্গোলিয়া এবং উত্তরে উরল পর্বত হইতে ও দক্ষিণে আরব সাগর ও আবিসিনিয়া পর্যন্ত তাঁহাদের নামে প্রকম্পিত হইত। আপনি তাঁহাদেরই উপযুক্ত বংশধর। স্পেনবাসীরা চাহে আপনার নেতৃত্ব। নতুবা গৃহযুদ্ধে তাহারা

ছারখার হইয়া যাইবে। বর্তমান শাসকগণ যে কখনও তাহাদিগকে সংঘবদ্ধ করিতে পারিবে, এ বিশ্বাস কাহারও নাই। তাই তাহারা স্বেচ্ছায় আপনার হস্তে একটি সমৃদ্ধশালী রাজ্য তুলিয়া দিতে চায়। কঠিন হইলেও এ দায়িত্ব আপনি যদি গ্রহণ করেন, আসুন আমরা আপনাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতেছি। সেই উদ্দেশ্যেই আমরা এখানে আসিয়াছি। পিতৃপুরুষদের গরিমা উল্লেখ করায় যুবকের বক্ষ গর্বে স্ফীত হইয়া উঠিল। তিনি আর আত্মগোপনের প্রয়োজন বোধ করিলেন না, যদিও এরূপ দৌত্যে বিশ্বাস স্থাপন অনেক সময় বিপদজনক প্রমাণিত হইয়াছে। তিনি নিঃসঙ্কোচে বলিয়া গেলেন– আমিই সেই হতভাগ্য শাহজাদা আব্দুর রহমান। আপনাদের দেশবাসীরা যদি সত্যিই আমার নেতৃত্ব চাহেন, আমি সেজন্য প্রস্তুত। যুদ্ধের বিভীষিকা, প্রাণের মায়া, শারীরিক ক্লেশ, দুঃসহ পরিশ্রম, কোনও কিছুই আমাকে পশ্চাদপদ করিতে পারিবে না। আমি প্রাণ থাকিতে আপনাদিকে বিপদের মুখে ফেলিয়া পলায়ন করিব না। আমি শুধু চাই আপনাদের বিশ্বস্ততা এবং আল্লা'র অনুগ্রহ।

প্রতিনিধি দল আশ্বস্ত হইল। যুবক আবদুর রহমান তাহাদের সহিত গোপনে স্পেন সীমান্ত অতিক্রম করিতে প্রস্তুত হইলেন। স্থানীয় বার্বার ও আরব দলপতিগণ অনেকে তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। ইঁহাদের ভিতর একটি গোষ্ঠী ছিল, সম্পর্কে আব্দুর রহমানের মাতুল–কুল। দূরদেশে তাঁহাদের পরিচয় পাইয়া আব্দুল রহমান একান্ত উল্লাসিত হইলেন। স্পেনভূমিতে অবতীর্ণ হওয়ার পর যতই অগ্রসর হইতে লাগিলেন, গ্রামের পর গ্রাম তাঁহাকে অভিনন্দন জানাইতে লাগিল। ভূতপূর্ব সৈন্যবাহিনীর কর্মচ্যুত লোক তাঁহার পতাকাতলে সমবেত হইতে লাগিল। উমাইয়া–পক্ষভুক্ত আরব অভিজাতবর্গ, স্পেন–প্রবাসী ম্যুর ও বার্বারগণ এবং স্থায়ী সৈন্যদলের কোনও কোনও অংশ গোপনে তাঁহাকে সমর্থন জানাইল। উপকূলরক্ষী সৈন্য বাহিনী ছিল সিরিয়া দেশীয়। তাহারাও তাঁহার প্রতি আনুগত্য জানাইল। অবস্থা অনুকূল বোধে আবদুর রহমান সাহসে ভর করিয়া ক্রমশঃ রাজধানী কর্দোভার দিকে আগাইয়া চলিলেন।

স্পেনে তখন ঘোর অন্তর্দ্বন্দ্ব চলিতেছিল। নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের ভিতর দলাদলির অন্ত ছিল না। এজন্য আবদুর রহমানের সমর্থকগণ তাঁহাকে আনুষ্ঠানিকভাবে সুলতান বলিয়া ঘোষণা করার প্রয়োজন বোধ করিলেন। নির্ধারিত দিনে কোনও গোপন স্থানে তাঁহার অভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন করা হইল। তারপর চতুর্দিকে নূতন সুলতানের শাসন ভার গ্রহণের সংবাদ প্রচারিত হইল। লক্ষ লক্ষ কণ্ঠে ধ্বনি উঠিল, "জয়, স্পেনরাজ আবদুর রহমানের জয়।'

যথাসময়ে এ সংবাদ স্পেনের আব্বাসীয় গভর্ণর ইউসুফের কর্ণগোচর হইল। তিনি সসৈন্যে কর্দোভা হইতে নির্গত হইয়া অভিযাত্রিদলকে বাধা প্রদান করিলেন। কিন্তু তাঁহাকে কর্দোভায় আর ফিরিয়া যাইতে হইল না। আব্দুর রহমান কর্দোভা অধিকার করিয়া লইলেন। অতপর উমাইয়া পক্ষ ও আব্বাসীয় পক্ষ শক্তি পরীক্ষার জন্য কিছুকাল মরিয়া হইয়া যুদ্ধ করিয়াছিল, কিন্তু আব্দুর রহমানকে বিতাড়িত করা সম্ভবপর হয় নাই। উমাইয়াদের গৌরব সূর্য এশিয়ায় অস্তমিত হইয়া পুন ইউরোপে উদিত হইল।

বিজয়ী আব্দুর রহমান কর্দোভায় প্রবেশ মাত্রই সৈন্যগণকে সতর্ক করিয়া দিয়াছিলেন, আব্বাসীয় গভর্ণরের আবাসগৃহে যেন কোনও রূপ অত্যাচার করা না হয়। ইহা তাঁহার হৃদয়ের মহত্বের পরিচায়ক। তাঁহার অসাধারণ সাহস, বীরত্ব ও কর্মক্ষমতার ফলে অল্পদিনের মধ্যেই স্পেন একটি সুদৃঢ় রাষ্ট্রে পরিণত হইল। তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী বাগদাদ খলীফা আল মনসুর তাঁহার রাজ্যলাভের কাহিনী শুনিয়া বলিয়াছিলেন, অদ্ভুত এই ব্যক্তির সাহস ও কর্মদক্ষতা। মৃত্যুর মুখ হইতে কোনও মতে রক্ষা পাইয়া জঙ্গলে, মরুভূমিতে যাযাবরের জীবন যাপন করিতে করিতে এমন একটি সমৃদ্ধ দেশের সিংহাসন হস্তগত করিতে পারা সত্যই আশ্চর্য। মানুষ কখনও এরূপ পারে নাই।

ইহার পর প্রায় দুই বৎসর যায়। দুর্ধর্ষ খলিফা আল মনসুর একদিন মক্কায় বসিয়া দরবার করিতেছিলেন, এমন সময় তাঁহার সম্মুখে কালো বস্ত্রে আবৃত একটি ভারী বস্তু নিপতিত হইল। কালো বস্ত্রটি ছিল আব্বাসীয়দেরই যুদ্ধের পতাকা। উহা দ্বারা বস্তুটি উপঢৌকনের মত সাজান ছিল। কিন্তু

খুলিয়া দেখা গেল, উহা আল মনসুর কর্তৃক নিয়োজিত স্পেনের প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষের কর্তিত মস্তক। লবণ ও কর্পূর সহযোগে উহার পচন নিবারণ করা হইয়াছিল। উহা কি প্রকারে ঐ স্থানে আসিল কিছুই বোঝা গেল না। ব্যাপারটি আগাগোড়াই রহস্যময় ছিল। বিস্ময়াবিষ্ট আল মনসুর চীৎকার করিয়া বলিয়াছিলেন, শোকর আল্লা'র যে, এই কুরায়েশ বাজ পক্ষীটি ও আমার রাজ্যের ভিতর একটি দুস্তর সমুদ্রের ব্যবধান রহিয়াছে। আশ্চর্য এর সাহস ও বুদ্ধি কৌশল!

ইহার পর আর কখনও খলীফা মনসুর আবদুর রহমানের বশ্যতা আদায়ের জন্য স্পেনে সৈন্য প্রেরণ করেন নাই। কর্মক্ষমতা, শাসন নৈপুণ্য এবং যুদ্ধ-কৌশলে আবদুর রহমান যে তাঁহার সমকক্ষ ছিলেন, ইহা সমসাময়িক লোকেরা স্বীকার করিতেন এবং আল মনসুর নিজেও হয়ত বিশ্বাস করিতেন।(১)

---

(১) শুধু শাসনপটুতা ও কর্মক্ষমতায়ই আবদুর রহমান অদ্বিতীয় ছিলেন না। তাঁহার শিল্পানুরাগ, সৌন্দর্যানুভূতি ও কবিত্বশক্তিও ছিল উচ্চস্তরের। রাষ্ট্রের শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য অনেক সময় তাঁহাকে কঠোরতা অবলম্বন করিতে হইলেও আসলে তাঁহার অন্তঃকরণ ছিল কোমল ও সুকুমার বৃত্তিসম্পন্ন। তিনি রাজধানী কর্দোভাকে অগণিত হর্মরাজি ও উদ্যানমালায় সুশোভিত করিয়াছিলেন। অন্যান্য শহরের উৎকর্ষ সাধনও তাঁহার দৃষ্টি এড়ায় নাই। কথিত আছে, স্পেনের প্রথম খর্জুর বৃক্ষ তাঁহার স্বহস্তে রোপিত। এই বৃক্ষ তাঁহাকে স্বদেশের কথা স্মরণ করাইয়া দিত। এই প্রিয় বৃক্ষটিকে লক্ষ্য করিয়া তিনি একটি সুন্দর কবিতা লিখিয়াছিলেন। ফল পুষ্পের জন্য সিরিয়া হইতে আরও কয়েক প্রকার বৃক্ষ তিনি স্পেনে আমদানী করেন, যার অভাব স্পেনবাসীরা পূর্বে অনুভব করিত। তাঁহার বেতনভোগী লোকেরা দামেস্ক, বাগদাদ ও আলেকজান্দ্রিয়ার লাইব্রেরীতে বসিয়া কর্দোভার লাইব্রেরীর জন্য পুস্তক নকল করিত। সুযোগ মত ইহারা বিদেশ হইতে পুস্তক ক্রয় করিয়াও লইয়া যাইত। আবদুর রহমানের পৌত্র হাকামের সময় কর্দোভার শাহী লাইব্রেরীর পুস্তকের সংখ্যা চারি লক্ষে দাঁড়ায়। সেগুলির শুধু ফিরিস্তিই চুয়াল্লিশখানি বিরাটকায় গ্রন্থ। শাহী লাইব্রেরী ছাড়াও রাজধানী শহরে সত্তরটি সাধারণ পাঠাগার এবং বহুসংখ্যক পুস্তকের দোকান বিদ্যমান ছিল। ইহা হইতে স্পেনের তৎকালীন জন সমাজের পাঠাগ্রহের নমুনা পাওয়া যায়।

বহু দিক দিয়া স্পেনে আব্দুর রহমানের অবদান অবিস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। অথচ এই অদ্ভুতকর্মা লোকটি স্বাধীন নৃপতি হইয়াও তাঁহার রাজত্বের প্রথম বাইশ বৎসর পর্যন্ত স্পেনের মসজিদগুলিতে বিনা আপত্তিতে বাগদাদের আব্বাসীয় খলীফাদের নামে খোৎবা পাঠ করিতে দিয়াছেন। ইহাতে তাঁহার মুসলিম জাহানের সংহতির প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা বুঝিতে পারা যায়। পরিশেষে, তিনি বিশেষ কারণ বশতঃ খোৎবা হইতে বাগদাদে খলীফাদের নাম উঠাইয়া দেন, কিন্তু তখনও নিজ নাম সে স্থলে প্রবিষ্ট করান নাই। আজীবন তিনি "আমীর" উপাধিতে সন্তুষ্ট থাকিয়াছেন, "আমীরুল মু'মেনীন" হইতে কখনও বাসনা করেন নাই। ন্যায় ও ধর্মের প্রতি এমন নিষ্ঠা উমাইয়া বংশে অতি অল্প লোকেরই দেখা গিয়াছে। আবদুর রহমান তাঁহার রোজ-নামচায় লিখিয়াছেন, জীবনে তিনি বার দিন মাত্র বিশ্রাম উপভোগ করিয়াছেন। নিরঙ্কুশ ক্ষমতা লাভ সত্ত্বেও তাঁহার এই কর্মময় জীবন যে একান্ত ভাবে মানবতার কল্যাণে ব্যয়িত হইয়াছিল, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।

মদীনায় হাসান বংশীয় ইমামদের বিনাশ সাধন

মদীনা ছিল মুসলিম অভিজাত বংশ সমূহের সন্তানদের আবাস ভূমি। আর তাঁহাদের সকলের মুকুটমণি ছিলেন ফাতিমা বংশীয় ধর্মপ্রাণ ইমামগণ। মদীনায় এবং তথা সমগ্র হিজাজে তাঁহার অবিসংবাদিত রূপে ধর্মগুরু সম্মান লাভ করিয়া আসিতেছিলেন। নবীর শোণিত তাহাদের শরীরে প্রবাহিত বলিয়া তাঁহাদের মর্যাদা ছিল অপর সকলের চাইতে বহু উর্ধ্বে। তাঁহাদের নামের দোহাই দিয়াই আব্বাসীয় নেতারা মহাশক্তিশালী উমাইয়া রাজত্বের উচ্ছেদ সাধনে সমর্থ হইয়াছিলেন। সেই সকল সর্বজনমান্য ধর্ম নায়ক যদি কোনও সময় যথার্থ আন্তরিকতার সহিত কোন রাজবংশের উচ্ছেদের জন্য উঠিয়া-পড়িয়া লাগেন তবে সে বংশের পতন সুনিশ্চিত। এই সকল দুশ্চিন্তা সন্দিগ্ধমনা মনসুরকে পাইয়া বসিয়াছিল। ইতিপূর্বে আলীবংশ ও আব্বাসীয় বংশের সম্প্রীতি ছিল অতি নিবিড়। সেই অচ্ছেদ্য প্রীতির ভিতর জীঘাংসার বিষাক্ত ছুরিকা প্রবিষ্ট করাইলেন এই মনসুর। তিনি ইমাম বংশের ছিদ্র অন্বেষণে ব্যাপৃত হইলেন এবং এই উদ্দেশ্যে মদীনায় গুপ্তচর প্রেরণ করিলেন। তাহাদের কর্তব্য ছিল ইমাম গোষ্ঠীর কার্যকলাপ লক্ষ্য করা এবং কথাবার্তায় তাঁহাদিগকে চটাইয়া দেওয়া, যাহাতে তাঁহারা হঠাৎ এমন কোনও উক্তি বা আচরণ করিয়া বসেন যাহা রাজদ্রোহ রূপে গণ্য করা যাইতে পারে।

কয়েক বৎসর পূর্বে মদীনার নাগরিকদের যে সভায় হাশেমী গোত্রের প্রধানগণ এবং সেই সঙ্গে আরও কতিপয় গোত্রের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা সকলে মিলিয়া ইমাম মুহম্মদ "নাফসে জাকীয়াকে" তাঁহাদের নেতা নির্বাচিত করেন সেই সভার স্মৃতি মনসুর কোনও দিন ভুলিতে পারেন নাই। মদীনার নাগরিকদের উপর "নাফসে জাকীয়ার" যে প্রভাব সেদিন তিনি তখন লক্ষ্য

করিয়াছিলেন, যাঁহার নিকট তিনি নিজেও বায়াৎ হইয়া নতমস্তক হইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। সেই স্মৃতি যখন–তখন তাঁহার অন্তরের ভিতর কন্টকের ন্যায় বিঁধিত। তিনি ইমাম নাফসে জাকীয়া ও তাঁহার ভ্রাতা ইব্রাহীমকে কোনও অসিলায় কয়েদ করিতে মনস্থ করিলেন। ইঁহাদিগকে ধৃত করার জন্য তাঁহার এক গোপনীয় আদেশও মদীনায় প্রেরিত হইল। কিন্তু নাফসে জাকীয়ার ভক্ত ও হিতৈষীর অভাব ছিল না। তাহারা পূর্বাহ্নে ইহার আভাস পাইয়াছিল। তাহাদের ইশারায় নাফসে জাকীয়া ও ইব্রাহীম নগরের শান্তি ও আত্মরক্ষার জন্য মদীনা হইতে সরিয়া পড়িলেন।

ক্ষমতা গর্বিত মনসুর এই সংবাদে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া গেলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ আদেশ প্রচার করিলেন, ইমাম বংশের উল্লেখযোগ্য যাবতীয় ব্যক্তিকে ধৃত ও বন্দী করিয়া কুফায় প্রেরণ করিতে। আদেশ অবিলম্বে কার্যে পরিণত হইল। নাফসে জাকীয়ার বৃদ্ধ পিতা আব্দুল্লাহও বাদ পড়িলেন না।
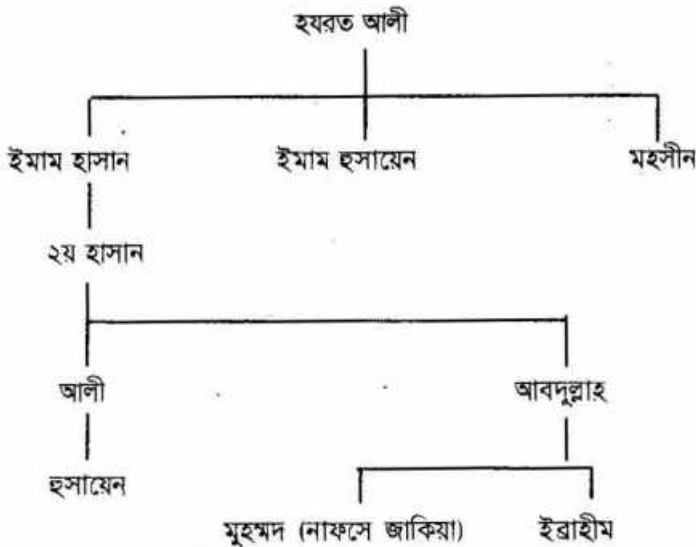
হযরত ওসমানের বংশের প্রধান ব্যক্তি মুহম্মদ আল ওসমানী ইব্রাহীমের সহিত কন্যা বিবাহ দিয়াছিলেন। তিনিও ধৃত হইলেন। শুধু হুসায়েনী শাখার ইমাম যাফর আস সাদিক ঐ সময় মদীনায় অবস্থান করিতেন না বলিয়া তাঁহাকে আসামীর তালিকাভুক্ত করা হয় নাই। বিশেষতঃ তিনি অতিশয় বৃদ্ধ হইয়াছিলেন। (৭৬৫ খৃষ্টাব্দে মনসুরের রাজত্ব কালেই তিনি দেহত্যাগ করেন)। ধৃত ব্যক্তিগণকে শৃঙ্খলিত অবস্থায় কুফায় প্রেরণ করা হইল এবং তথায় হোবায়রা দুর্গে তাঁহাদিগকে আটক করা হইল। মদীনায় ইমাম-বংশের শিশু, বালক ও নারী তিন্ন আর কেহ অবশিষ্ট রহিল না। তাঁহাদের আত্মীয়-স্বজনেরও মান-সম্মান বজায় রাখা দুষ্কর হইয়াছিল।

মুহম্মদ আল ওসমানী হযরত ওসমানের বংশধর হিসাবে সিরিয়াবাসীগণের নিকট অতিশয় সম্মানের পাত্র ছিলেন। ইহাও তাঁহার সর্বনাশের আর এক কারণ হইল। আব্বাসীয়দের সিংহাসনের পক্ষে তিনি একজন বিপজ্জনক ব্যক্তি বলিয়া বিবেচিত হইলেন। তাঁহার উপর কঠোর ভাবে কোর্রা লাগান হইল এবং পরিশেষে অযত্নে রাখিয়া তাঁহাকে মারিয়া ফেলা হইল। অন্যান্য সকলের উপরও অমানুষিক অত্যাচার চলিতে থাকিল। অত্যাচারের মাত্রা এতটা চড়িয়াছিল যে, হতভাগ্য বন্দিগণ বলিতে বাধ্য হইয়াছিল যে, উমাইয়াদের আমলে তাঁহারা ইহার চাইতে অধিক সুখে ছিলেন।

এদিকে মুহম্মদ নাফসে জাকীয়া ও ইব্রাহীমের জন্য দেশব্যাপী অনুসন্ধান চলিতে লাগিল। প্রতি পল্লীতে, প্রতি সরাইতে, প্রতি ঝর্ণার ধারে যেখানে যেখানে মানুষের আশ্রয় লওয়া সম্ভব, সর্বত্র বেদুইন গুপ্তচরগণকে লেলাইয়া দেওয়া হইল এই দুইটি নির্দোষ ভাইয়ের সন্ধানের জন্য। যাহাকে সন্দেহ হইত যে, উক্ত ভ্রাতৃদ্বয়কে আশ্রয় দিয়াছে, তাহাকেই ধরিয়া লইয়া কারাগারে নিক্ষেপ করা হইত এবং কঠিন বেত্রাঘাত দেওয়া হইত।

ইমাম ভ্রাতৃদ্বয়ের আত্মপ্রকাশ ও শাহাদৎ

নির্দোষ মানুষের উপর এই প্রকার যুলুম চলিতেছিল শুধু তাঁহাদের জন্য, এই কথা জানিতে পারিয়া ইমাম ভ্রাতৃদ্বয় আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, আত্মপ্রকাশ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেন। তবে তাঁহাদের কথা হইল অন্যায়ের নিকট ভীরুর মত আত্মসমর্পণ করিবেন না। এইরূপ চিন্তা করিয়া ইমাম মুহম্মদ নাফসে জাকীয়া ছোট ভাই ইব্রাহীমকে বসরা ও আহওয়াজে সৈন্য সংগ্রহ করিতে বলিয়া নিজে মদীনায় উপস্থিত হইলেন। কথা ছিল, ইব্রাহীম যখন যথেষ্ট পরিমাণে লোকবল সংগ্রহ করিয়াছেন বলিয়া সংবাদ দিবেন তখনই উভয় ভ্রাতা একযোগে বসরা ও মদীনা হইতে মনসুরের রাজ্যচ্যুতির ফরমান যারী করিবেন। এই যুক্তি কার্যকরী হইলে হয়ত আব্বাসীয় রাজত্বের অবসান ঘটিতেও পারিত। কারণ আব্বাসীয়গণ যেভাবে খিলাফত হস্তগত করিয়াছিলেন তাহা লইয়া লোকের ভিতর কানাকানি হইত। কিন্তু ঘটনার স্রোত বিপরীত দিকে চলিল। নাফসে জাকীয়াকে পাইয়া মদীনায় তাঁহার ভক্তেরা এমনই মাতিয়া গেল যে, চতুর্দিকে তাঁহার ইজ্জতের জন্য যুদ্ধের সাজ রব পড়িয়া গেল। কুফায়ও এ সংবাদ প্রচারিত হইল। ইহার পর ফরমান প্রচারে বিলম্ব করিলে ইমামকে হয়ত তাহার পূর্বেই মনসুরের সৈন্য কর্তৃক বন্দী হইতে হইত। এই অবস্থায় ইব্রাহীমের প্রস্তুতির পূর্বেই মদীনায় নাফসে জাকীয়াকে বাধ্য হইয়া মনসুরের বিরুদ্ধে তাঁহার ঘোষণা বাণী প্রচার করিতে হইল। ফলে মনসুর তাঁহাদিগকে একের পর অন্য, এইভাবে আক্রমণের সুবিধা পাইলেন। মদীনায় নাফসে জাকীয়ার সমর্থন এত জোরাল হইয়াছিল যে, প্রথম দিকে সর্বত্র তাঁহার জয় জয়কার চলিতে লাগিল। মদীনায় নিয়োজিত মনসুরের প্রতিনিধি ধৃত ও বন্দী হইল। অল্প কালের ভিতরই সমস্ত হিজায ও ইয়েন ইমাম মুহম্মদ নাফসে জাকীয়াকে মুসলমানদের খলীফা বলিয়া স্বীকার করিয়া লইল।

শরীয়তের প্রখ্যাতবিধানদাতা ইমাম আবু হানিফা এবং ইমাম আব্দুল মালিক নাফসে জাকীয়ার খিলাফৎ-দাবীকে সমর্থন করিয়া রায় প্রদান করিলেন। তাহাতে এই আন্দোলন শরীয়ৎ ভিত্তিক হইয়া পড়িল। আন্দোলনের এই প্রকার অপ্রত্যাশিত পরিণতি দেখিয়া মনসুর শঙ্কিত হইলেন এবং তাঁহার চিরাচরিত রীতি অনুযায়ী প্রথমতঃ কুটনীতির আশ্রয় লইলেন। তিনি ইমাম মুহম্মদকে সবিনয়ে পত্র লিখিয়া তাহাতে তাঁহাকে সম্পূর্ণ নিরাপত্তা দানের প্রতিশ্রুতি দিলেন এবং যেখানে খুশী সেইখানে বাসের অনুমতি দিলেন। ইহা ছাড়া, তাঁহাকে মোটা রকমের মোশাহেরো এবং তাঁহার আত্মীয়-স্বজনদের জন্য নানাপ্রকার সুযোগ-সুবিধা দানের ওয়াদা করিলেন। আর এই সকলের পরিবর্তে তাঁকে রাজনীতি হইতে সরিয়া দাঁড়াইতে বলিলেন। ইমাম তখন জনগণের সমর্থনে যথেষ্ট শক্তি সঞ্চয় করিয়াছেন। তিনি উত্তরে লিখিলেন, ইয়া মনসুর, ক্ষমা ও অনুগ্রহ বিতরণ করা, না করা এতো আমারই ইখতিয়ার। কারণ, ন্যায়তঃ ও ধর্মতঃ আমিই খিলাফতের অধিকারী। তবে আমি জানিতে চাই, তুমি যে নিরাপত্তা দানের প্রস্তাব করিয়াছ তাহা কি সেই প্রকারের নিরাপত্তা যাহা প্রভুভক্ত আবু মুসলিমকে, তোমার চাচা আব্দুল্লা'কে এবং তোমাদের আশ্রিত ইয়াযিদ বিন হোবায়রাকে দেওয়া হইয়াছিল?

এখানে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, পারস্যের বিপ্লবী নেতা আবু মুসলিই মূলতঃ আব্বাসীয় সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। অথচ আল মনসুর খলীফা হইবার পর ঈর্ষাপরায়ণ লোকদের মন্ত্রণা শুনিয়া সন্দেহ করিলেন; আবু মুসলিম খোরাসানে স্বাধীন পারস্য সাম্রাজ্য স্থাপনের চেষ্টায় আছেন। তাঁহার অসাধারণ প্রতিপত্তি ও কিঞ্চিৎ অবাধ্যতার ভাব লক্ষ্য করিয়া খলীফা শঙ্কিত হইয়াছিলেন। অনিশ্চিত সন্দেহের বশবর্তী হইয়া মনসুর তাঁহাকে সসম্মানে দরবারে আহ্বান করেন এবং নিজ মন্ত্রণাগৃহে দেহরক্ষী সৈন্যদিগকে হুকুম দিয়া তাঁহাকে হত্যা করেন।

আব্বাসীয় সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠায় মনসুরের চাচা আব্দুল্লাহ বিন আলীর দানও অসামান্য। জাব-তীরের ইতিহাস-প্রসিদ্ধ যুদ্ধে তিনি মাত্র ত্রিশ হাজার সৈন্য লইয়া মারোয়ানকে তাঁহার একলক্ষ্য বিশ হাজার সৈন্যসহ পরাস্ত করেন।

আরও বহু যুদ্ধে তিনি ভ্রাতুষ্পুত্র সাফফার জন্য বিজয় মাল্য আনিয়া দিয়াছেন এবং তাঁহার পথ নিষ্কণ্টক করার জন্য উমাইয়াদিগকে নির্মূল করিয়াছিলেন। সাফফা'র মৃত্যুর পর তিনি স্বাভাবিক ভাবেই আশা করিয়াছিলেন, তিনিই খলীফা হইবেন। মনসুর ইহা জানিতে পারিয়া কৌশলে তাঁহাকে বন্দী করেন এবং লবণস্তূপের উপর নির্মিত এক প্রাসাদে সসম্মানে আটক রাখেন। বর্ষায় লবণ গলিয়া গেলে প্রাসাদ ধ্বসিয়া পড়ে এবং আব্দুল্লা'র মৃত্যু হয়।

ইয়াযিদ বিন হোবায়রা ছিলেন মরোয়ানের নিয়োজিত ইরাকের গভর্ণর। মারোয়ানের পতনের পর তিনি ওয়াছিদ শহরে পলাইয়া গিয়া স্বীয় স্বাধীনতা অক্ষুণ্ন রাখেন। মনসুর ও পারস্য-সেনাপতি হাসান বিন কাহ্‌তাবা ওয়াছিদ দুর্গ অবরোধ করেন। এগার মাস নগর রক্ষা করার পরও যখন উমাইয়াদের উত্থানের আর কোন লক্ষণ দেখা গেল না, তখন হোবায়রা আত্মসমর্পন করার প্রস্তাব করেন এই শর্তে যে, তাঁহার নিজের, তাঁহার পরিবার বর্গের এবং তাঁহার অনুচরদের জীবন ও ব্যক্তিগত সম্পত্তির উপর হস্তক্ষেপ করা হইবে না। মনসুর এই শর্ত স্বীকার করিয়া নগর হস্তগত করেন। কিন্তু পরে তিনি সৈন্য পাঠাইয়া আশ্রিত হোবায়রা ও তাঁহার পুত্রগণকে তাঁহাদের নিজগৃহে হত্যা করান। তাঁহার কৈফিয়ৎ ছিল এই যে, খলীফা আবুল আব্বাস তাঁহার অঙ্গীকৃত উক্ত নিরাপত্তার শর্ত মনযুর করেন নাই।

মুহম্মদ নাফসে জাকীয়ার উপরোক্ত পত্র কুফায় পৌছিলে মনসুরের ক্রোধের সীমা রহিল না। তাঁহার সর্বাঙ্গে যেন বৃশ্চিক দংশের জ্বালা ছড়াইয়া পড়িল। নিজ চরিত্রের কলঙ্কিত অধ্যায়গুলির এই প্রকার স্পষ্ট উল্লেখ মনসুরের মর্মে গিয়া বিঁধিয়াছিল। তিনি যতদূর সাধ্য কড়া ভাষায় ইহার এক জবাব লিখিলেন এবং সেই পত্রে আব্বাসিয়াগণ যে ন্যায়তঃ অধিকারী, যুক্তিতর্ক দ্বারা তাহা প্রমাণিত করার চেষ্টা করিলেন। তিনি নিজেই যে এক সময়ে নাফসে জাকীয়ার নিকট বায়াৎ হইয়া নতমস্তক হইয়াছিলেন তাহা সতর্কতার সহিত চাপিয়া গেলেন। তাঁহার যুক্তির সারমর্ম ছিল এই,- যেহেতু রসূলুল্লাহ (দঃ) কোনও পুত্র-সন্তান রাখিয়া যান নাই এবং যেহেতু তাঁহার কন্যা, নারী বিধায়,

খিলাফৎ ব্যাপারে তাঁহার ওয়ারীশ হইতে পারেন না, সেই জন্য খিলাফৎ ফাতিমার সন্তানগণের পরিবর্তে রসূলুল্লাহ (দঃ) চাচা হযরত আব্বাসে গিয়া বর্তিয়াছে। মনসুর শুধু এই জবাব লিখিয়াই নিস্তর হইলেন না; সঙ্গে সঙ্গে নিজ ভ্রাতুষ্পুত্র শাহযাদা ঈসাকে এক বৃহৎ সৈন্যদলসহ মদীনায় পাঠাইলেন, নাফসে জাকীয়ার অস্তিত্ব দুনিয়া হইতে মিটাইয়া দিতে।

এই অবস্থায় মনসুরের সৈন্যবাহিনীর সহিত ইমামের যুদ্ধ অনিবার্য হইয়া উঠিল। সদাশয় ইমাম স্বীয় সৈন্যগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎসগণ, তোমরা ইচ্ছা করিলে ইসলামের জয়যাত্রার জন্য আমার সঙ্গে থাকিয়া এই যুদ্ধে শরীক হইতে এবং পূণ্য অর্জন করিতে পার। আর সেরূপ ইচ্ছা না করিলে স্ব স্ব গৃহে ফিরিয়া যাইতে পার। এই কথার পর দলে দলে লোক নিজ নিজ গৃহের হিফাযতির অযুহাতে যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করিল। অবশিষ্ট মাত্র তিন শত সৈন্য লইয়া ইমাম আব্বাসীয় সৈন্যদের সম্মুখীন হইলেন। মদীনার যে সকল সম্ভ্রান্ত পরিবারের অভিভাবকেরা ইতিপূর্বে ইমাম মুহাম্মদকে নেতৃত্বে বরণ করিয়াছিলেন তাঁহাদেরই সন্তানেরা ছিলেন এই দলে। বীরপ্রসূ মদীনার এই সব বীর সন্তান মৃত্যু নিশ্চিত জানিয়াও কাপুরুষতার কলঙ্ক শিরে বহন করিতে রাজী হন নাই। এই তিন শত সৈন্যের সকলেই অমিত বিক্রমে যুদ্ধ করিয়া তাঁহাদের নেতার সহিত শহীদ হইলেন। নেতাকে ছাড়িয়া তাঁহাদের কেহই পশ্চাদমুখী হইলেন না, রক্ষাও পাইলেন না।

ইমাম মুহম্মদের অসময়ে মদীনায় আত্মপ্রকাশ ও এইভাবে মৃত্যুবরণ তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা ইব্রাহীমকে অতিশয় বিব্রত করিল। বসরায় তিনি এক বৃহৎ সৈন্যদল সংগ্রহে সমর্থ হইয়াছিলেন এবং প্রথম দিকে কয়েকটি সংঘর্ষে বেশ সাফল্যও লাভ করিয়াছিলেন। মনসুরের সৈন্যদল পুনঃ পুনঃ পরাজয় বরণ করায় অবস্থা সেখানে এমন দাঁড়াইয়াছিল যে, এক সময় মনসুর রাজধানী ত্যাগ করিয়া সরিয়া পড়িবার কথা চিন্তা করিতেছিলেন। কিন্তু আলীবংশীয় যোদ্ধাগণ চিরকালই ন্যায়নীতি অনুসরণ করিতেও পরাজিত শত্রুর প্রতি মহত্ত্ব দেখাতে গিয়া ঠকিয়াছেন। এবারও তাহাই হইল। ফোরাত নদীর

তীরে এক গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধে আব্বাসীয়দের বহু সৈন্য নিহত হওয়ায় তাহারা রণক্ষেত্র ছাড়িয়া পলায়ন করিতে থাকে। ইব্রাহীমের সৈন্যগণ তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন ও সংহার করিতে থাকে। কিন্তু ইব্রাহীম তাহাদিগকে বারণ করিলেন। সৈন্যরা থামিয়া গেল। শত্রুরা এই অবসরে নিজদিগকে গুছাইয়া লইল এবং আবার ফিরিয়া দাঁড়াইল। দুই পক্ষে পুনরায় তুমুল যুদ্ধ বাধিল। কিন্তু ইমাম পক্ষের সৈন্যদের পূর্বের উদ্দীপনা তখন নিভিয়া গিয়াছে। তাহারা আর সুবিধা করিতে পারিতেছিল না। ইতিমধ্যে একটি দূরাগত তীর আসিয়া ইমাম ইব্রাহীমের ললাট বিদ্ধ করিল। ইব্রাহীম রণক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করিলেন। তাঁহার সৈন্যরা কতক হতাহত হইল, কতক পলাইয়া আত্মরক্ষা করিল। আব্বাসিয়গণ ইব্রাহীমের মাথা কাটিয়া উহা সগর্বে খলীফা মনসুরের নিকট প্রেরণ করিল (১৪৫ হিঃ ৭৬২ খৃঃ)।

পরবর্তী নির্যাতন

এইবার নিশ্চিত মনে তাঁহার প্রতিহিংসা বৃত্তি চরিতার্থ করার সুযোগ লাভ করিলেন। তাঁহার প্রথম আক্রোশ নিপতিত হইল মদীনা ও বসরার উপর। বসরার বহু সম্ভ্রান্ত পরিবারের লোকেরা ইব্রাহীমকে সহায়তা করার অপরাধে ধৃত ও প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইল। তাঁহাদের বাড়ীঘর ধূলিস্মাৎ করা হইল, ফলের বাগান সমূহ কাটিয়া নিশ্চিহ্ন করা হইল এবং ভূসম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হইল। মদীনার বনি-হাসানদের এবং সেই সঙ্গে বনি-হুসায়েনদেরও সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হইল। নবীর শহর বলিয়া মদীনা এতদিন যে সকল বিশেষ সুবিধা ভোগ করিতেছিল সে সমস্তও বিলুপ্ত করা হইল। হুসায়েন বংশীয় ইমাম যাফর আস সাদিক কোনও দিনই কোনও রাজনৈতিক সংশ্রবে থাকিতেন না। তাঁহার সম্পত্তিও বাজেয়াপ্ত করা হইল। তিনি নিজের নির্দোষিতা দেখাইয়া তাঁহার সম্পত্তির বাজেয়াপ্তি হইতে রেহাই প্রার্থনা করিলে তাঁহাকে প্রাণদণ্ডের ভয় দেখান হইয়াছিল। ইমাম আবু হানিফাকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হইল। ইমাম আব্দুল মালিককে কঠিন বেত্রদণ্ডে দণ্ডিত করা হইল।

ইমামবংশের উল্লেখযোগ্য যাবতীয় লোককে ইতোমধ্যেই মনসুরের আদেশে মদীনা হইতে বহিষ্কৃত করা হইয়াছিল হোবায়রা দুর্গে আবদ্ধ বন্দীদিগের প্রতি এবার মনসুরের ক্রুদ্ধ দৃষ্টি প্রসারিত হইল। তাঁহাদের অনেককে সরাসরি মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হইল। অবশিষ্ট লোকদিগকে কারাগারে বিষবাষ্পের প্রভাবে ধীরে ধীরে মরিতে দেওয়া হইল। কিন্তু রাজরোষের এখানেই নিবৃত্তি হইল না। শহীদ ইব্রাহীমের কর্তিত মস্তক যখন মনসুরের নিকট পৌছিল, মনসুর উহা হোবায়রা দুর্গে ইব্রাহীমের বৃদ্ধ পিতা আব্দুল্লা'র নিকট পাঠাইয়া দিলেন, তাঁহার ভগ্ন হৃদয়ের কঠিন শেলাঘাত করিতে। ইবার জবাবে বৃদ্ধ আবদুল্লাহ যে কথা বলিয়াছিলেন তাহা ইতিহাসের বুকে স্মরণীয়

হইযা রহিয়াছে। তিনি দূতকে বলিয়াছিলেন,- তোমার প্রভুকে বলিও, আমাদের দুঃখের দিন তাঁহার সুখের দিনের মতই দ্রুত বহিয়া চলিয়াছে এবং আমরা উভয়ে শীঘ্রই সেই চিরস্থায়ী বিচারপতির সম্মুখেই উপনীত হইব। তিনি আমাদের উভয়ের বিচার করিবেন। রাজ্যসভার একজন প্রত্যক্ষদর্শী কর্তৃক বর্ণিত আছে, দূত যখন রাজসভায় ফিরিয়া গিয়া এই কথা মনসুরকে জানাইল সেই সময় মনসুরকে চূর্ণীকৃত দেখাইতেছিল যে, সেই ব্যক্তি জীবনে আর কোনও লোককে কখনও তেমন দেখেন নাই।

মনসুরের এই নৃশংসতার পর ইমামবংশ মদীনায় আর মাথা তুলিতে পারে নাই। ইহার বহুকাল পরে অবশ্য ফাতিমা-বংশীয় বীর সন্তানেরা মিশরে গিয়া সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু সে কথা পৃথক।

আর ঐতিহাসিকদের মতে মনসুরের ভিতর দুই প্রকার ব্যক্তিত্বের দ্বন্দ্ব ছিল। শাসক হিসাবে তিনি অতিশয় যোগ্য ছিলেন, কিন্তু ব্যক্তি হিসাবে তিনি ছিলেন অত্যন্ত নিষ্ঠুর, দাম্ভিক ও স্বার্থপর। সুনীতি ও দুর্নীতির এই বিচিত্র সমাবেশ তাঁহার বিস্ময়কর চরিত্রের এক বৈশিষ্ট্য। ইহা অস্বীকারের উপায় নাই যে, উমাইয়া খলীফা আবদুল মালিকের মতই আব্বাসীয় খলীফা আল মনসুর ছিলেন অত্যন্ত বিচক্ষণ ও কর্মঠ। তিনি প্রাদেশিক গভর্ণরদের হিসাবপত্র পর্যন্ত নিজে পরীক্ষা করিতেন। একদিকে দেখা যায়, ইমাম আবু হানিফার মত লোক, যিনি সে যুগের সর্বজনমান্য শাস্ত্রবেত্তা এবং মুসলিম জাহানে ইমামে আযম নামে পরিচিত, এহেন ব্যক্তিও, খিলাফত সম্পর্কে স্বাধীন মত ব্যক্ত করার অপরাধে মনসুরের হস্তে নিগৃহীত হইয়াছিলেন। অথচ রাজ্যের শাসন ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য মনসুর নিজে যে সমস্ত আইন ও বিধিনিষেধের প্রবর্তন করিয়া ছিলেন সেগুলির প্রতি তাঁহার নিষ্ঠা ছিল অবিচল। কথিত আছে, একদা তিনি মদীনায় অবস্থান কালে তথাকার কাজী, তাঁহার বিরুদ্ধে আনীত কোনও অভিযোগের জবাব দানের জন্য তাঁহাকে আদালতে আহ্বান করেন। দুর্দান্ত খলীফা কাজীর এই আহ্বান অমান্য না করিয়া আদালতে উপস্থিত হন এবং

তাঁহার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সম্পর্কে কৈফিয়ত প্রদান করেন। বিচারে খলীফার অর্থদণ্ড হয়। খলীফা বিনা আপত্তিতে সেই জরিমানা প্রদান করেন এবং নির্ভিক ও ন্যায় বিচারের জন্য কাজীকে একটি স্বর্ণ থলি পুরস্কার দেন।

উল্লেখ আছে, খলীফা মনসুরের নিজের নির্দেশ মত তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার জন্য একশতটি কবর খনন করা হইয়াছিল এবং উহার একটিতে তাঁহাকে গোপনে দাফন করা হয়, যাহাতে শত্রুপক্ষ সে কবর চিনিতে না পারে এবং নিজেরা উমাইয়াদের কবর খুঁড়িয়া যে নিষ্ঠুর খেলা খেলিয়াছেন, তাঁহার নিজের বেলায় তাহার পুনরাভিনয় না হইতে পারে বিচক্ষণ খলীফা এইভাবে মৃত্যুর পর মানুষের হাত হইতে নিজের মৃতদেহ রক্ষার সুব্যবস্থা করে, কিন্তু আল্লা'র হাত হইতে তাঁহার আত্মা নিষ্কৃতি পাইয়া ছিল কিনা কে বলিবে!

খলীফা মেহদী (৭৭৫–৮৫ খৃঃ)

একুশ বৎসর ব্যাপী মনসুরের ত্রাসের রাজত্বের অবসান হইলে তৎপুত্র মেহদী বাগদাদের সিংহাসনে আরোহণ করেন। মেহদীর চরিত্র ছিল পিতার বিপরীত। তিনি মনসুর কৃত অন্যায় সমূহের প্রতিকারের চেষ্টা করেন। ইমামবংশের যে সমস্ত ভূসম্পত্তি উপযুক্ত কারণ ছাড়াই মনসুর কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হইয়াছিল মেহদী সেগুলি স্বেচ্ছায় মালিকদিগকে ফিরাইয়া দেন। হিজরী ১৬১ সনে হজ্জ করিতে গিয়া তিনি হিজাযবাসীদের দুর্দশা স্বচক্ষে দেখিয়া করুণায় বিগলিত হন এবং তাহাদের ভিতর তিন কোটি দেহরাম (রৌপ্যমুদ্রা) বিতরণ করেন। একমাত্র মক্কা নগরীতেই তিনি গরীব–দুঃখীদের ভিতর দেড় লক্ষ পোশাক খয়রাত করিয়াছিলেন। মাত্র দশ বৎসর রাজত্বের পর এই মহানুভব খলীফা শিকারে গিয়া, তাঁহার ধাবমান অশ্বের পদস্খলন হওয়ার ফলে অশ্ব হইতে পড়িয়া আহত হন এবং প্রাণ হারান।

(খলীফা হাদী (৭৮৫–৮৬ খৃঃ)

অতঃপর মেহদীর জ্যেষ্ঠপুত্র অল্পবয়স্ক হাদী পিতৃ সিংহাসনে আরোহণ করেন। সিংহাসন লাভকরিয়াই হাদী ঔদ্ধত্যের পরিচয় দিতে থাকেন সকল দিক দিয়াই। নিজ মাতা ও কনিষ্ঠ ভ্রাতা হারুনর রশীদের উপরও তিনি দুর্ব্যবহার করিতে ছাড়েন নাই। প্রজাপুঞ্জের সুখশান্তি ছিল তাঁহার চিন্তার বাহিরে। সর্বদা নিজের সুবিদা ও স্ফূর্তির জন্য তিনি ব্যস্ত থাকিতেন। এই অবস্থার সুযোগে তাঁহার গভর্ণরগণ সাম্রাজ্যের সর্বত্র স্বেচ্ছাচারী ও অত্যাচারী হইয়া উঠেন। মদীনায় নিয়োজিত আব্বাসীয় গভর্ণর এমনই দুঃসাহসী হইয়া উঠেন যে, তিনি খোদ ইমামবংশের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের সহিতও অসম্মানসূচক ব্যবহার করিতে থাকেন। হাদীর সে দিকে ভ্রুক্ষেপ ছিল না।

একদা এই উদ্ধত গভর্ণর হাসান বংশীয় কতিপয় সম্মানিত ব্যক্তিকে মদ্যপানের মিথ্যা অভিযোগে অন্যায় ভাবে দণ্ডিত করেন। ইহাতে মদীনায় বিক্ষোভ হয় ও কিছুসংখ্যক লোক বিদ্রোহ করে। হুসায়েন নামক ইমাম হাসানের এক প্রপৌত্র এই বিদ্রোহের অধিনায়ক ছিলেন। এই সংবাদ পাইয়া দাম্ভিক খলীফা হাদী কঠোর হস্তে ইহার প্রতিবিধানকরেন। তার ফলে, শুধু ইমামবংশের লোকেরা নয়, তাঁহাদের সমর্থক বলিয়া কথিত মদীনার অন্যান্য বহু সম্মানিত নাগরিকও প্রাণ হারাইলেন (৭৮৫ খৃঃ)। সমস্ত মদীনা অঞ্চল এই অন্যায়ের ফলে আলোড়িত হইয়া উঠিল। তাহার পরিণাম আরও বিষময় হইল। সমগ্র শহর ব্যাপী নির্বিচারে ধরপাকড় ও অত্যাচার চলিতে লাগিল। কাহারও ধনপ্রাণ আর নিরাপদ রহিল না।

ইদ্রিসী রাজ্যের প্রতিষ্ঠা

এই বিশৃঙ্খল অবস্থার ভিতর ইদ্রিস নামক হাসান-বংশীয় এক বীর যুবক চতুর্দিকে কড়া পাহারার ভিতরও কোনও মতে আত্মগোপন করিয়া মদীনা হইতে নিষ্ক্রান্ত হন এবং মুসাফির অবস্থায় নানাদেশ পর্যটন করার পর উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকায় বার্বারী নামক প্রদেশে উপনীত হন। এই পলাতক যুবক ছিলেন মদীনার বিদ্রোহী-নেতা হুসায়েনের চাচাতো ভাই। বার্বারীদেশে তিনি আশ্রয় লাভ করিলেন। এই বার্বারী দেশের পশ্চিমাংশের নাম মরক্কো। এই অঞ্চলটিতে ইতিহাস প্রসিদ্ধ ম্যুর জাতির বাস। বার্বার ও ম্যুরগণ শিক্ষাদীক্ষায় উন্নত ছিল না, কিন্তু অত্যন্ত সাহসী ছিল। তাহারা ইদ্রিসের দীর্ঘ অবয়ব ও উজ্জ্বল কান্তি দর্শনে বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া ছিল এবং তাঁহাকে দৈবশক্তি সম্পন্ন কোনও অসাধারণ মানুষ মনে করিয়া সহজেই তাঁহার বশীভূত হইয়া পড়িয়াছিল। ইদ্রিসের শুধু ইমামবংশসুলভ আকৃতিক বৈশিষ্ট্যই ছিল না, তাঁহার ব্যবহার ছিল উদার এবং দৈহিক গঠনও ছিল বীরত্ব ব্যঞ্জক। দলের পর দল ম্যুর ও বার্বারগণ তাঁহার পতাকা তলে সমবেত হইতে লাগিল। তিনি ইহাদের সাহায্যে মরক্কোতে এক নূতন স্বাধীন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিলেন (৭৮৭ খৃঃ)। আফ্রিকা মহাদেশের প্রান্তিক অঞ্চলে অবস্থিত এই দূরতম প্রদেশটিকে "মাগরিব উল আকসা" বলা হইত। ইদ্রিসের সুশাসন ও সুব্যবস্থার ফলে এখানকার এই নবপ্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র দীর্ঘস্থায়ী ও সমৃদ্ধিসম্পন্ন হইয়াছিল। বাগদাদের খলীফাদের ক্রূর হস্ত এত দূরে ইহার বিরুদ্ধে কিছু করিয়া উঠিতে পারে নাই। ইহা নিজ শক্তিতে সিংহাসনের স্বাধীনতা সংরক্ষণে সমর্থ হইয়াছিল।

ইদ্রিস ও তাঁহার বংশধরদের উন্নত আদর্শ এই দেশকে শুধু শক্তিশালী করে নাই, শিক্ষাদীক্ষা ও সভ্যতার দিক দিয়াও যথেষ্ট উন্নত করিয়াছিল। ইদ্রিস রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন ফেজ নামক স্থানে। ১৩৫ বৎসর পরে, হিজরী ৩০৯ সনে (খৃষ্টীয় ৯২২ সন) মিশরীয় খলীফার অধীনস্থ মিকসানার

ফাতেমীয় গভর্ণর এই বংশের শেষ নৃপতিকে রাজ্যচ্যুত করিয়া ফেজ হইতে বিতাড়িত করেন। এইভাবে মূল রাজধানী ফেজে ইদ্রিসীয় শাসনের অবসান ঘটে, কিন্তু প্রদেশের দূরবর্তী অংশ সমূহে ইদ্রিস বংশীয় সামন্ত রাজগণ আরও পঞ্চাশ বৎসর মিশরের ফাতেমীয় খলীফাদের আধিপত্য অস্বীকার করিয়া নিজেদের স্বাধীনতা অক্ষুন্ন রাখিয়াছিলেন।

ষোড়শ অধ্যায়

খলীফা হারুণর রশীদ

(৭৮৬-৮০৯ খৃঃ)

হুসায়েনী শাখার ইমামদের ভাগ্য বিপর্যয়

৭৮৬ খৃষ্টাব্দে হাদীর মৃত্যু হইলে তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা হারুণ বাগদাদের সিংহাসনে আরোহণ করেন। খলীফা হারুণ-অর রশীদ ও তৎপুত্র মামুনের শাসনকালকে আব্বাসীয় শাসনের স্বর্ণযুগ বলা হয়। এই যুগে জ্ঞান বিজ্ঞান, শিল্পকলা ও কাব্য-সাহিত্যের এত উৎকর্ষ সাধিত হয় যে, রাজধানী বাগদাদ নগরী তৎকালীন বিশ্বের উজ্জ্বলতম আলোক কেন্দ্রে পরিণত হয়। আরব্য উপন্যাসের অবিস্মরণীয় নায়ক ও 'রূপকথার রাজা' হারুণ-অর-রশীদকে দূর অতীতের কোনও উপাখ্যানী চরিত্র (Legendary Figure) বলিয়া মনে হয়। আসলে তিনি 'রূপকথার রাজা' ছিলেন না, মায়াপুরীর রাজকুমারও ছিলেন না। তাঁহার কর্মময় ও বীর্যবন্ত জীবন ছিল ইতিহাসের এক পরম বিস্ময়ের বস্তু। যৌবনকাল হইতে মৃত্যু পর্যন্ত তাঁহার জীবনে অধিকাংশ সময় কাটে যুদ্ধ শিবিরে। রাজধানীতে আরামে বসিয়া বিলাসিতার ক্রোড়ে গা ঢালিয়া দেওয়া অথবা রঙ্গমঞ্চের অপ্সরাদের নৃত্যগীত উপভোগ করার সুযোগ তাঁহার জীবনে খুব কমই ঘটিয়াছে। দিনান্তে কর্ম-ক্লান্ত খলীফা কখনও কখনও রজনীর অবকাশে পারিষদদের সহিত খোশগল্প অথবা কাব্যচর্চা করিয়া গ্লানি দূর করিতেন, কখনও বা হেরেম নৃত্যগীত ও আমোদ উৎসবে কিছুক্ষণ চিত্তবিনোদন করিতেন, কিন্তু তাহাতে তাঁহার কর্তব্য-কর্মে কখনও শৈথিল্য

আসিত না, বরং প্রভাতে নূতন উদ্যমে রাজকিয় কার্যে মনোনিবেশ করিতে পারিতেন। তিনি ছিলেন রাজসভায় পরম জ্ঞানী, জনসমাবেশে শ্রেষ্ঠ বাগ্মী, যুদ্ধক্ষেত্রে কষ্টসহিষ্ণু ও বিচক্ষণ সেনানায়ক এবং মন্ত্রণা শিবিরে প্রাজ্ঞ রাজনীতিক। শাসন কার্যেও তিনি ছিলেন পৃথিবীর প্রথম শ্রেণীর শাসকদের ভিতর অন্যতম।

ধর্ম ও ইসলামী শরীয়তের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা ছিল অপরিসীম। জীবনে তিনি নয় বার হজ করিয়াছেন। উষ্ট্রপৃষ্ঠে সাধারণ হাজীর মত ইরাক ও হিযাজের দুস্তর মরুভূমি অতিক্রম করিয়াছেন। আরাফাতের ময়দানে তিনি এহরামের সীমিত বস্ত্রে দীনাতিদীনের ন্যায়, পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান হইতে আগত লক্ষ লক্ষ সহযাত্রীর সহিত একত্রে মিলিত হইয়া তাহাদিগকে উদ্দীপিত করিয়াছেন। তাঁহার পত্নী যোবায়দা বেগমও ছিলেন পূণ্যশীলা। ৮০২ খৃষ্টাব্দে তিনি যখন স্বামীর সঙ্গে মক্কায় গিয়া হজ করেন সেই সময় মক্কার অধিবাসীদের দারুণ জলকষ্ট স্বচক্ষে দেখিয়া দেড় লক্ষ দিনার ব্যয়ে দূরবর্তী এক পার্বত্য ঝর্ণা হইতে আরাফাত ও মক্কা পর্যন্ত এক পানির নহর কাটাইয়া দেন। উহা "যোবায়দা খাতুনের নহর" নামে পরিচিত। শুনা যায়, এখনও সেই নহরের ধারা আরাফাতের ময়দান পর্যন্ত প্রবাহিত আছে এবং প্রতি সন হজ্জের মৌসুমে হাজিগণ উহার পানি ব্যবহার করিয়া অশেষ উপকৃত হন।

রাজধানীতে থাকাকালীন খলীফা গভীর নিশীথে শয্যাত্যাগ করিয়া গোপনে বাহির হইয়া পড়িতেন এবং হযরত ওমরের ন্যায় ছদ্মবেশে নগরীর পথে ঘুরিয়া দুঃস্থ ও বিপন্নদের সাহায্য করিতেন। তুর্কীস্তান হইতে মিশর পর্যন্ত বিস্তৃত তাঁহার বিশাল সাম্রাজ্যের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত তিনি একাধিকবার পরিভ্রমণ করিয়াছেন এবং প্রজাপুঞ্জের অবস্থা স্বচক্ষে দেখিয়া আবশ্যক মত প্রতিবিধানের চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি কখন কোন স্থানে উপনীত হইবেন, কেহ জানিত না, এমন কি তাঁহার নিজের কর্মচারীরাও না। তাঁহার এই মায়াবী চরিত্র প্রজাদের ভিতর বিস্ময়ের সৃষ্টি করিয়াছিল। তাঁহার কীর্তিগাথা প্রবাদে পরিণত হইয়াছিল এবং রূপকথার কাহিনীর মত সে-সমস্ত প্রজাবৃন্দের মুখে মুখে ফিরিত। রাজ্যের সর্বত্র অসংখ্য বিদ্যালয়, হাসপাতাল,

পান্থনিবাস ও জলাশয় প্রতিষ্ঠা দ্বারা তিনি জনগণের জীবন সুখময়, সমৃদ্ধ ও উন্নত করিয়াছিলেন। তাঁহার সময় বাগদাদের রাজসভা অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণ ছিল। তিনি নিজেও চাকচিক্যশালী ও মূল্যবান পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া দরবারে আসিতেন। তাঁহার ধারণা ছিল, শাসক যদি শাসিতের দৃষ্টিতে মহিমান্বিত ও বিস্ময়জনক মনে না হয় তাহা হইলে শাসিতের মনে ভয় ভক্তি ও শ্রদ্ধা উদ্রেক হয় না। কিন্তু তাহার এই সকল অন্তরালে তাঁহার দরদী মনটি থাকিয়া সর্বদা জনগণের কল্যাণ সাধনের জন্য উন্মুখ। তাঁহার নিজের আত্মসুখ কোনও দিন তাঁহার কাম্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে বলিয়া মনে হয় না।

এহেন প্রাণ মহা ব্যক্তি দীর্ঘকাল শান্তিতে শাসন যন্ত্র চালাইতে পারিলে মানুষের অশেষ কল্যাণ সাধিত হইত সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী বাইজেনটাইন সম্রাট নাইসিফোরাস তাঁহাকে সে শান্তি বা বিশ্রাম দেন নাই। আজীবন যুদ্ধ শিবরে কষ্ট সহ্য করিতে করিতে অকালে তাঁহার জীবনাবসান হয়। তিনি যখন যুবরাজ, সেই সময় বাইজেনটাইন সম্রাজ্ঞী আইরীণের বিরুদ্ধে তাঁহাকে অস্ত্রধারণ করিতে হয়। আইরীণ যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া সন্ধি ভিক্ষা করিতে বাধ্য হন এবং বিপুল উপঢৌকন পাঠাইয়া ও নিয়মিত বার্ষিক কর দিতে প্রতিশ্রুতি দিয়া নিষ্কৃতি লাভ করেন। আইরীণের পরবর্তী শাসক নাইসিফোরাস ছিলেন এক চরিত্রহীন সৈনিক পুরুষ। তিনি ৮০২ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে বসিয়াই বাগদাদের খলীফাকে এক ঔদ্ধত্যপূর্ণ পত্র লিখেন। তাহাতে তিনি লিখিয়াছিলেন,- রাণী আইরীণের রমণী-সুলভ দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করিয়া খলীফা তাঁহার নিকট যে সমস্ত উপঢৌকন ও কর আদায় করিয়াছেন তাহা এই দূত মারফৎ অবিলম্বে ফেরৎ পাঠাইতে হইবে। অন্যথা তরবারি দ্বারা এ প্রশ্নের মীমাংসা হইবে। এই সময় হারুণ বাগদাদের সিংহাসনে বসিয়াছেন। তিনি দূত মারফৎ পত্র পাইয়া অগ্নিবৎ জ্বলিয়া উঠিলেন এবং উক্ত পত্রের পৃষ্ঠেই লিখিয়া দিলেন- "আমীরুল মু'মেনীন, হারুন হইতে রোমান কুক্কুর নাইসিফোরাসের প্রতি- তোমার চিঠি অবশ্য পড়িয়াছি। ইহার উত্তর তুমি কানে শুনিবে না চোখে দেখিতে পাইবে।"

পরদিন প্রত্যুষে মুসলিম বাহিনী স্বয়ং খলীফার নেতৃত্বে রাজধানী ত্যাগ করিল। বাগদাদ হইতে এশিয়া মাইনর সুদীর্ঘ পথ। এই পথের কোথাও খলীফা বিশ্রাম গ্রহণ করিলেন না। একেবারে এশিয়া মাইনরের প্রথম গ্রীক ঘাঁটি হিরাক্লিয়ার উপকণ্ঠে গিয়া শিবির স্থাপন করিলেন। নাইসিফোরাস যখন কনষ্টান্টিনোপলে বসিয়া খলীফার পত্র পাঠ করিতেছেন, ততক্ষণে বসফোরাসের এপারে মুসলিমদের রণ দামামা বাজিয়া উঠিল। খলীফা এত শীঘ্র সসৈন্যে একেবারে এশিয়া মাইনরের অভ্যন্তরে আসিয়া উপনীত হইবেন, নাইসিফোরাস ইহা কল্পনাও করিতে পারেন নাই। তিনি সম্যক প্রস্তুত হইবার সময় পাইলেন না। উপস্থিত সৈন্য–সামন্ত সঙ্গে লইয়াই দ্রুত অগ্রসর হইলেন এবং খলীফার গতিরোধ করিয়া দাঁড়াইলেন। হিরাক্লিয়ার অদূরে উভয় পক্ষের তুমুল যুদ্ধ হইল। যুদ্ধে নাইসিফোরাস পরাস্ত হইলেন এবং সন্ধিপ্রার্থী হইলেন। তিনি পূর্বাপেক্ষা বর্ধিত হারে কর দিতে স্বীকৃত হওয়ায় খলীফা তাঁহার প্রার্থনা মঞ্জুর করিলেন। নাইসিফোরাসের অহঙ্কার চূর্ণ করিয়া খলীফা আব্বাসীয়দের দ্বিতীয় রাজধানী রাক্কায় চলিয়া গেলেন। রাক্কা উত্তর ইরাকে অবস্থিত। এশিয়া মাইনর হইতে উহার দূরত্ব অনেক। এদিকে শীতঋতু নামিয়া আসিল। প্রচণ্ড হীম ও বরফ পাতে এশিয়া মাইনরের পথগুলি দুর্গম হইয়া উঠিল; নাইসিফোরাস মনে করিলেন, এই দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার ভিতর প্রাচ্যদেশীয় বিলাসী ও আরামপ্রিয় খলীফা এশিয়া মাইনরে কিছুতেই ফিরিয়া আসিবেন না। এই বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়া তিনি খলীফার সহিত সন্ধিভঙ্গ করিলেন। এবং তাঁহাকে প্রতিশ্রুত কর দিতে অস্বীকার করিলেন। কিন্তু আর্বাচীন রোমক সম্রাট যে, খলীফাকে সম্যক চিনিতে পারেন নাই তাহা বুঝিতে তাঁহার বিলম্ব হইল না। হারুণর রশীদ নাইসিফোরাসের এই শঠতার সংবাদ পাইবা মাত্র পুনরায় যুদ্ধযাত্রা করিলেন এবং সেই দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার ভিতর সসৈন্যে এশিয়া মাইনরের দুর্লংঘ্য পাহাড়–প্রাচীর টরাস গিরিমালা অতিক্রম করিলেন। প্রচণ্ড শীত, অবিশ্রান্ত বরফপাত, ভূমধ্যসাগরীয় হিমশীতল ঝন্‌ঝা, কোনও কিছুই এই বীর্যবন্ত খলীফার অগ্রগতিতে বাধা সৃষ্টি করিতে পারিল না। তুষার

স্থান টরাসের তুঙ্গশৃঙ্গ দলিত করিয়া খলীফা এশিয়া মাইনরে অবতীর্ণ হইলেন এবং ঝটিকার বেগে সমস্ত প্রতিরোধ দলিত মথিত করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন বিস্ময়-বিহ্বল ও হতচকিত নাইসিফোরাস প্রাণপণে তাঁহাকে বাধা দানের চেষ্টা করিলেন। উভয় পক্ষের ভিতর আবার তুমুল সংগ্রাম হইল। গ্রীকগণ আবার তরবারির তেজ সহ্য করিতে না পারিয়া ইতস্ততঃ ছুটিয়া পালাইতে লাগিল। নাইসিফোরাস নিজে শরীরের তিনস্থানে তরবারির আঘাতে আহত হইয়াছিলেন। চল্লিশ হাজার গ্রীকসৈন্যের মৃতদেহ রণক্ষেত্রে ফেলিয়া নির্লজ্জ নাইসিফোরাস পশ্চাতে হটিয়া গেলেন এবং সন্ধিপ্রার্থী হইলেন। মহানুভব খলীফা আবার তাঁহার প্রার্থণা মঞ্জুর করিলেন এই শর্তে যে, নাইসিফোরাস শুধু বর্ধিত হারে বার্ষিক করই দিবেন না, রাজ পরিবারের প্রত্যেক প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তির বাবদ মাথাপিছু আয়কর প্রদান করিবেন।

রোমক সাম্রাজ্যের সহিত বাগদাদ খলীফার ইহাই শেষ যুদ্ধ নয়। বার বার নাইসিফোরাস সুযোগ মত সন্ধি ভঙ্গ করেন এবং প্রতিবারই খলীফা স্বয়ং যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়া তাঁহাকে সন্ধি ভিক্ষা করিতে বাধ্য করেন। কিন্তু তাঁহার শেষ বিদ্রোহের সময় খলীফা খোরাসানে আরও এক বিদ্রোহ দমনে ব্যাপৃত থাকায় ঐ বিদ্রোহ আর দমন করার সুযোগ মিলে নাই।

খলীফা যখন এশিয়া মাইনরে যুদ্ধলিপ্ত ছিলেন সেই সময় তাঁহার দীর্ঘ অনুপস্থিতির সুযোগে খোরাসানে এক ভয়াবহ বিদ্রোহ বিস্তার লাভ করিয়াছিল। খলীফা সেই সংবাদ পাইয়া এশিয়া মাইনর হইতে পারস্যের অভিমুখে যুদ্ধযাত্রা করেন। কিন্তু দীর্ঘকাল শিবিরবাস ও অনিয়মে তাঁহার স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। তিনি পথিমধ্যে অসুস্থ হইয়া পড়েন এবং যুদ্ধশিবিরেই প্রাণত্যাগ করেন (৮০৯ খৃঃ)। তুশ নগরে তাঁহার মৃতদেহ সমাহিত হয়। পৃথিবীর এক শ্রেষ্ঠ নরপতির গৌরবোজ্জ্বল জীবনের এইভাবে অকালে পরিসমাপ্তি ঘটে। তাঁহার কীর্তিগাথা প্রবাদ বাক্যের ন্যায় পৃথিবীর সর্বত্র ছড়াইয়া পড়ে।

ইউরোপের তদানীন্তন সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী সম্রাট শার্লিমেন তাঁহার খ্যাতিতে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করেন।(১)

---

(১) কথিত আছে শার্লিমেন তাঁহার বন্ধুত্বের নিদর্শন স্বরূপ খলীফাকে অনেক মূল্যবান উপহার প্রদান করেন। খলীফাও প্রতিদানে তাঁহাকে অন্যান্য মূল্যবান দ্রব্যের সহিত একটি আশ্চর্য রকমের ঘড়ি উপহার দেন যাহা, আরব জাতির বৈজ্ঞানিক উৎকর্ষের প্রতীক ছিল। ঘড়িটি নাকি বাজিবার সময় হইলে, ঐ সময় যতটা বাজা দরকার, উহার ভিতর একটি লৌহ বর্তুল একটি পিতলের থালার উপর আপনা-আপনি ঠিক ততবার আঘাত করিত এবং ততজন অশ্বারোহী পুতুল উহার ভিতরের কোঠা হইতে বাহিরের কোঠায় আসিয়া দেখা দিয়া আবার ভিতরে চলিয়া যাইত। —Vide a Short History of the Saracens, by Ameer Ali, p. 24-48.

হুসায়েন বংশীয় ইমাম
মু'সা আল কাযিমের নির্বাসন

চাঁদে কলঙ্ক থাকে, কুসুমে কীট থাকে। খলীফা হারুণর রশীদের সুনির্মল যশোরাশিতেও কিঞ্চিৎ কালিমা লিপ্ত হইয়াছিল, ইমাম মু'সা আল কাযিমের প্রতি তাঁহার কঠোর আচরণের দরুন। ইমাম মু'সার পরিচয় অনাবশ্যক। শুধু এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, ৭৬৫ খৃষ্টাব্দে (১৪৮ হিঃ) শিয়া সমাজের গদীনেশীন ইমাম প্রখ্যাত যাফর আস সাদিকের ওফাৎ হইলে তদীয় শিষ্যদের ভিতর ইমামতীর প্রশ্ন লইয়া দ্বিমতের সৃষ্টি হয়। তিনি প্রথমে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র ইসমাইলকে ভাবী ইমাম রূপে মনোনয়ন প্রদান করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার জীবদ্দশাতেই ইসমাইলের মৃত্যু হওয়ায় তিনি পরে মতের পরিবর্তন করেন এবং তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র মু'সাকে তাঁহার গদীর উত্তরাধীকারী নির্বাচিত করেন। ইমাম যাফর পরলোক গমন করিলে তাঁহার বেশীর ভাগ শিষ্য ইমাম মু'সার শিষ্যত্ব স্বীকার করে, কিন্তু অবশিষ্ট একদল শিয়া ইমাম যাফরের প্রথম নির্বাচনের উপর জোর দিয়া মৃত ইসমাইলের নাবালক পুত্র মুহম্মদকে তাহাদের ইমাম রূপে গ্রহণ করে। এই দলকে "ইসমাইলী" সমপ্রদায় বলা হয়। ইহারা কিশোর মুহম্মদকে আদর করিয়া "আল হাবীব" বলিত। পক্ষান্তরে, মূলত শিয়াগণ তাহাদের ইমাম মু'সাকে দৈর্যশীলতার জন্য "আল কাযিম" বলিত। শিয়াদের মতে, এবং ইসমাইলীদের মতেও, হযরত রসূল (দঃ)-এর পর আর কোনও নবী জন্মগ্রহণ করিবেন না। ইমামগণই একের পর এক তাঁহার ধর্মের পতাকা বহন করিয়া চলিবেন কিয়ামৎ পর্যন্ত; এবং তাঁহারাই মুসলমানদের পথ প্রদর্শন করিতে থাকিবেন। এই ইমামদের ভিতর আবার প্রথম দ্বাদশ ইমাম বিশেষভাবে খ্যাত। পর পৃষ্ঠায় তাঁহাদের একটি তালিকা প্রদত্ত হইল।

দ্বাদশ ইমামের তালিকা
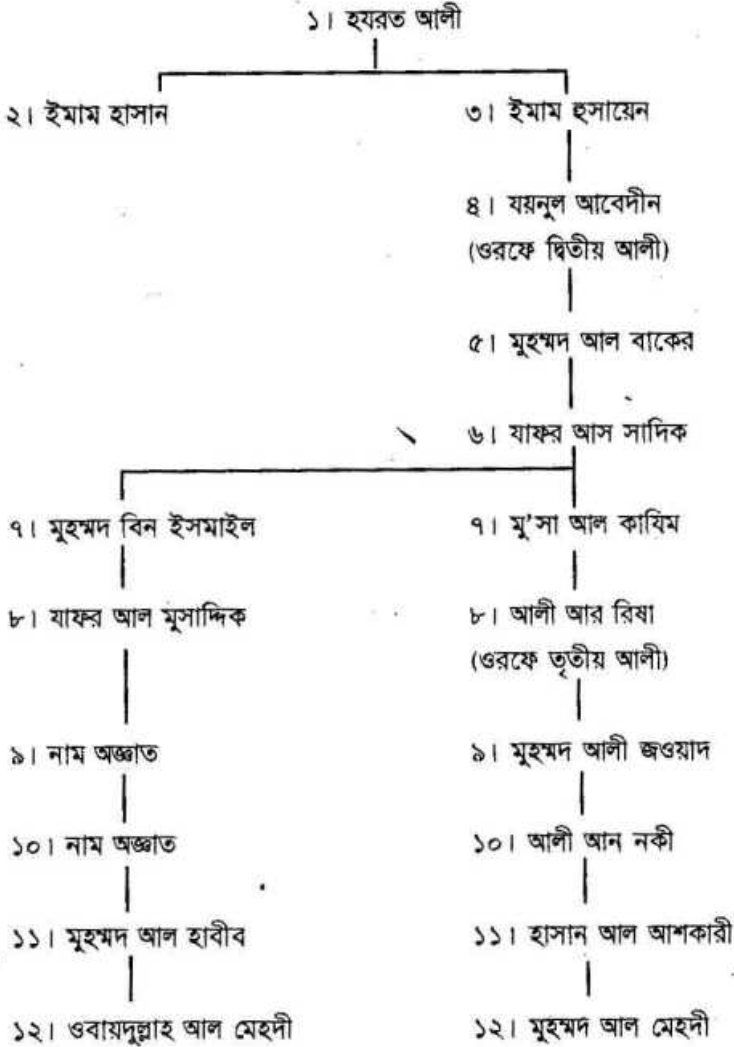
এখানে লক্ষ্যণীয় যে, ষষ্ঠ ইমাম যাফর আস সাদিকের পর ইমামতীর ধারা দ্বিধা-বিভক্ত হওয়ায় পরবর্তী ছয় ইমাম দুই সম্প্রদায়ের ভিতর বিভিন্ন হইয়াছে।

খলীফা হারুণর রশীদের আমলে মদীনায় ইমাম মু'সা আল কাযিমের সম্মান ও প্রতিপত্তি ছিল অসাধারণ। নাগরিকগণ তাঁহাকে এমনই শ্রদ্ধা করিত যে, তাঁহার নাম উচ্চারণ বে'আদবী মনে করিয়া তাঁহাকে শুধু "আল কাযিম" বলিয়া উল্লেখ করিত। আরব-পারস্যে লক্ষ লক্ষ শিয়া তাঁহার অঙ্গুরী হেলনে তাঁহার জন্য প্রাণ উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত ছিল। তাঁহার ব্যক্তিত্বের এই অসাধারণ প্রভাবই তাঁহার জীবনের কাল হইয়াছিল, যদিও রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে তিনি নির্লিপ্ত থাকিতেন। বাগদাদের রাজসভায় হিংসাতুর আব্বাসিয়গণ তাঁহার বিরুদ্ধে খলীফার নিকট বিরূপ সমালোচনা করিত। একবার খলীফা যখন হজ উপলক্ষে মদীনায় গমন করেন, তিনি নিজে অনুভব করিলেন, মদীনার যথার্থ রাজা ইমাম মু'সা তিনি নহেন। তাঁহার সম্বন্ধে পূর্ব হইতেই খলীফার কান ভারী ছিল। তিনি স্থির করিলেন, রাষ্ট্রের নিরাপত্তার জন্য ইমামকে তাঁহার অনুগত এই ভক্ত সমাজ হইতে দূরে রাখিতে হইবে। অন্যথা কবে এই ঘুমন্ত সিংহ হঠাৎ জাগ্রত হইবে; তখন তাঁহার প্রলয় হুঙ্কারে সিংহাসনের ভিত্তিমূল কাঁপিয়া উঠিবে। কিন্তু তিনি নিষ্ঠুরতায় তাঁহার পিতামহ মনসুরের মত আমানুষিক হইতে পারিতেন না। ইমামকে তিনি সঙ্গে করিয়া সসম্মানে বাগদাদে লইয়া গেলেন এবং সেখানে তাঁহার স্থায়ী ভাবে বাসের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। ইমাম তখন বৃদ্ধ হইয়াছেন। তাঁহাকে জীবনে আর তাঁহার প্রিয় জন্মভূমি মদীনায় ফিরিয়া আসিতে দেওয়া হয় নাই। বাগদাদের এক সম্ভ্রান্ত ইমামভক্ত মহিলা তাঁহাকে স্বগৃহে স্থান দিয়া তাঁহার সেবা-শুশ্রূষার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এইখানে নযরবন্দী অবস্থায় নির্বাসিত ইমামের বাকী জীবনের অবসান হয়। (৭৯৯ খৃঃ, হিঃ ১৮৩ সন) (১)

(১) A Short History of the Saracens, Ameer Ali, P. 243.

খলীফা আল মামুন (৮১৩-৩৩ খৃঃ)
(ইমামবংশকে মর্যাদা দান)

৮০৯ খৃষ্টাব্দে হারুণ অর রশীদ পরলোক গমণ করিলে তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র তরুণ বয়স্ক আমীন সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি ছিলেন পিতার অযোগ্য পুত্র। দিবারাত্রি আমোদ-আহ্লাদে মগ্ন থাকতেন। রাজকার্য চালাইতেন তাঁহার প্রধান উযীর। আমীনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও অপেক্ষাকৃত যোগ্যতর মামুন তখন পারস্যের অন্তর্গত খোরাসানের গভর্ণর ছিলেন। তাঁহার রাজধানী ছিল মার্ভে। মামুন যাহাতে কখনও সিংহাসন লাভ করিতে না পারেন এবং উযীরের নিজের প্রতিপত্তি বরাবর অক্ষুন্ন থাকে, এই অসদুদ্দেশ্যে প্রণোদিত হইয়া উক্ত উযীর নানারূপ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। বিলাসিতায় নিমজ্জিত আমীন এ সমস্তের কোনও খবর রাখিতেন না। কিন্তু মামুন সমস্তই জানিতে পারেন। বিভ্রান্ত ভ্রাতার নিকট ইহার কোনও প্রতীকার না পাইয়া মামুন অগত্যা বাগদাদ সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন এবং রাজধানী অধিকারের জন্য একদল সৈন্য প্রেরণ করিলেন। উভয় পক্ষে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হইল এবং সেই বিশৃঙ্খলার ভিতর এক পারসিক সৈন্যের হস্তে আমীন প্রাণ হারাইলেন। (৮১৩ খৃঃ) ভ্রাতার প্রাণ সংহার মামুনের অভিপ্রায় ছিল না। তিনি জানিতেন কুচক্রী উযীরের হস্তে আমীন কত অসহায়। মার্ভে ভ্রাতার মৃত্যু সংবাদ পৌছিলে মামুন ভ্রাতৃশোকে অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন। অতঃপর তিনি সিংহাসনের অধিকারী হইলেন, কিন্তু বাগদাদের প্রতি তাঁহার বিশেষ আকর্ষণ ছিল না। তিনি মার্ভে থাকিয়াই পাঁচ বৎসর সাম্রাজ্যের শাসন পরিচালনা করেন। ইরানের চির সবুজ দ্রাক্ষাকুঞ্জ এই সুপণ্ডিত ও ভাব-প্রবণ খলীফাকে মুগ্ধ করিয়া থাকিবে। বিশেষতঃ তাঁহার জননী ছিলেন ইরান দেশের রাজকুমারী। কাজেই ইরানের সহিত তাঁহার রক্তের যোগ ছিল।

দীর্ঘকাল আবু মুসলিমের দেশে বাস করিয়া মামুনের মনে বিশ্বাস জন্মিয়াছিল, আলী–বংশীয়েরাই মুসলিম জাহানের খিলাফতের ন্যায্য অধিকারী এবং আব্বাসীয়দের অধিকার জবরদস্তিমূলক। তিনি সিংহাসন আলীবংশীয়দিগকে ফিরাইয়া দিতে মনস্থ করেন এবং সেই উদ্দেশ্যে উক্ত বংশের তদানিন্তন গদীনেশীন ইমাম তৃতীয় আলী ইবনে মু'সাকে মার্ভে আহ্বান করেন। সেই সঙ্গে মামুন তাঁহাকে "আর রিযা" (সর্বাপেক্ষা পছন্দনীয়) উপাধী দিয়া সিংহাসনের পরবর্তী উত্তরাধিকারী হিসাবে মনোনয়ন প্রদান করেন (২০০ হিঃ) শুধু মনোনয়ন প্রদান নয়, সঙ্গে সঙ্গে মামুন এক ফরমান যারী করিলেন এই মর্মে যে, সরকারী কর্মচারিগণ অতঃপর আব্বাসীয়দের কালো পতাকা ও কালো ব্যাজের পরিবর্তে আলীবংশের প্রতীক সবুজ নিশান ও সবুজ ব্যাজ ধারণ করিবে।

নূতন খলীফার এই সমস্ত অদ্ভুত কাণ্ড বাগদাদে আব্বাসীয় বংশের যাবতীয় লোককে ক্ষিপ্ত করিয়া তুলিল। তাঁহারা খলীফার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিল। কথিত আছে, এই সময় রাজধানীতে যাহারা নিজদিগকে আব্বাসীয় বলিয়া পরিচয় দিত তাহাদের সংখ্যা স্ত্রী পুরুষ বালক–বালিকা লইয়া তেত্রিশ হাজার দাঁড়াইয়া ছিল। তাহাদের দলপতিগণ যুক্তি করিয়া ভূতপূর্ব মেহদীর ইব্রাহীম নামক এক পুত্রকে বাগদাদের সিংহাসনে বসাইলেন এবং মামুনের প্রতিনিধি কর্তৃক নিয়োজিত যাবতীয় কর্মচারীকে রাজধানী হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন।

ইমাম আলী আর রাযী কখনও সিংহাসনের প্রত্যাশী ছিলেন না। তিনি খলীফার ফরমান শুনিয়া বিস্মিত হইলেন এবং দ্রুত মদীনা হইতে মার্ভে চলিয়া গেলেন। তিনি খলীফাকে সসম্মানে তাঁহার ফরমান প্রত্যাহার করিতে এবং অবিলম্বে বাগদাদ গিয়া শাসনদণ্ড স্বহস্তে তুলিয়া লইতে অনুরোধ জানাইলেন। তাঁহার অনুপস্থিতিতে বাগদাদে ও উহার আশেপাশে বহু দূর ব্যাপিয়া কিরূপ অরাজকতা চলিতেছে এবং কর্মচারীরা কিভাবে যুলুম চালাইতে তাহা মর্মস্পর্শী ভাষায় বিবৃত করিলেন। খলীফা পূর্বে এ সমস্ত বৃত্তান্ত শুনেন নাই। তিনি বিস্মিত হইলেন এবং স্বীয় সেনাবাহিনীর প্রধানদিগকে এ সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলেন। তাঁহারাও খলীফার নিকট অনুরূপ বিবরণ পেশ করিলেন। তখন খলীফা আর কালবিলম্ব না করিয়া বাগদাদ যাত্রা করিলেন। তাঁহার বিস্ময়

লাগিল যে, এত সব ব্যাপার কিভাবে এতদিন তাঁহার নিকট গোপন রাখা হইয়াছে। এ মহদন্তঃকরণ ইমাম যদি তাঁহার চক্ষু খুলিয়া না দিতেন তাহা হইলে তাঁহার সাম্রাজ্য হস্তচ্যুত হইতে পারিত এবং তিনি রাজ্যময় এই যুলুম ও অবিচারের জন্য প্রত্যবায়ভাগী হইতেন। ইহা বুঝিতে পারিয়া খলীফা তাঁহার উপর অতিশয় কৃতজ্ঞ হইলেন এবং তাঁহাকে বিশ্বস্ত বন্ধু ও উপদেষ্টা রূপে সঙ্গে লইলেন।

বাগদাদের পথে খলীফা তুশ নগরে কাফেলা থামাইয়া পিতার কবর যিয়ারত করিলেন। কিন্তু এইখানে ইমাম রাযী অসন্থ হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। খলীফা ইহাতে অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন এবং ইমামকে তথায় সমাহিত করিয়া সমাধির উপর একটি সুন্দর মুসোলিয়াম প্রস্তুত করাইলেন। কালে উহা শিয়াদের একটি তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হয়।

মামুন বাগদগাদে অসিয়া উপনীত হইলে রাজধানীর সকল গণ্ডগোল সহজেই মিটিয়া গেল। তিনিও আত্মীয়দের অনুরোধে কর্মচারীদিগকে পুনরায় আব্বাসীয়দের কাল পতাকা ও কাল ব্যাজ ব্যবহারের অনুমতি দিলেন।

ইমাম রিযার দেহত্যাগের পর তদীয় পুত্র মুহম্মদ আল জওয়াদ তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন। ইঁহাদের ইমামতীর এবং বংশানুক্রমিক ধারা পঞ্চদশ আব্বাসীয় খলীফা মুতামীদের রাজত্বকালে, ৮৭০–৯২ খৃঃ) পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। মুতামীদের রাজত্বকালে ৮৭৮ খৃষ্টাব্দে এই বংশের ইমামতীর ধারা বিলুপ্ত হয়। সে দুঃখের কাহিনী পরে যথাস্থানে বর্ণিত হইবে।

খলীফা মামুনের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল উদার। তিনি মুক্তবুদ্ধি ও দর্শনের পক্ষপাতি ছিলেন। তাঁহার প্রশ্রয়ে মুতাযিলা মতবাদ অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠে। তাঁহার দরবারে কুশাগ্র বুদ্ধি আলিমদের ভিতর ধর্ম ও দর্শন সংক্রান্ত নানা বিতর্ক হইত। তিনি এই সকল বিতর্ক সভায় সভাপতিত্ব করিতেন এবং সে পদের যোগ্যতাও তাঁহার ছিল। তাঁহার রাজসভায় দার্শনিক আল ফারাবী,

গণিতবিদ আল খারেজমী এবং আরও বহু খ্যাতনামা পণ্ডিত ও বৈজ্ঞানিকের সমাবেশ হইয়াছিল। তিনি ইঁহাদের সকলের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি বিশ্বিজয়ী ছিলেন না, কিন্তু জ্ঞান-বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষ সাধিত হয় তাঁহার আমলে।

তাই ঐতিহাসিকগণ তাঁহার শাসনকালকে প্রখ্যাত রোমান সম্রাট অগাষ্টাস সীজারের যুগের সহিত তুলনা করিয়াছেন।

খলীফা মুতাসিম

(৮৩৩-৪২ খৃঃ)

ন্যায়নিষ্ঠ মামুন নিজের গুণবান পুত্র আব্বাস বর্তমান থাকিতেও কনিষ্ঠ ভ্রাতা মুতাসিমকে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী করিয়া যান। কারণ, তিনি নিজে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার স্থলে সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু মুতাসিম অভিজ্ঞ যোদ্ধা হইলেও দূরদর্শী রাজনৈতিক ছিলেন না। তিনি নিজের ব্যক্তিগত নিরাপত্তার জন্য পঞ্চাশ হাজার তুর্কী ক্রীতদাস দ্বারা একটি দেহরক্ষী বাহিনী গঠন করেন। ইহাদের সহিত নাগরিকদের বনি-বনাও হইত না। এজন্য তিনি বাগদাদ ত্যাগ করিয়া উত্তর ইরাকের সামাররা নামক স্থানে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। এইভাবে তিনি বাগদাদবাসীদের সহযোগিতা হইতে বঞ্চিত হন এবং তাঁহার তুর্কী ক্রীতদাসদের উপর নির্ভরশীল হইয়া পড়েন। ইহার ভাবীফল হয় মারাত্মক। এই তুর্কিগণ পরবর্তী কালে অসহায় খলীফাদের উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত তাহারাই আব্বাসীয় সাম্রাজ্যের পতনের কারণ হইয়া পড়ে।

খলিফা ওয়াসিক

(৮৪২-৪৭ খৃঃ)

মুতাসিম নয় বৎসর রাজত্বকরার পর মৃত্যুমুখে পতিত হইলে তাঁহার পুত্র ওয়াসিক সিংহাসন লাভ করেন। ওয়াসিকের রাজত্বকাল মাত্র পাঁচ বৎসর। তৎপর তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা নিষ্ঠুর-স্বভাব মুতাওয়াক্কিল তাঁহার উত্তরাধিকারী হন এবং সিংহাসনে আরোহণ করেন (৮৪৭ খৃঃ)।

খলিফা মুতাওয়াক্কিল (৮৪৭-৬২ খৃঃ)

(পুনরায় ইমাম বংশের দুর্দিন)

ওয়াসিকের মৃত্যুর সহিত আব্বসীয়দের গৌরব যুগের অবসান হয়। মুতাওয়াক্কিলের আমল হইতে সাম্রাজ্যের অবনতির সূত্রপাত হয়। নিষ্ঠুরতা ও অব্যবস্থিত চিত্ততার জন্য মুতাওয়াক্কিলকে আরব জাতির নিরো (The Nero of the Arabns) বলা হয়। তাঁহার পনোরো বৎসর ব্যাপী রাজত্বকাল ছিল মুসলিম জাহানের উপর এক নিদারুণ অভিসম্পাত। আব্বাসীয় খলিফাগণ সুন্নী হইলেও তাঁহার পূর্ববর্তী খলিফাগণ শিয়াদের প্রতি উদার ব্যবহার করিতেন। কারণ শিয়াদের সাহায্যে তাঁহারা সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু মুতাওয়াক্কিল অতিরিক্ত গোঁড়ামী বশতঃ শিয়াদিগকে দেখিতে পারিতেন না। হযরত আলী (কঃ) এবং তাঁহার বংশধরদেরও তিনি ঘোর বিদ্বেষী ছিলেন।

শিয়াগণ নযফে হযরত আলী (কঃ)-র এবং কারবালায় ইমাম হুসায়েনের মাযারকে তীর্থক্ষেত্রে পরিণত করিয়াছে এবং ঐ দুই স্থানে প্রতি বৎসর তাহারা

যিয়ারত করিতে গিয়া অশ্রুবর্ষণ করে, এই কথা শুনিয়া মুতাওয়াক্কিল তাহাদের এই প্রকার কার্যকে শরীয়ত বিরোধী ঘোষণা করিয়া উক্ত পবিত্র মাযার দুইটিকে ধুলিসাৎ করেন এবং শিয়াদের তথায় গমন কঠোরভাবে দণ্ডনীয় করেন। শিয়াদের প্রতি তাঁহার অত্যাচারের এখানেই শেষ নয়। তিনি তাহাদের শ্রদ্ধেয় ইমাম আলী আন নকীকে মদীনা হইতে গ্রেফতার করিয়া আনিয়া নিজ রাজধানী সামর্রায় বন্দী করিয়া রাখেন। জীবনে তিনি মুক্তি পান নাই। ৮৬৮ খৃষ্টাব্দে (২৫৪ হিঃ) সামার্রার বন্দী শিবিরেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তৎপর তাঁহার পুত্র হাসান আল আশকারী ইমাম হন।

মুতাওয়াক্কিল নিজে দিবারাত্রি মদ আর নারী লইয়া মত্ত থাকিতেন এবং নানা পাপকার্য করিতেন অথচ তাঁহার যত ধর্মবুদ্ধি জাগিত অপরের বেলায়। তাঁহার খেয়াল চাপিয়েছিল, তিনি খোলাফায়ে রাশেদীনের আমলের সেই মৌলিক ইসলামকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিবেন। সেই ওজুহাতে তিনি রাজধানীতে মুক্তবুদ্ধি ও স্বাধীন চিন্তার (rationalism) চর্চা বন্ধ করিয়া দেন এবং বিজ্ঞান ও দর্শন সংক্রান্ত বক্তৃতা নিষিদ্ধ করিয়া দেন। মুতাযিলাপন্থীদের নেতৃস্থানীয় বহু ব্যক্তিকে কারাগারে নিক্ষেপ করেন। তাঁহার খামখেয়ালী বুদ্ধির অন্ত ছিল না। তিনি ইহুদী ও খৃষ্টানগণকে সরকারী চাকুরী হইতে অপসারিত করেন এবং তাহাদের স্বাতন্ত্র্যের চিহ্ন স্বরূপ কোমরে বিশেষ এক প্রকার কোমর বন্ধ পরিবার নির্দেশ দেন। এইভাবে জনসাধারণের শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি হারাইয়া তিনি একান্তভাবে তুর্কী দেহরক্ষীদের উপর নির্ভরশীল হইয়া পড়েন। কিন্তু বিধাতার অমোঘ বিচারে এই তুর্কী রক্ষী–বাহিনীর হস্তেই তিনি নিহত হন। তাঁহার অত্যাচার ও দুর্নীতির জন্য দেশব্যাপী অসন্তোষ জন্মে। তাঁহার তুর্কী রক্ষিগণ পর্যন্ত তাঁহার কার্যকলাপে বিরক্ত হয়। একদা এক নৈশভোজে খলীফা যখন মদের নেশায় ঝিমাইতেছিলেন, সেই সময় যাহারা সেই ভোজন কক্ষেই তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া হত্যা করে এবং তাঁহার দেহকে সপ্তখণ্ডে বিভক্ত করে।

খলীফা মুনতাসির (৮৬২)

মুতাওয়াক্কিলের নিধনের পর তৎপুত্র মুনতাসির খলীফা হন (৮৬২ খৃঃ)। ইনি ন্যায়পরায়ণ ও প্রজা হিতৈষী ছিলেন এবং পিতার বহু অন্যায় কার্যের সংশোধন করেন। হযরত আলী (কঃ) ও হুসায়েনের সমাধগৃহে তিনি পুনর্গঠিত করেন। কিন্তু মাত্র ছয় মাস রাজত্বের পর এই গুণবান খলীফার মৃত্যু হয় (৮৬২ খৃঃ)।

খলীফা মুস্তাইন, মুতা'যবিল্লাহ ও মুহতাদী

(৮৬২-৬৯)

ইহার পর সাত বৎসরের ভিতর তুর্কী দাসগণ একে একে তিনজন খলীফাকে সিংহাসনে বসায় এবং অপসারিত করে। ইহারা হইলেন (১)মুতাসিমের পৌত্র মুস্তাইন, (২) মুতাওয়াক্কিলের দ্বিতীয় পুত্র মুতায বিল্লাহ এবং (৩) ওয়াসিকের পুত্র মুহতাদী। অষ্টম বর্ষে মুতাওয়াক্কিলের অপর এক পুত্র মুতামীদ সিংহাসন লাভ করেন।

খলিফা মুতামীদ (৮৭০-৯২)

মুতামীদের রাজত্ব দীর্ঘস্থায়ী হইয়াছিল। তাহার কারণ তুর্কীদের সিংহাসন লইয়া ছিনিমিনি খেলার সুযোগ রহিত করার উদ্দেশ্যে তিনি সামার্রা ছাড়িয়া পূর্বপুরুষদের রাজধানী বাগদাদে ফিরিয়া আসেন এবং তথায় শক্তিশালী নাগরিকদের সহযোগিতায় এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতা মহাবীর মুয়াফিকের বাহুবলে তুর্কীদের ক্ষমতা খর্ব করিতে সমর্থ হন। বাগদাদ শহর তাঁহার আমলে চল্লিশ বৎসর পর আবার সাবেক জৌলুশে উদ্ভাসিত হয়।

আল কায়েমী শাখার ইমামতীর বিলোপ

খলীফা মুতওয়াক্কিলের কর্তৃক ইমাম আলী আন নকী গ্রেফতার হন এ কথা পুর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। ৮৬৮ খৃষ্টাব্দে মুতাওয়াক্কিল-পুত্র মুতা'য বিল্লা'র রাজত্ব কালে সমারার কুখ্যাত বন্দী-শিবিরে আলী আন নকী দেহত্যাগ করিলে তাঁহার পুত্র হাসানকে ইমাম পদে বরণ করা হয়। শিয়ারা হাসানকে "আল আশকারী" বলিত, কারণ সামারা'র বন্দী শিবিরে তাঁহার জন্ম হয়। উক্ত বন্দী শিবিরের নাম ছিল আল আশকার। আশকার অর্থ শিবির (CAMP)। পরবর্তী খলিফাগণ ইমাম আশকারীকেও বন্দী করেন এবং সামারা'রা বন্দী শিবিরে আবদ্ধ রাখেন। ৮৭৪ খৃষ্টাব্দে (২৬০ হিঃ) এই বন্দী শিবিরেই তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার আশকারী নাম অক্ষরে অক্ষরে সত্য প্রতিপন্ন হইয়াছিল।

এই সব ঘটনায় শিয়াগণ অত্যন্ত ব্যথিত হয়। তাহারা আশকারীর শিশুপুত্র মুহম্মদকে "আল মেহদী" উপাধি দিয়া তাহাদের গদীনেশীন ইমাম করে। ইনিই এই বংশের শেষ ইমাম। আল মেহদী যতই বড় হইতে লাগিলেন তাঁহার মনে পিতার আদর্শন জনিত কষ্ট ততই তীব্রতর হইতে লাগিল। তাঁহার নির্বাসিত পিতার কি হইয়াছে, কেহই সঠিক বলিতে পারিত না। এজন্য বালকের মনে আরও বেশী অশান্তি ও উদ্বেগের সৃষ্টি হইয়াছিল। পিতা সত্যই তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া পরলোক গমন করিয়াছেন, না কি কোনও অজ্ঞাত বন্দী শিবিরে আবদ্ধ রহিয়াছেন, এই সব প্রশ্ন সতত বালকের মনকে উদ্বেলিত করিত এবং তাঁহাকে অশ্রুসিক্ত করিত। ইহার ফলে দিন দিন বালক বিমর্ষ হইতে লাগিলেন। অবশেষে একদিন তিনি মদীনাত্যাগী এক বাণিজ্য কাফেলার সহিত মিশিয়া গোপনে পিতার অন্বেষণে গৃহত্যাগ করিলেন (৮৭৮ খৃঃ ২৬৫ হিঃ)। তখন তাঁহার বয়স মাত্র পাঁচ বৎসর। সেই যে বালক নিরুদ্দিষ্ট হইলেন, আর কখনও তিনি মদীনার ফিরিয়া আসেন নাই।

বালক কোথায় গেলেন, কিভাবে জীবন অতিবাহিত করিলেন, তিনি বাঁচিয়া আছেন কিনা, এ সমস্ত তথ্য চির রহস্যাচ্ছন্ন রহিয়া গেল। তাঁহার গৃহত্যাগের পর হইতে মদীনার শিয়াগণ প্রতি সন বাণিজ্য কাফেলাগুলির প্রত্যাবর্তন মৌসুমে নগরের উপকণ্ঠে, যে পথ দিয়া কাফেলাগুলি নগরে প্রবেশ করে সেই পথে, অশ্রুসিক্ত নয়নে বসিয়া থাকিত। মদীনায় কোনও কাফেলা ফিরিয়া আসিলেই তার ভিতর তাহাদের প্রিয় ইমামকে তাহারা খুঁজিত। সন্ধ্যায় তাহারা ব্যর্থ মনোরথ হইয়া সাশ্রুনয়নে গৃহে ফিরিত। দিনের পর দিন তাহারা এইরূপ করিত। তাহারা বিশ্বাস করিত, তাহাদের প্রিয় ইমাম তাহাদিগকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিবেন না, যাহার জন্য বেদনার দীপ–জ্বালাইয়া তাহারা বৎসরের পর বৎসর প্রতীক্ষা করিতেছে, একদিন না একদিন তিনি অবশ্যই তাহাদের অশ্রুনীর মুছাইতে এবং মানুষের দুঃখভার লাঘব করিতে মদীনায় ফিরিয়া আসিবেন। এই বিশ্বাস বুকে লইয়া তাহারা বৎসরের পর বৎসর মদীনার উপকণ্ঠে কাটাইয়াছে, কিন্তু তাহাদের ইমাম আর ফিরিয়া আসেন নাই। দীর্ঘ প্রতীক্ষিত বলিয়া ইমাম মেহদীকে তাহারা "আল মুনতাযযর" (The long expected one) বলিত।

খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতকে ঐতিহাসিক ইবনে খালদুন মদীনা ভ্রমণে গিয়া এইরূপ একটি দৃশ্য স্বচক্ষে দেখিয়া ছিলেন। তখনও তাহারা বাণিজ্য মৌসুমে প্রত্যহ এইরূপ করিত। ইবনে খালদুন তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,–তোমাদের ইমাম কি এখনও বাঁচিয়া আছেন? তাহারা তাহাতে সরল বিশ্বাসে উত্তর করিয়াছিল,–কেন, নবী খিযির আলায়হেস্ সালাম কত কালের মানুষ। তিনি তো আজও বাঁচিয়া আছেন। তবে আমাদের ইমামই বা বাঁচিয়া থাকিতে পারিবেন না কেন? এই প্রকার ধারণার বশবর্তী হইয়াই শিয়াগণ তাহাদের ইমাম মেহদীর স্থলে আর কোনও ইমামকে গদীনেশীন করে নাই। এইভাবে ইমাম মু'সা আল কাযিমের বংশধরদের ইমামতীর ধারা বিলুপ্ত হয়, এই ইমাম মেহদীর পর হইতে।

সপ্তদশ অধ্যায়

আব্বাসীয় খলীফাদের অবনতির যুগ
ইসমাইলী শাখার ইমামদের অভ্যুত্থান

হারুণর রশীদের আমল হইতে পঞ্চদশ খলীফা মুতামীদের শাসন কাল পর্যন্ত ইমাম মু'সা আল কাযিম ও তাঁহার বংশধরেরা আব্বাসীয় খলীফাদের হস্তে কিরূপ ব্যবহার পাইয়া আসিতেছিলেন তাহা ইসমাইলী শিয়াদের দৃষ্টি এড়ায় নাই। তাই তাহারা তাহাদের নিজেদের ইমামদিগকে রক্ষার জন্য যথাসম্ভব সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছিল। ইমাম বংশের যাবতীয় লোককেই আব্বাসীয় খলিফাগণ সন্দেহের চোখে দেখিতেন। তাই ইসমাইলিগণ তাহাদের ইমামদের অবস্থান ও কার্যকলাপ সম্পর্কে অত্যধিক গোপনীয়তা রক্ষা করিয়া চলিত। কিশোর ইমাম মুহম্মদ বিন ইসমাইল এইভাবে অতি গোপনে প্রতিপালিত হইতে থাকেন। এই কারণে তাঁহার উপাধি হয় "আল মখতুম (the Concealed, the Unervealed)। শুধু মুহম্মদ বিন ইসমাইল নহেন, ইসমাইলীদের প্রথম ছয় ইমাম এইভাবে গোপনে প্রতিপালিত হন এবং তাঁহাদের সকলেরই উপাধি "আল মখতুম"। (১)

বিবি ফাতেমার বংশধরেরা যে খিলাফতের ন্যায্য অধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়াছিলেন, এই মর্মান্তিক দুঃখ শিয়া ও ইসমাইলী উভয় সম্প্রদায়কেই নিপীড়িত করিত। রাষ্ট্রক্ষেত্রে তাঁহাদের এই বঞ্চনার দরুন আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে তাঁহাদের প্রতি শিয়া এবং ইসমাইলীদের ভক্তি ও দরদের মাত্রা বৃদ্ধি পায় অত্যাধিক। তাহারা ইমামকে পার্থিব এবং শাস্ত্রীয় উভয়বিধ জ্ঞানের পূর্ণ অধিকারী মনে করিত এবং তাঁহাকে সর্ব বিষয়ে

---

(১) A Short History of the Saracens by Ameer Ali, P. 589 (foot note).

অভ্রান্ত Perfect মনে করিত। ইমামগণ ভ্রান্ত হইতে পারেন না এই বিশ্বাসে ইসমাইলিগণ তাহাদের ইমামদের উপদেশ ও নির্দেশের কোনও রুপ যাচাই আবশ্যক মনে- না করিয়া সেগুলির গোপনীয়তা রক্ষা করিয়া চলিত। শতাধিক বৎসর ধরিয়া এইভাবে তাহাদের গোপন প্রতিষ্ঠানের কাজ অতি সন্তর্পণে উহার লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। উহার মূল লক্ষ্য ছিল রাষ্ট্র ও ধর্ম উভয়ক্ষেত্রে হযরত আলী (কঃ) ও ফাতিমার বংশধরদিগকে পূর্ণ গৌরবে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা। এ সম্পর্কে জনৈক পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকের নিম্নোদ্ধৃত মন্তব্যটি প্রণিধান যোগ্য।

Husain's death at Karbala (680 A.D.):-

Round his tomb and that of Ali in the neighbouring city of Najf, there rapidly grew an emotional Shi'i martyrology among the large numbers of poor Arabs who had not benefited materially from the spoils of conquest and the Persian converts to Islam who were denied equality of status by the race-proud Arabs. They evolved the doctrine that Ali and his descendants had inherited with the caliphate, not merely Mohammed's temporal authority over all Islam, but also his spiritual inspitation. Some Shi'is indeed went so far as to maintain that Ali was greater than Mohammed, that while the mission of the latter was merely to transmit to mankind the text of the Quran, its inner spiritual significance was contained in Ali; while the Muslim profession of faith declared Mohammed the Apostle of God, the Shi'is proclaimed Ali the Saint of God. His death and that of Husain were conceived as martyrdom for the salvation of mankind, a notion probably inspired by the Christian doctrine of the Atonement. The spiritual inspiratian of Ali and his sons was held to be passed on to their descendants, the Shaiyids descended from Husain and the Sharifs descended from Hasan, who are to this day objects of Shi"is vineration. In particular, both temporal & spiritual power was believed to pass from Husain to his legal heirs in each generation, to whom as the infallible Imam (leader) the implicit obedience of the Shi"is was due in all matters,

religious or secular. Had any of the descendents of Ali possessed something of the political talent of the best Umayyads, he would certainly have been able to supplant them, such was the superstitious reverence of the Shi"is for their Imams; but, in fact, the Umayyads, whose power rested on the mass of moderate people, Muslims and non-Muslims alike, who wanted above all things law and order, were able with some difficulty to maintain their ascendency. (1)

অনুবাদ

কারবালায় হুসায়েনের মাযার এবং কারবালার পার্শ্ববর্তী শহর নযফে অবস্থিত হযরত আলী (কঃ-এর মাযারকে কেন্দ্র করিয়া শীঘ্রই ভক্তিপ্রবণ শিয়াদের শহীদী বিলাপ-ক্ষেত্র গড়িয়া উঠিল। এই সব ভক্তের ভিতর ছিল বহু সংখ্যক দরিদ্র আরব যাহারা মুসলমানদের দিগ্বিজয়লব্ধ ধনসম্পদ দ্বারা উপকৃত হইত না, এবং পারস্যের নবদীক্ষিত মুসলিমগণ, যাহাদিগকে জাত্যাভিমান গর্বিত আরবেরা তাহাদের সমমর্যাদা দিত না। ঐ সব বঞ্চিত লোকের ভিতর এই মতবাদ পুষ্টিলাভ করে যে, হযরত আলী (কঃ) ও বিবি ফাতিমার সন্তানগণ হযরত মুহম্মদের খিলাফতের উত্তরাধিকারী হিসাবে সমগ্র মুসলিম জাহানের উপর শুধু সার্বভৌম রাষ্ট্রীয় ক্ষমতারই ন্যায্য অধিকারী ছিলেন না, তাঁহারা আধ্যাত্মিক শক্তিরও ধারক ছিলেন। কতক কতক শিয়া এমনও মনে করিত যে, হযরত মুহম্মদ (দঃ)-অপেক্ষা হযরত আলী (কঃ)-এর শ্রেষ্ঠ ছিলেন; কেননা, হযরত মুহম্মদ (দঃ) এর উপর ভার ছিল মনুষ্য জাতির নিকটে কুরআনের বাণী পৌঁছাইয়া দেওয়া, পরন্তু, উহার আভ্যন্তরীণ গুঢ় অর্থ রক্ষিত ছিল হযরত আলীর ভিতর। মুসলমানদিগকে ধর্মীয় বিশ্বাসের মুলসূত্র হিসাবে হযরত মুহম্মদ (দঃ) কে

(১) A Short History of the Middle East by Professor G. E. Kirk M. A. Cantab, P.21.

আল্লা'র নবী অর্থাৎ বাণীবাহক বলিয়া মানিয়া লইতে হয়; কিন্তু, শিয়াদের মতে হযরত আলী (কঃ) ছিলেন আল্লা'র মারেফাত সাধক The sainyt of God.

হযরত আলী (কঃ) ও ইমাম হুসায়েনের শাহাদৎ ছিল তাহাদের মতে মানব জাতির মুক্তির উদ্দেশ্যে জীবন দান। সম্ভবতঃ খৃষ্টানদের প্রচারিত, মানব জাতির মুক্তির জন্য যীশুর জীবন দানের মতবাদ, হইতে শিয়াদের ভিতর উক্ত প্রকার বিশ্বাসের সৃষ্টি হইয়া থাকিবে। হযরত আলী (কঃ) ও তাঁহার পুত্রদের আধ্যাত্মিক শক্তির ধারা তাঁহাদের বংশধরদের ভিতর সঞ্চারিত হইয়াছিল, ইহাই। শিয়াদের বিশ্বাস ইহারা হইলেন সৈয়দ অর্থাৎ ইমাম হুসায়েনের বংশধর, এবং "শরীফ" অর্থাৎ ইমাম হাসানের বংশধরগণ। অদ্যাপি ইঁহারা শিয়াদের শ্রদ্ধার পাত্র। বিশেষ করিয়া যাহারা ইমাম হুসায়েনের মূল ওয়ারিশ, শিয়াদের মতে তাঁহাদের ভিতর পুরুষানুক্রমে উক্ত ইমামের পার্থিব ও আধ্যাত্মিক উভয়বিধ ক্ষমতাই বহিতেছে। ইহাদের জ্ঞান অভ্রান্ত- এই বিশ্বাসে শিয়ারা কি পার্থিব, কি ধর্মীয় সকল বিষয়ে ইঁহাদের নির্দেশ সরল বিশ্বাসে মানিয়া লয়। ইহাদের প্রতি শিয়াদের অন্ধবিশ্বাস-প্রসূত এই শ্রদ্ধা এতই গভীর যে, তাহারা মনে করে, হযরত আলী (কঃ)-র বংশধরদের কাহারও যদি উমাইয়া গোত্রের শ্রেষ্ঠ শাসকদের রাজনৈতিক প্রতিভার কিছুটা থাকিত তাহা হইলে অবশ্য উমাইয়াদের স্থলে তিনিই খলীফা হইতে পারিতেন। বস্তুতঃ উমাইয়াগণকে নিজেদের আধিপত্য বজায় রাখিতে যথেষ্ট বেগ পাইতে হইয়াছিল এই কারণে যে, তাঁহাদের ক্ষমতাসীনতা নির্ভর করিত মুসলিম অ-মুসলিম সকল শ্রেণীর সাধারণ মানুষের আনুগত্যের উপর; আর এই সব মানুষ অন্য সব কিছুর চাইতে বেশী চাহিত শান্তি ও শৃঙ্খলা।

খলীফা মুতাযিদ বিল্লাহ (৮৯২-৯০২ খৃঃ) মুখতাফী (৯০২-৯০৭ খৃঃ) এবং মুকতাদীর (৯০৭-৩২ খৃঃ)

পঞ্চদশ আব্বাসীয় খলীফা মুতামীদের কথা পুর্বে উল্লেখিত হইয়াছে। যাহার বাহুবলে মুতামীদের সিংহাসন স্থায়িত্ব লাভ করিয়াছিল, সেই গুণবান ভ্রাতা মুয়াফিক তাঁহার পূর্বেই গতায়ু হন। এজন্য মুয়াফিকের পুত্র মুতাযিদ বিল্লাহকে মুতামীদের পর সিংহাসনে বসান হয় (৮৯২ খৃঃ)। ইতি দশ বৎসর রাজত্ব করেন। মুসলিম ইতিহাসে মুতাযিত বিল্লা'র এই অনতিদীর্ঘ শাসনকাল বিশেষ ভাবে স্মরণীয়। কারণ, তাঁহার আমলে ইরাকে কারমাথ নামক এক ইসমাইলী ধর্মনেতার আবির্ভাব হয়। ইঁহাদের শিষ্যেরা "কারমাথীয় দল" নামে পরিচিত। ইহারা পরবর্তী কালে আব্বাসীয় সাম্রাজ্যের পতনের একটি প্রধান কারণ হইয়াছিল। এই মুতাযিদ বিল্লা'র রাজত্ব কালেই হুসায়েন বংশীয় ইসমাইলী শাখার ইমামগণ আফ্রিকায় স্বাধীন সাম্রাজ্য স্থাপনে সমর্থ হন।

৯০২ খৃষ্টাব্দে মুতাযিদ বিল্লাহ মৃত্যুমুখে পতিত হইলে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র মুখতাফী সিংহাসন লাভ করেন। তাঁহার রাজত্ব কাল মাত্র পাঁচ বৎসর। ইঁহার পর মুতাযিদের দ্বিতীয় পুত্র চৌদ্দ বৎসর বয়স্ক আল মুকতাদীর খলীফা হন। বাল্যকাল হইতেই বিলাসিতার সুযোগ লাভ এই আরামপ্রিয় খলীফার অধঃপতনের কারণ হইয়াছিল। তাঁহার দীর্ঘ পঁচিশ বৎসর ব্যাপী শাসনকাল তিনি বিলাসিতার ভিতর ডুবাইয়া দেন। এদিকে কারমাথীয় দস্যুদল তাঁহার সাম্রজ্যকে লুটতরায, নরহত্যা ও অগ্নিদাহ দ্বারা শ্মশানে পরিনত করিতেছিল। খলীফা তাহাদের মোকাবেলা করিতে সমর্থ হইলেন না। তাঁহারা সেনাবাহিনী কারমাথীয় দল কতৃক নানাস্থানে পর্যুদস্ত হইতে থাকে। এই সুযোগ ইসমাইলী নেতাগণ মিশরে ফাতেমীয় সাম্রাজ্যের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করেন।

আশ্রম হইতে ইমাম হাবীবের নির্দেশে আবু আব্দুল্লাহ নামক শক্তিশালী প্রচারক আফ্রিকায় প্রেরিত হন।

ইমাম বংশের দীর্ঘকাল ব্যাপী দুর্ভোগের পর এবার বুঝি আল্লাহ তাঁহাদের প্রতি করুণা পরবশ হইলেন। সারা মুসলিম জাহানে জনসাধারণ এই সময় আব্বাসীয় খলীফাদের অকর্মন্যতার ফলে সৃষ্ট অরাজকতার জন্য নিজদিগকে বিপন্ন বোধ করিয়া মনে প্রাণে খিলাফতের পরিবর্তন চাহিতেছিল।

আব্বাসীয়দের বেলায় যেমন আবু মুসলিমের মত অসাধারণ বাগ্মী পুরুষ তাঁহাদের সহায়রূপে জুটিয়াছিল, ফাতেমীয় নেতা আল হাবীবের বেলায়ও তেমনি আবু আব্দুল্লা'র মত এক বিরাট ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন সাধু পুরুষের সাহায্য মিলিল। ইনি এককালে বসরায় মুহতাসীর ছিলেন এবং শিয়া মতাবলম্বী ছিলেন। ইনি আল হাবীবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া ইসমাইলী সম্প্রদায়ের জন্য অফুরন্ত শক্তি-উৎস রূপে পরিগণিত হন। শিয়া মতবাদ তাঁহার ভিতর এমনভাবে প্রতিফলিত হইয়াছিল যে, তাঁহার নিষ্ঠা দেখিয়া লোকে তাঁহাকে "আস শিয়া" অর্থাৎ মূর্তিমন্ত শিয়ামত বলিয়া অভিহিত করিয়াছিল। ২৮৮ হিজরীতে (৯০১ খৃঃ) আল হাবীব তাঁহাকে ইসমাইলী প্রচারক হিসাবে আফ্রিকায় প্রেরণ করেন। তাঁহার অসাধারণ বাগ্মীতা, অনুপম চরিত্র, অকৃত্রিম ধার্মিকতা এবং সর্বোপরি জনদরদী মনোবৃত্তি, সহজেই অশিক্ষিত ও ভাবপ্রবণ বার্বার জাতিকে মুগ্ধ করিয়া ফেলে। তাহাদের ভিতর "কিতামা" নামক এক প্রবল সম্প্রদায় হইতে তিনি গোপনে ফাতেমীয়দের খিলাফতে প্রতিষ্টিত করার অনুকূলে সম্মতিলাভ করিলেন। আবু আব্দুল্লাহ তাহাদের ভিতর প্রচার করিলেন, এই ইমাম মুহম্মদ আল হাবীবই সেই ইমাম মেহদী যার আবির্ভাবের কথা কিতাবে উল্লেখ আছে।

উত্তর আফ্রিকায় তখন আগলাবী বংশীয় সুলতানদের রাজত্ব চলিতেছিল। বার্বারদের দেশের আগলাবী শাসক তাহাদের সঙ্ঘবদ্ধতা ও বিদ্রোহের সংবাদ পাইয়া বিচলিত হইলেন এবং দুইবার তাহাদের বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করিলেন। কিন্তু কিতামা সেচ্ছাসেবকগণ ধর্মোন্মাদনায় এতই মাতিয়া গিয়াছিল

যে, বেতনভোগী রাজকীয় বাহিনী দুই বারই তাহাদের দ্বারা পরাজিত হইল। তখন আগলাবী শাসক প্রাণভয়ে ত্রিপোলীতে পালাইয়া গেলেন। খলীফা আল মুক্তাদিরের শাসন আমলে, ২৯৬ হিজরীতে (৯০৯ খৃঃ) আবু আব্দুল্লাহ তাঁহার ফাতেমীয় অনুপচরগণসহ বিজয়ী বেশে আগলাবী রাজধানীতে প্রবেশ করিলেন এবং ফাতেমীয় বংশের প্রতিনিধিরূপে রাজকীয় জাঁকজমক ও আড়ম্বরসহ তথাকার শাসনভার গ্রহণ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার নিয়োজিত প্রতিনিধিগণ গভর্ণররূপে চতুর্দিকে বিভিন্ন শাসনকেন্দ্রে ছড়াইয়া পড়িল এবং শাসনভার গ্রহণ করিল। জ্ঞানী ও গুণী আবদুল্লার সুশাসনে শীঘ্রই দেশের সর্বত্র শান্তি ও সমৃদ্ধি ফিরিয়া আসিল। জনগণ পরম শান্তির সহিত তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিল। এইভাবে যথাসময়ে আল হাবীবের উপযুক্ত অভ্যর্থনার জন্য দেশবাসীকে প্রস্তুত করা হইল।

কিন্তু মুহম্মদ আল হাবীব নিজে আফ্রিকায় যাইতে বা এই বিজয়ের ফলভোগ করিতে সক্ষম হইলেন না। আবু আব্দুল্লার বিজয় লাভের অল্প দিন পরেই তিনি পরলোক গমন করিলেন এবং তৎপুত্র ওবায়দুল্লাহ আনুষ্ঠানিক ভাবে পিতার স্থলে গদী-নেশীন হইলেন। পিতার মৃত্যুকালে তাঁহাকে আহ্বান করিয়া বলেন, "বেটা, তুমিই ইমাম মেহদী; তোমাকে দুর দেশে যাইতে হইবে। সেখানে অনেক দুঃখ ক্লেশ সহ্য করিতে হইবে এবং কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হইতে হইবে।"

নুতন ইমাম ওবায়দুল্লাহ কিছুদিন সালামিয়াতে অবস্থান করিয়া ইরাক ও আযমের শিষ্যমণ্ডলীকে হিদায়েত করিলেন। ইতোমধ্যে আবু আব্দুল্লাহ কর্তৃক আফ্রিকায় তাঁহার জন্য সম্পূর্ণরূপে ক্ষেত্র প্রস্তুত হইল। তখন তিনি পুত্র আবুল কাসিম, বিশ্বস্ত শিষ্য আবুল আব্বাস (আবু আব্দুল্লা'র ভ্রাতা) এবং আর কিছু অনুচর সঙ্গে লইয়া সওদাগর বেশে অতি সন্তপর্ণে আফ্রিকার পথে যাত্রা করিলেন।

কিন্তু এত গোপনীয়তা সত্বেও আব্বাসীয়দের সর্তক দৃষ্টি তিনি এড়াইতে পারিলেন না। খলীফা আল মুকতাদীর তাঁহার চেহারার বিশদ বিবরণসহ

রাজ্যের সর্বত্র চর প্রেরণ করিলেন তাঁহাকে গ্রেফতার করার জন্য। খলীফা যে এরূপ শত্রুতা করিতে পারেন, ইহা অনুমান করা ইমাম ওবায়দুল্লা'র পক্ষে কঠিন ছিল না। তিনি সিরিয়ার এলাকা পার হইয়াই শিষ্য ও অনুচরগণকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত করিলেন এবং পৃথক পৃথক ভাবে চলিতে লাগিলেন। তথাপি আবুল আব্বাস মিশরের পথে ধরা পড়িলেন এবং বন্দী হইলেন। ওবায়দুল্লাহ কোনও মতে পুত্রসহ উত্তর আফ্রিকায় সিজিল-মসিহ শহরে উপনীত হইলেন (২৯৬ হিজরী)।

কিন্তু সিজিল-মসিহ পৌঁছিয়াও ইমাম নিরাপদ হইতে পারিলেন না। তথকার গভর্ণর নবাগত সওদাগরের মুখাকৃতিতে নুরানী আভা এবং ফাতেমীয় সন্তানদের আকৃতিগথ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিয়া সন্দিগ্ধ হইয়া উঠেন এবং খলীফার পূর্ব নির্দেশ অনুযায়ী তাঁহাকে পুত্রসহ গ্রেফতার করিয়া বন্দীখানায় নিক্ষেপ করেন।

বীর মুজাহিদ আবু আব্দুল্লাহ তাঁহার ভ্রাতার ধৃত হওয়ার সংবাদ পুর্বেই অবগত হইয়াছিলেন। তিনি বিপুল সংখ্যক শিয়া ও বার্বার সৈন্য সহ দ্রুত অভিযান চালাইয়া ভ্রাতকে উদ্ধার করিলেন। ইতোমধ্যে তিনি তাঁহার প্রভুর বন্দীত্বের সংবাদও অবগত হইলেন। ভ্রাতাকে উদ্ধার করিয়াই আবু আব্দুল্লাহ সিজিল-মসিহ অভিমুখে ধাবিত হইলেন। তাঁহার আকস্মিক উপস্থিতে সিজিল-মসিহর শাসক, বার্বার বংশীয় সামন্তরাজ এলিসা বিন মিজরা, আতঙ্কিত হইয়া রাজধানী রক্ষার জন্য অবিলম্বে সৈন্যসহ রণক্ষেত্রে উপনীত হইলেন। ইমাম ওবায়দুল্লাহ তখনও তাহার কারাগারে।

এলিসা আর রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করিবার সুযোগ পাইলেন না," রণক্ষেত্রেই নিহত হইলেন। বিজয়ী আবু আব্দুল্লাহ সোজা বন্দীখানায় উপনীত হইয়া প্রভুকে তদীয় পুত্রসহ উদ্ধার করিলেন। তাঁহাদিগকে জীবন্ত পাওয়ায় আনন্দাশ্রুতে তাঁহার দুই গণ্ড প্লাবিত হইল। আবু আব্দুল্লাহ এবং তদীয় সহকারী শিয়া ও বার্বার সেনানিগণ ইমাম ওবায়দুল্লাহকে অতীব সম্মানের সহিত সিজিল-মসি'র রাজপ্রাসাদে লইয়া গেলেন এবং চতুর্দিকে লোকদের

নিকট ঘোষণা করিলেন, এই তোমাদের প্রভু মেহদী আসিয়াছেন, (৯০৯ খৃঃ)।

আফ্রিকার নীরস সিজিল-মসিহ্ শহর আনন্দ মুখর হইয়া উঠিল। চল্লিশ দিন ধরিয়া সকলে সিজিল-মসিহ্ নগরে অবস্থান করিয়া উৎসব করিল। তারপর তাহারা তাহাদের প্রভুকে কায়রো শহরে লইয়া গিয়া আল মেহদী ও খলীফা বলিয়া প্রতিষ্ঠিত করিল। এইভাবে অনেক দুঃখকষ্টের ভিতর দিয়া আফ্রিকায় ফাতেমীয় খিলাফৎ প্রতিষ্ঠিত হইল। ইমাম ওবায়দুল্লাহ আল মেহদী পরে ভুমধ্যসাগরের তীরবর্তী একটি অপেক্ষাকৃত নিরাপদ স্থান বাছিয়া লইয়া তথায় নুতন রাজধানী নির্মাণ করেন। এবং উহাকে সুদৃঢ় প্রাচীর ও লৌহ তোরণ দ্বারা একটি সুরক্ষিত শহরে পরিণত করেন (৯১৬ খৃঃ)। ইহাকে তদীয় নাম আনুযায়ী মেহেদীয়া নামে অভিহিত করা হয়। ৩০৯ হিজরীতে (৯২৯ খৃঃ) ইদ্রিসী রাজ্যও তাঁহার অধিকারে চলিয়া আসে। ফাতেমীয় প্রথম খলীফা ওবায়দুল।লাহ আল মেহদী চব্বিশ বৎসর গৌরবময় রাজত্বের পর ৯৩৪ খৃষ্টাব্দে জান্নাতবাসী হন। তাঁহার বংশধরগণকে খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতকের শেষ ভাগ পর্যন্ত আফ্রিকায় খলীফারূপে রাজত্ব করেন।

ওবায়দুল্লাহর পুত্র কাসিম ও তৎপুত্র মনসুর এই মেহেদীয়ায় বসিয়া খিলাফৎ ও শাসন কার্য পরিচালনা করিতেন। এই বংশের এক কৃতী সন্তান আল মুয়ীয ফাতেমীয় সাম্রাজ্য বিশেষভাবে সম্প্রসারিত করেন। তাঁহার সেনাপতি জওহর ৯৬৯ খৃষ্টাব্দে মিশর জয় করিয়া নীল নদের তীরে কাহেরা (বিজেয়িনী) নগর প্রতিষ্ঠিত করেন। ইহার পর কাহেরা ফাতেমীয় সুলতানদের রাজধানী হয়। এই কাহেরাই বর্তমান কায়রো।

আল মুয়ীযের পুত্র সুলতান আব্দুল আযীয তাঁহাদের পূর্বপুরুষদের আবাস ভূমি হিজায অধিকার করেন এবং তারপর একমাত্র বাগদাদ শহর ছাড়া সমগ্র ইরাক জয় করেন। তাঁহার সময় ফাতেমীয় সাম্রাজ্য পুর্ব দিকে ইউফ্রেতিস (ফোরাত নদী) হইতে পশ্চিমে আটলন্টিক পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। ফাতেমীর সাম্রাজ্যের ইহাই ছিল চরম উৎকর্ষের যুগ। ইহার পর স্বাভাবিক নিয়মেই, পৃথিবীর অন্যান্য রাজবংশের ন্যায় ফাতেমীয়দের বংশেও আসে অবনতি।

বিখ্যাত রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও ঐতিহাসিক ইবনে খালদুন বলিয়াছেন, সাধারণতঃ একশত বৎসর থাকে যে কোনও রাজ বংশের উন্নতির যুগ এবং পৃথিবীর সকল জাতির ইতিহাসে ইহার নযীর মিলিবে। যাহা হউক, সুলতান আব্দুল আযীযের পর ফাতেমীয় বংশের আরও এগারো জন খলীফা ভালমন্দ নানা অবস্থার ভিতর দিয়া ১১৭১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত মিশরে রাজত্ব করেন। তারপর আব্বাসীয় বংশের অনুরাগী ও সুন্নী মতাবলম্বী প্রখ্যাত গাযী সালাহউদ্দীন কর্তৃক ইঁহাদের রাজত্ব ও খিলাফতের অবসান হয়।

ইমাম হুসায়েনের বংশধর ইমাম ওবায়দুল্লাহ আল মেহদী কর্তৃক আফ্রিকায় ফাতেমীয় সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা ইসলামের ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় ঘটনা। যে ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাকল্পে ইমাম হুসায়েন জীবনদান করিয়াছিলেন, আড়াই শত বৎসর পরে সেই ইমাম হুসায়েনেরই একজন বংশধরের ভিতর দিয়া উহা বাস্তবে রূপায়িত হইয়া আফ্রিকায় প্রতিষ্ঠিত হইল। ইহা তাঁহার জান্নাতবাসী ক্ষুব্ধ রুহকে নিশ্চয়ই সান্তনা দিয়া থাকিবে।

খলীফা ওবায়দুল্লাহ আল মেহদীতে আধ্যাত্মিক তেজ ও পার্থিব শক্তি উভয়ের একত্র সমাবেশ ঘটিয়াছিল। তাঁহার ন্যায়নিষ্ঠ ও মানবদরদী সুশাসনে আফ্রিকার মরুভূমিতে বেহেস্তের শান্তি নামিয়া আসিয়াছিল। ইহাই ছিল ইসলামী রাষ্ট্রের স্বরূপ। ইসলামের প্রবর্তক নবীকরীম স্বয়ং এই আদর্শেরই নযীর প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছিলেন। বিখ্যাত গ্রীক দার্শনিক আফলাতুন (প্লেটো) তাঁহার "রিপাব্লিকা" গ্রন্থে বলিয়াছেন, Every king must be a philosopher –প্রত্যেক শাসকেরই দার্শনিক হওয়া দরকার। দার্শনিক অর্থে তিনি সত্যাদর্শী বুঝাইয়াছেন। খলীফা ওবায়দুল্লাহ আল মেহদী ছিলেন তেমনি একজন সত্যাদর্শী শাসক। তাই তাঁহার সাফল্যে শহীদ ইমাম হুসায়েনের জীবনের স্বপ্ন সফল হইল এবং এতদিন পরে তাঁহার জীবনদান সার্থকতায় মণ্ডিত হইল।

শোক ও মর্সিয়ার বেদনাপ্লুত কারবালা কাহিনীর এইখানে সমাপ্তি হইল।

পরিশিষ্ট

আব্বাসীয় সাম্রাজ্যর পতন

খলীফা আল মুক্তাদীরের আমলে (৯০৭-৩২ খৃঃ) কারমাথীয় দস্যুদলের অত্যাচারে আব্বাসীয় সাম্রজ্য অন্তঃসার শূন্য হইয়া পড়ে এবং খলিফাদের অক্ষমতা অত্যন্ত নগ্নভাবে প্রকটিত হয়, ইহা পূর্বে বলিয়াছি। কারমার্থ ছিলেন ইসমাইলী মতাবলম্বী একজন ধর্মনেতা। তিনি কুফায় জন্মগ্রহণ করেন এবং খৃষ্টীয় ৮৯১-৯২ সনে কুফার নিকটবর্তী মরুঅঞ্চলে ধর্ম প্রচার শুরু করেন। মরুভূমির বেদুইনরা দলে দলে তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। এই শিষ্য সম্প্রদায়কে কারমাথীয় সম্প্রদায় বলা হইত। কালে আবু সাঈদ নামক এক মরুসর্দার এই দলের নেতৃত্ব গ্রহণ করে এবং ইহাদিগকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া এক যৌদ্ধা, দলে পরিণত করে। ইহারা ইরাক ও চ্যালডিয়া অঞ্চলে লুণ্ঠন করিয়া বেড়াইত। আবু সাঈদের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র আবু তাহিরের নেতৃত্বে এই দল অতিশয় দুর্ধর্ষ হইয়া উঠে। ইহাদের বিদ্রোহ, লুটতরায ও নরহত্যার স্রোত ইরাক হইতে আরব সাগরের তীরবর্তী বাহরায়েন পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। বাহরায়েনের সামুদ্রিক বন্দরে পৃথিবীর নানা জাতীয় লোক বাণিজ্য ব্যাপদেশে বসবাস করিত। বন্দরের হাজার হাজার দুস্যুতস্কর ও কুখ্যাত হত্যাকারী আবু তাহিরের দলে যোগদান করিয়া উক্ত দলের সংখ্যা বৃদ্ধি করে। ক্রমে ক্রমে উহা এক লক্ষের উপর দাঁড়ায়। ৯২৯ খৃষ্টাব্দে এই কুখ্যাত কারমাথীয় দল হজের মৌসুমে কা'বা অবরোধ করে এবং বহু সহস্র হাজীকে হত্যা করিয়া তাহাদের ধনসম্পদ লুণ্ঠন করে। প্রায় পঞ্চাশ বৎসর ইহাদের অত্যাচার অব্যাহত থাকে। ঐতিহাসিকগণ বলিয়াছেন, ইহারা পঞ্চাশ বৎসরে ইরাকের যে ক্ষতি সাধন করে, পরবর্তী একশত বৎসরেও তাহার পরিপূরণ সম্ভবপর হয়

নাই। তাহারা কা'বার কৃষ্ণ প্রস্তর অপহরণ করে। এমন কি খলীফাদের রাজধানী বাগদাদ পর্যন্ত অবরোধ করিয়া শাহী সৈন্যদলকে পর্যুদস্ত করে। খলীফা তাহাদিগকে দমনে অসমর্থ হন। পরিশেষে, আরবের জনসাধারণ সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া প্রায় ত্রিশ বৎসর যুদ্ধ বিগ্রহের পর এই দলকে নির্মূল করে। এই ভয়াবহ ঘটনার পর খলীফা জনসাধরনের আস্থা ও শ্রদ্ধা সম্পূর্ণ হারাইয়া বসেন। রাজধানী বাগদাদ নগরীর বাহিরে তাঁহার কোন আধিপত্য আর থাকে না।

খলীফা আল কাহীর (৯৩২-৩৪ খৃঃ) -৯৩২ খৃষ্টাব্দে বিলাসপ্রিয় ও অকর্মণ্য খলীফা মুক্তাদীর পরলোক গমন করিলে ঊনবিংশ খলীফা আল কাহীর বাগদাদের সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইনি মাত্র দুই বৎসর রাজত্ব করেন।

খলীফা আর রাজী (৯৩৪-৪০ খৃঃ) বিংশ খলীফা আর রাযীর শাসনকাল ছয় বৎসর। আব্বাসীয় বংশের ইনিই প্রকৃত প্রস্তাবে শেষ খলীফা। কারণ মাত্র ছয় বৎসরের ভিতর এই সুযোগ্য খলীফা আব্বাসীয় বংশকে সকল রাষ্ট্রীয় ক্ষমত হইতে বিমুক্ত করার মহাকর্তব্য সমাপ্ত করেন। ইনি প্রধান অমাত্য মুঈযউদ্দৌলার হস্তে খলীফার সকল রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা তুলিয়া দিয়া তাঁহাকে "আমীরুল ওমারা" উপাধিতে ভূষিত করেন। আমীরুল ওমরাগণ পরে "আমীরুল মুমেনীনের" সর্ববিধ ক্ষমতা গ্রাস করিয়া রাজ্য সর্বেবর্সা হইয়া পড়েন।

খলীফা আল মুত্তাকী-(৯৪০-৪৪ খৃঃ) একবিংশ খলীফা আল মুত্তাকী কোনও মতে চারটি বৎসর ভাল মানুষের মত তাঁহার উযীরদের সঙ্গে তাল মিলাইয়া কাটাইয়া যান।

খলিফা আল মুস্তাকফী (৯৪৪-৪৬ খৃঃ)- দ্বাবিংশ খলীফা আল মুস্তাকফী ছিলেন নিত্যন্ত দুর্ভাগ্য নৃপতি। তখনকার আমীরুল ওমারা মুঈযউদ্দৌলা ছিলেন অত্যন্ত ক্ষমতাপ্রিয় ও প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি। তিনি খলীফাকে শুধু মাসিক বৃত্তি দান করিয়া তাঁহাকে যাবতীয় রাজকার্য হইতে অপসারিত করেন। তাঁরপর ষড়যন্ত্রকারী অযুহাত দিয়া তাঁহাকে কারারুদ্ধ করা হয় এবং তাঁহার চক্ষু দুইটি উৎপাটিত করা হয়। মাত্র দুই বৎসর রাজত্বের পর তিনি অপসারিত হন

এবং তাঁহার স্থলে অন্য এক ব্যক্তিকে সিংহাসনে বসান হয়। দুর্দণ্ড প্রাতাপ আল মনসুর ও হারুণর-রশীদের এঁরা বংশধর।

ইহার পর আব্বাসীয় বংশের আরও পনরো জন খলীফা ১২৫৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত, ৩১২ বৎসর রাজত্ব করেন। কিন্তু বিংশ খলীফা আর রাযীর পর আল কোনও খলীফা বাগদাদের শাহী মসজিদের মিম্বরে দাঁড়াইয়া খুৎবা যারী করেন নাই। খৃষ্টানদের ধর্মগুরু পোপের ন্যায় ইঁহারা ক্ষমতাহীন অবস্থায় শুধু নামে মাত্র মুসলিম জাহানের একচ্ছত্র নেতা ছিলেন। দেশ-বিদেশের মুসলিম নৃপতিগণকে শাসন-ক্ষমতার সমর্থক সনদ প্রদান ছাড়া ইঁহাদের মর্যাদার জন্য কোনও নিদর্শন ছিল না।

বাগদাদের খলীফাদের এই অধঃপতন দৃষ্টে স্পেনের উমাইয়া সুলতান তৃতীয় আব্দুর রহমান ৯২৯ খৃষ্টাব্দে নিজকে খলীফা ঘোষণা করেন। ফলে এই মুসলিম জাহানের তিন মহাদেশে তিন জন খলীফার দোহাই ফিরিত-এশিয়ায় আব্বাসীয় খলীফা, আফ্রিকায় ফাতেমীয় খলীফা এবং ইউরোপে (স্পেনে) আব্দুর-রহমান-বংশীয় উমাইয়া খলীফা। ইসলামের প্রাথমিক যুগের ইতিহাস প্রকৃত পক্ষে এই তিনটি প্রসিদ্ধ রাজবংশের রাষ্ট্রীয় সংঘর্ষের ইতিহাস।

খলীফা আল মুস্তাসীম (১২৪২-৫৮ খৃঃ) - আববাসীয় বংশের শেষ খলীফা আল মুস্তাসীম ১২৫৮ খৃষ্টাব্দে মঙ্গোলীয়র বর্বর দলপতি হালাকু খান কর্তৃক সবংশে নিহত হন। সেই সঙ্গে এই বংশের সুলতানাৎ ও খিলাফৎ চিরতরে বিলুপ্ত হয়।

খিলাফতের বিবর্তন

খোলাফায়ে রাশেদীনের আমলেল খলীফার পদ ছিল নির্বাচন ভিত্তিক। প্রথম উমাইয়া খলীফা মু'আবিয়ার সময় হইতে উহা বংশগত হইয়া পড়ে। উমাইয়া খলীফা আবদুল মালিকের সময় মক্কায় জননেতা আব্দুল্লাহ্ ইবনে যুবায়ে নয় বৎসরের জন্য মক্কায় খলীফা হইয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে উহার সমাপ্তি ঘটে (৫৯২ খৃঃ) আব্বাসীয় খলীফাগণ উমাইয়াদের নীতিরই অনুসরণকারী ছিলেন। আব্বাসীয় রাজত্বের স্থায়িত্ব ৭৫০ হইতে ১২৫৮ খৃষ্টাব্দ পর্যত প্রসারিত। এই দীর্ঘ পাঁচ শত বৎসরের ভিতর মিশরে ফাতেমীয় রাজবংশের উথান ও পতন ঘটে। ৯১০ হইতে ১১৭২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ২৬৬ বৎসর ফাতেমীয় বংশের সুলতানগণ আব্বাসীয়দের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে আফ্রিকার সুলতানাৎ ও খিলাফৎ পরিচালন করেন।

ইতিমধ্যে ৯২৯ খৃষ্টাব্দে স্পেনের উমাইয়া সুলতান তৃতীয় আব্দুর রহমান নিজকে খলীফা বলিয়া ঘোষণা করেন এবং নিজ নামে খোৎবা পাঠের প্রচলন করেন। তৎপুত্র দ্বিতীয় হাকাম এবং তাঁহার উত্তরাধিকারিগণ ১০৩১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত গৌরবের অধিকারী ছিলেন। তারপর স্পেনে উমাইয়া রাজ বংশের বিলোপ ও সেই সঙ্গে তাঁহাদের খিলাফতের অবসান ঘটে।

বাগদাদ ও মিশর দুই রাজধানীতে তখনও দুইটি স্বতন্ত্র সুলতানাৎ ও খিলাফৎ চলিতেছিল। ১১৭০ খৃষ্টাব্দে মিশরের শেষ ফাতেমীয় খলীফা আল আযীদ (Al Azid) কঠিন রোগাক্রান্ত হন এবং সেই অসুখেই ১১৭২ সনে পরলোক গমন করেন। এই সময় সিরিয়ার তদানিন্তন সুলতান নুরউদ্দীন আতাবেগের সেনাপতি ইতিহাস প্রসিদ্ধ গাযী সালাহউদ্দীন তদীয় প্রতিনিধি

হিসাবে মিশরে অবস্থান করিয়া ফাতেমীয় খলীফা আল আযীদের সিংহাসন রক্ষা করিতেছিলেন। সুলতান নুরউদ্দীন নিজে সুন্নী এবং হানাফী ছিলেন। খলীফা আল আযীদের যখন জীবনের আশা আর নাই তখন হইতে নুরউদ্দীনের ইচ্ছাক্রমে মিশরে বাগদাদের আব্বাসীয় বংশের খিলাফৎ ধীরে ধীরে ও অনাড়ম্বরে প্রতিষ্ঠিত হইতে থাকে। আল আযীদের মৃত্যুর পর উহা পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় (১১৭২ খৃঃ ৫৬৭ হিঃ)।

এইভাবে বাগদাদের আব্বাসীয় খলীফাদের শাসন আমলেই স্পেনে ও মিশরে দুইটি স্বতন্ত্র খিলাফতের আরম্ভ ও বিলোপ ঘটে। ১২৫৮ খৃষ্টাব্দে শেষ আব্বাসীয় খলীফা আর মুস্তাসীম বর্বর হালাকু খান কর্তৃক সবংশে নিহত হইলে বাগদাদে তাঁহাদেরও খিলাফতের অবসান হয়।

বর্বর মঙ্গোলদের দ্বারা ঐ সময় বাগদাদে দশ লক্ষ ছয় শত লোক নিহত হয়। সেই সময় আহমদ আবুল কাসিম নামক এক আব্বাসীয় যুবক মিশরে পলাইয়া গিয়া আত্মরক্ষা করেন।

প্রায় দুই বৎসর মুসলিম জাহানে কোন নেতা বা খলীফা ছিল না। সকল মুসলিম, বিশেষ করিয়া সুন্নীগণ, এই অভাব বিশেষ ভাবে অনুভব করেন। তখন মিশরের বারগুনই সুলতান খিলাফৎ পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য উদগ্রীব হন এবং উক্ত যুবককে রাজধানীতে লইয়া গিয়া কাজীর সম্মুখে তাঁহার বংশ পরিচয় প্রমাণিত করার পর তাঁহাকে আল মুনতাসীর নাম দিয়া যথাযোগ্য আড়ম্বর ও অনুষ্ঠানসহ খলীফা রূপে প্রতিষ্ঠিত করেন (১২৬১ খৃঃ)। অতঃপর জুম্মা'র খোৎবায় তাঁহার নাম বসান হইল এবং সরকারী মুদ্রায়ও তাঁহার নাম মুদ্রিত হইল। অভিষেকের পরবর্তী জুম্মায় তিনি যথা নিয়মে ইমামতী ও খোৎবা-পাঠ করিয়া খলীফা হিসাবে সুলতানকে খিলাত ও সনদ প্রদান করিলেন এবং এইভাবে তাঁহার মসনদ পাকা করিয়া দিলেন। অবশ্য এই খিলাফৎ ছিল নিতান্তই ধর্মীয় নেতৃত্ব। রাষ্ট্র বা রাজনীতির সহিত ইহার কোন সংস্রব ছিল না, তাঁহার বংশে খিলাফৎ এই কারণে দীর্ঘস্থায়ী হইয়াছিল।

খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে তুরস্কের যুদ্ধ প্রিয় সুলতান সেলিম মিশর জয়ের

পর মিশরস্থিত আব্বাসীয় বংশের শেষ খলীফাকে উক্ত খিতাব ত্যাগ করিতে বাধ্য করেন এবং নিজের নামে খিলাফতের দানপত্র লিখিয়া লন (১৫১৭ খৃঃ)। তাঁহার সময়ে খিলাফতের ভিতর রাষ্ট্রীয় ও ধর্মীয় উভয়বিধ নেতৃত্ব পুনরায় একত্রিত হয়। বিগত প্রথম মহাযুদ্ধের পর তুরস্কের সুলতান গদীচ্যুত হয় এবং ১৯২৪ সনে খিলাফত গাযী কামাল পাশা কর্তৃক বিলুপ্ত হয়। তারপর এ পর্যন্ত খিলাফত আর পুনরুজ্জীবিত হয় নাই।

সমাপ্ত